মুনতাখাবুস সিয়র

[সীরাতে রাসূল সা.]



আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ

Scanned with CamScanner

মুনতাখাবুস সিয়র

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ

অনুবাদ ও সম্পাদনা : মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

প্রকাশনায়
পরওয়ানা পাবলিকেশন্স
ফুলতলী ভবন
১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩১৮৯১৭, ৮৩১৪১৬৮

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী : ২০০৫ইং
যিলহজ্জ : ১৪২৫ হিজরী
মাঘ : ১৪১১

কম্পোজ ও ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স
ফুলতলী ভবন
১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩১৪১৬৮

নির্ধারিত মূল্য : ১৫০/= [একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

মুদ্রণ
দিশুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

MUNTAKHABUS SIOR (Selected life history of Muhammed sm.) Written by Allamah Abdul Latif Chowdhury. Translated and Editted by Muhammad Husmuddin Chowdhury. Published by Parwana Publications
Fultoli Bhaban, 19/A, Nayapaltan, Dhaka-1000.
1st Addition-February 2005.
Price : 100 Taka

স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

লেখকের কথা

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم

আমি অধম বান্দা মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ ইবনে মরহুম মাওলানা মুফতী আব্দুল মজীদ আল মুজাদ্দিদী আন নক্‌শবন্দী ইবনে শাহ মুহাম্মদ হিরন বিন দানিশ বিন মোহাম্মদ সাদিক বিন মুহাম্মদ ইলাহী বখশ বিন মুহাম্মদ শাহ আলা বখ্‌শ দেহলভী (র.)। আমার দুই ছেলে মুহাম্মদ ইমাদ উদ্দীন মানিক (সাবেক প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিস সৎপুর আলিয়া মাদ্রাসা) ও মোহাম্মদ নজমুদ্দীন ছালিক (অধ্যক্ষ, ফুলতলী আলিয়া মদ্রাসা) ঢাকা আলিয়া মদ্রাসা হতে কামিল উত্তীর্ণ হওয়ার পর বারবার তাকীদ দিতে থাকে যেন সীরাতে রাসূল (সা.) প্রসঙ্গে কিছু লিখি। লেখার জন্য সময়ের প্রয়োজন। তা ছাড়া নবী চরিত লেখার জন্য হুব্বে রাসূল (সা.)-এর মধ্যে নিমগ্নতারও প্রয়োজন। অথচ আমি সেই সাগরের তীরেই ছটফট করছি।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাকে সিলেট কারাগারে রাখা হল। এ সময় আমার অন্তরে হুব্বে রাসূল (সা.) জেগে উঠতে লাগল। মদীনার সু-বাতাস অন্তরে সাড়া জাগাল। রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.) রূহানীভাবে অনুপ্রেরণা দেওয়ার ফলে মনের মধ্যে এই কামনা উদয় হল যে কাজ শুরু করার উৎসাহ জাগল।

এদিকে কারাগারে অবস্থানরত অনেক উলামায়ে কিরাম এ কাজের জন্য বার বার তাকীদ দিচ্ছিলেন। এদের মধ্যে জনাব মাওলানা আব্দুল মতীন চৌধুরী ফুলবাড়ী-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের পীড়া পীড়িতে বাড়ী থেকে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো সংগ্রহ করলাম : ১. সীরতে ইবনে হিশাম ২. সীরতে হালাবী ৩. যুরকানী আ'লাল মাওয়াহিব ৪. খাসাইসুল কুবরা ৫. তারিখে ইবনে খলদুন ৬. শিফা ৭. ওফাউল ওফা ৮. মাদারিজুন নবুওত।

প্রথমে এ অধমের উপর কয়েদীদের খাবারের ব্যবস্থাপনা তথা সুবিধা-অসুবিধা দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়। তা ছাড়া এর আগেই এখানে সহীহ কুরআন শিক্ষা শুরু করেছিলাম, এ জন্য বেশ ব্যস্ততা ছিল। কিতাব লেখা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আমার সাথী মৌলভী কারী মুহাম্মদ কামরুল হুসাইন সাহেবের উপর কুরআন শিক্ষার এ দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কলম ধরলাম। এ কাজে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট জনাব মুহাম্মদ ওলী আহাদ বিন মরহুম রুস্তম আলী (বাওয়ালী, রাজশাহী) আমার উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করে দিতে সহযোগীতা করতেন এবং বলতেন এ ধরনের কাজের জন্য জেলখানাই উপযুক্ত।

অবশেষে আল্লাহর অফুরন্ত রহমতে এই কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়েছিল। আল্লাহ আমাদের সকলের নেক কাজগুলো কবুল করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী

Scanned with CamScanner

অনুবাদকের কথা

'মুন্‌তাখাবুস সিওর' উর্দু ভাষায় রচিত একখানা নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থ। এতে পূর্বেকার বুযুর্গানে কিরামের অনুসরণে ও সীরাত বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের আলোকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক সংকলিত হয়েছে। জৌনপুরী সিলসিলার বুযুর্গ সিলেটের হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ দীর্ঘ প্রায় দুই বছর সিলেট কারাগারে নিরাপত্তাজনিত কারণে অবস্থান করেন। এ সময় তাফসীর, হাম্‌দ, নাত, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ে কিতাব রচনার পাশাপাশি স্বপ্নযোগে ইঙ্গিত পেয়ে প্রিয় নবী (সা.)-এর জীবনী বিষয়ে 'মুন্‌তাখাবুস সিয়র' নামে উর্দু ভাষায় ছয়শত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ রচনা করেন।

মূল কিতাব 'মুন্‌তাখাবুস সিওর' এর অর্থ নির্বাচিত সীরাত। উর্দু ভাষায় তিন খণ্ডে প্রকাশিত এই কিতাবের বাংলা অনুবাদের তাকীদ ছিল দীর্ঘ দিনের। প্রথম খণ্ডের কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন আমার বড় ভাই হযরত মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ছাহেব জাদায়ে ফুলতলী)। তাঁর কর্মব্যস্ততার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একাজ এগিয়ে নেয়ার সুযোগ না হওয়ায় তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি এ কাজে হাত দেই। প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ সমাপ্ত ও প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করছি। অনুবাদ কাজে সহযোগিতা করেছেন ফুলতলী কামিল মাদ্রাসার প্রভাষক প্রিয়ভাজন মাওলানা হবিবুর রহমান ও স্নেহাস্পদ ভাতিজা মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী। আরো অনেকের সহযোগিতা ও উৎসাহ রয়েছে এই কাজে। আল্লাহ সকলকে উত্তম জাযা দান করুন।

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী
সম্পাদক
মাসিক পরওয়ানা

সূচীপত্র

কিতাবের ধরন	৮
সর্বোত্তম সৃষ্টি	৮
তুব্বা হিময়ারীর ঘটনা	১০
মদীনা শরীফে তুব্বা	১১
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে মুহব্বত রাখার মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত	১২
হযরত ওয়েস করনী (রা.)	১৩
শারীরিক সম্পর্কের গুরুত্ব	১৩
সাওয়াদ বিন আমর আনসারী (রা.)	১৩
আবু তালিব	১৪
আফতাবে রিসালতের নূর থেকে ফয়েয লাভের বর্ণনা	১৪
হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঘটনা	১৪
হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ঘটনা	১৪
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র নসবনামা	১৬
অবিসংবাদিত নসবনামা	১৯
আব্দুল মুত্তালিব	১৯
হাশিম	১৯
আবদে মনাফ	২০
কুসাই	২০
মুররাহ	২০
ফিহির	২১
কুরাইশ নামকরনের কারন	২১
নদর	২১
খুযাইমা	২১
ইলিয়াস	২১
মুদার	২২
আদনান	২২
হাতি বাহিনীর ঘটনা	২৩
যমযম খনন	২৮
যমযমের সূচনা	২৮
আব্দুল মুত্তালিবের যমযম কূপ খনন	২৯
যমযমের বৈশিষ্ট্য	৩২
হযরত আমিনার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতার শুভ পরিণয়	৩৩
অলৌকিক ঘটনাবলী	৩৭

Scanned with CamScanner

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খতনাসহ জন্মগ্রহন ৩৮
দুধ পান ৪০
হালিমা সা'দিয়া ৪২
শায়মা ৪৩
বন্দীনী শায়মা ৪৩
রাসূল (সা.)-এর মুখ নিসৃত প্রথম বানী ৪৪
দুধ ছাড়ানো ৪৫
খতমে নবুয়ত ৪৬
রাসূল (সা.)-এর পিতা-মাতা নাজাত প্রাপ্ত ৪৭
মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা প্রসঙ্গে ৪৮
আমিনা (রা.)-এর ইন্তিকাল ৫৩
আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল ৫৪
রাসূল (সা.) হরবুল ফুজ্জারে অংশগ্রহণ ৫৫
১ম যুদ্ধের কারণ ৫৫
২য় যুদ্ধের কারণ ৫৫
৩য় যুদ্ধের কারণ ৫৬
৪র্থ যুদ্ধের কারণ ৫৬
মহানবী (সা.) হিলফুল ফুযুলে অংশগ্রহণ ৫৮
আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আন ৫৮
হযরত খাদীজা (রা.)-এর সাথে শাদী মুবারক ৬১
কুরাইশ কর্তৃক কাবা শরীফ নির্মাণ ৬৪
কৃষ্ণাঙ্গদের ভিত্তি ৬৬
তায়েফের বাগান স্থানান্তর ৭০
হাররার ঘটনা ৭০
ওহী অবতরণ শুরু ৭৩
হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর বর্ণনা ৭৬
আব্বাস বিন মুরাদিসের ঘটনা ৮২
হযরত তমীম দারী (রা.-এর ইসলাম গ্রহণ ৮৪
হযরত ওয়াইল বিন হজর হাদরামীর ঘটনা ৮৪
মহানবী (সা.)-এর বৈশিষ্ট্যর মধ্যে চতুস্পদ জন্তুর কথা বলাও একটি ৮৫
গাছ কর্তৃক কথা বলা ৮৬
আঁড়িপেতে শোনা হতে জিনদের বিতাড়ন ৮৬
পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে মহানবী (সা.)-এর নাম ৯০
ওহীর প্রকারভেদ ১০৭
ওহী অবতরণ শুরু ১০৮
ওহী অতরণের পদ্ধতি ১১৩
নামায ফরয হওয়া ১১৪
প্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ১১৫
যয়েদ বিন হারিসার (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত অবস্থা ১২০
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ১২২
হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ১২৪
হযরত তালহা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ১২৫
হযরত খালিদ বিন সাইদ বিন আস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ১২৯
হযরত সুহাইব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ১২৯
হযরত হুসাইন (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ ১৩০
হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ১৩০
মহানবী (সা.)-এর দারে আরকম-এ অবস্থান ১৩৩
হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপর নির্যাতন ১৩৯
হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর উপর নির্যাতন ১৪০
রাসূল (সা.)-এর কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে কাফিরদের বিদ্রুপ ১৪০
নওমুসলিমদের উপর নির্যাতন ১৪০
হাবশায় হিজরত ১৪২
হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ১৪২
কুরাইশদের বিভিন্ন প্রশ্ন ১৪৫
সূরা ওয়াদ্দুহা হতে 'নাস' পর্যন্ত তাকবীর পড়ার দলীল ১৪৯
বিদ্রুপকারীগণ ১৪৯
আবদে মনাফ গোত্রের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ১৫১
হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত ১৫২
নাজরানের প্রতিনিধি দল ১৫৩
যিমাদ আযদীর ইসলাম গ্রহণ ১৫৩
হযরত খাদীজা (রা.) ও আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণ ১৫৩
তায়িফে ইসলামের দাওয়াত ১৫৪
জিনের আলোচনা ১৫৬
মি'রাজের বর্ণনা ১৫৭
মি'রাজের দিন তারিখ নিয়ে মত পার্থক্য ১৫৯
সত্যয়ন ও মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ ১৬৩
আল্লাহ্কে দেখার মাসআলা ১৬৯
বিভিন্ন আরব গোত্রের কাছে রাসূল (সা.)-এর দাওয়াত পেশ ১৭১
যেখানেই বসতেন, ইসলামের আলোচনা করতেন ১৭২
দ্বিতীয় আকাবা ১৭৩
মদীনার নকীব (দলপতি) গণ ১৭৪
মদীনায় হিজরত ১৭৫
কুরাইশদের পরামর্শ ১৭৭
সূর গুহা ১৭৮
মদীনায় সফর ১৮৩
মসজিদে নববী নির্মাণ ১৮৬
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভাতৃত্ব বন্ধন ১৯০
যাকাত ১৯০
আযান ১৯০
হযরত বিলাল (রা.) এর অবস্থা ১৯২

Scanned with CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي علي رسوله الكريم

কিতাবের ধরণ

প্রথমে আমার ইচ্ছে ছিল, আমি এই কিতাবখানা ইতিহাসের রীতি অনুসারে লিখব। কিন্তু স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর ইশারা পেয়ে সীরাতের পদ্ধতি অনুসরণ করলাম। ফযীলতের ক্ষেত্রে যদিও ضعيف হাদীস অনুযায়ী আমল করার অনুমতি রয়েছে; তা সত্বেও আমি ضعيف হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে অনেকটা সতর্কতা অবলম্বন করেছি। বিভিন্ন সনদে যে সকল ضعيف হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়েছে কেবল তাই আমি বর্ণনা করেছি। অন্যান্য সব পরিত্যাগ করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে খলদুনের নিয়মাবলীকে প্রাধান্য দিয়েছি। এ জন্যে অনেক সারিয়াকে গাযওয়া নামে অভিহিত করেছি। আবার অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। আর সর্বসম্মত বিষয় গুলোর উদ্ধৃতি বা সূত্র বর্ণনা করিনি। তবে যে সব বিষয়ে মত বিরোধ রয়েছে সেই সব বিষয়ে উদ্ধৃতি বা সূত্র বর্ণনা করেছি। কিছু কিছু আরবী ইবারতের তরজমা পুরনো পদ্ধতিতে শাব্দিক অর্থেই করা হয়েছে, যাতে করে সকলে বুঝতে পারেন এবং যাতে مبتداء ও خبر এর মধ্যে বেশী দূরত্ব সৃষ্টি না হয়। মু'জিযা সমূহে নম্বর দেওয়া হয়েছে এবং রাসূল (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহকে خ হরফ দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু আমার আসল পুঁজি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুহাব্বত। এ মুহাব্বতের আলোতেই লিখতে থাকি- শেষ পর্যন্ত দেখি এক বিরাট কিতাব হয়ে গেছে।

প্রথম খন্ড পাঠকবৃন্দের খিদমতে পেশ করা হল। পর্যবেক্ষক মহোদয়গণের সমীপে আবেদন, যদি কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তা যেন অবশ্যই অবহিত করেন, যেন পরবর্তী সংস্করনে তা সংশোধন করতে সক্ষম হই এবং কিতাবখানি সকলের উপকারে আসে। আল্লাহ যেন এ গ্রন্থ খানি আমার নাজাতের ওসীলা করে দেন আর রাসূল (সা.) এর মহব্বতে আমার অন্তর পূর্ণ করেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

সর্বোত্তম সৃষ্টি

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সকল সৃষ্টিজীব ঘোষনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। তবে, হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার আগে ফিরিশতাদের নিকট ঘোষণা দেন। শুধু ঘোষণাই নয়; হযরত আদম (আ.)-কে খিলাফত এর দায়িত্বও অর্পন করেন। যেমন-

আল্লাহ তায়ালার বানী-
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً হযরত আদম (আ.)-কে এপৃথিবীতে নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে এবং হযরত ইসমাইল (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে হতে বনি কেনানা কে, এরপর কুরাইশকে এবং কুরাইশদের মধ্য বনি হাশেমকে এবং বনি হাশেমের মধ্য হতে এ দায়িত্ব অর্পন করা হয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর।

আল্লাহ তায়ালার গুনাগুন এবং সত্তা মানব সমাজকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য যতজন সত্য বার্তাবাহক এপৃথিবীতে আগমন করেছেন তাঁদের মধ্যে আমাদের নবী করীম (সা.)-ই সকলের চেয়ে উত্তম ও মহান। নবী এবং রাসূলের প্রয়োজন এজন্য হয়েছিল যেন তাঁরা মানবকুলকে সঠিক পথ সম্পর্কে অবহিত করেন যাতে মানুষ আপন মনগড়া রাস্তায় চলে ধ্বংস না হয়।

নবী তিনিই, যিনি আল্লাহর নিকট থেকে সঠিক খবর নিয়ে এসেছেন এবং তাদের মধ্যে যার নিকট কিতাব অবতীর্ণ হয় তাঁকে রাসূল নামে অভিহিত করা হয়। নবী এবং রাসূল মিথ্যা বলতে পারেন না। তাঁদের উপর কখনও মিথ্যার সন্দেহ করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ কোন জিনিষ হালাল বা কোন জিনিষ হারাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নিজেই সংবাদ পৌছান না। বরং কোন মাধ্যমের দ্বারাই পৌছান। আর এ মাধ্যম গ্রহণযোগ্য সত্য বার্তাবাহকই হয়ে থাকেন। আর যদি বার্তাবাহক সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে তা হলে তিনি যে জিনিষকে হারাম বলেছেন, তা হালালও হওয়ার ও সম্ভাবনা থাকে প্রত্যেক জামানায়ই সত্য ছাড়া মিথ্যা বার্তাবাহক ও ছিলেন। যেই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন- قُلْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ "হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি বলে দিন- আল্লাহ তায়ালা যা কিছু রিযিক অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা মনগড়া হালাল এবং হারাম বানাচছ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে কী সেই ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন না তোমরাই আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছ?" (সূরা : ইউনুস-৫৯)

এখানে প্রশ্নের অবতারনা হয়, যে সকল লোকেরা নবীকে দেখেন নি, তারা যদি ঈমান না আনে- তাহলে কী তা দোষ বা ত্রুটি হিসেবে ধরা হবে? এ প্রশ্নের জওয়াব হচ্ছে এই, মানুষ যে কেবল প্রত্যক্ষ করার পর বিশ্বাস করে তা নয় বরং প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যক্ষ করে নিশ্চয়তা লাভ করলেও মানুষ এবং প্রাণীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমূলক পার্থক্য রয়েছে, তা এই যে, মানুষ বার্তাবাহককে না দেখেই সত্য সংবাদের উপর ঈমান আনে বা নিশ্চয়তা লাভ করে। এ কথা স্পষ্ট যে, অদৃশ্য খবর বিশ্বাস করার জন্য যদি সাক্ষ্য অপরিহার্য হয় তা হলে যে কাউকে নিজের পিতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মানো অনেক বেশী কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ পিতা সাব্যস্ত করার জন্য শুধু একটাই মাধ্যম তা হল খবর। মানুষের কর্তব্য হল, সে নবীর উপর ঈমান আনবে। যদি না আনে, তা হলে সে মানুষের সীমারেখার বাইরে চলে যাবে।

মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দুটি জিনিষের প্রয়োজন রয়েছে ১. ভয় ২. সুসংবাদ। এ'দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নবীদের দায়িত্বে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ অর্থাৎ "আমি রাসূলদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং ভয় প্রদর্শনের জন্যেই প্রেরণ করেছি।" এখন মানুষের উচিত সে যেন সঠিকভাবে নবীকে জানে। কারণ কেউ যদি নবীকে সঠিকভাবে জানতে ভুল করে তাহলে সে সঠিক রাস্তা হতে ছিটকে পড়বে।

Scanned with CamScanner

তুব্বা হিমিয়ারীর ঘটনা

নবীকে জানার জন্যে অধিকতর ইরহাসাত এবং মুজিযাত এর কথাই উল্লেখ করা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্যতা সম্পর্কে যে সকল অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হত তাকে ارهصات বলা হয়। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর যে সকল অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে তাকে معجزات বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কোথায় পয়দা হবেন, কোথায় অবস্থান করবেন, তাঁর দৈহিক আঙ্গিক কী রকম হবে এ সব কিছু বিস্তারিতভাবে পূর্ববর্তী কিতাবের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। যেমন তুব্বা হিমিয়ারীয় ঘটনা-

তুব্বা যখন মক্কার সন্নিকটে পৌঁছলেন, তখন মক্কার নেতারা তাকে সম্ভাষণ জানালেন না। কেন তাকে সম্ভাষণ জানানো হলো না সে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তারা বলেন, মক্কাবাসীরা কা'বা শরীফের পাগল, তা ছাড়া কা'বা শরীফে ৩৬০ দেবতা রাখা হয়েছে। তারা এক একদিন এক একটি দেবতার পূজা করে। এজন্যে তাদের সময় নেই। তা ছাড়া মক্কাবাসীদের দৃষ্টিতে এ কাবা ঘরের চেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন আর কোন বস্তু নেই।

তুব্বা একথা শুনে রাগান্বিত হলেন এবং কাবা ঘরকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তখন ধর্মীয় পন্ডিতগণ বলেন- বায়তুল্লাহর সাথে যেই বেয়াদবী করেছে তার খান্দান বা বংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন বাদশাহ এ ইচ্ছে থেকে নিবৃত্ত থাকলেন এবং সিপাহীদেরকে নির্দেশ দিলেন, চল তারা যে, সব মূর্তির পূজা করছে ঐসব মূর্তি ভেঙ্গে দেই। এ ব্যাপারেও বাদশাহ্ পন্ডিতদের থেকে পরামর্শ চাইলেন। তখন পন্ডিতগণ বলেন- এ মূর্তিগুলো ভাঙ্গাও আপনার জন্য সম্ভব নয়। কেননা যার হাতে এ মূর্তিগুলো ভাঙ্গা হবে তার পরিচয় পরিষ্কার ও বিস্তারিত ভাবে আমাদের কিতাবে লেখা আছে। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন তিনি কে? আলিমগন জওয়াব দিলেন, যে নবী আখেরী জামানায় এ শহরে পয়দা হবেন। তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ (সা.), পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ্ এবং মাতার নাম হবে আমিনা। তিনি তাঁর হাত মুবারক দিয়ে এ মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গবেন। তাঁর পবিত্র হাতে ছাড়া আর কারও দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এ কথা শুনা মাত্রই বাদশাহের খেয়াল সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল এবং আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে শেষ নবী কী এ শহরে পয়দা হবেন? তারা জওয়াব দিলেন হ্যাঁ।

তুব্বা উলামাদের জিজ্ঞেস করেন, এ নবী কী পুরো জীবন এ শহরে কাটাবেন না কোথাও হিজরত করবেন? তারা জওয়াব দিলেন- তাঁকে হিজরত করতে হবে। বাদশাহ এরপর আবার প্রশ্ন করলেন- তিনি কী নিজেই হিজরত করবেন না অন্য কেউ তাঁকে বের করে দেবে? আলেমগণ জওয়াব দিলেন- অন্য লোকই বের করে দেবে। তখন বাদশাহ উৎফুল্ল চিত্তে বলতে লাগলেন আপনারা আমাকে বলেন, কে সে ব্যক্তি যে তাঁকে বের করে দেবে। আমি তাকে মেরে ফেলব। এমন লোক যেন পয়দা না হয় যে আল্লাহর রাসূলকে স্বীয় জন্মভূমি হতে বের করে দেবে। আলিমগণ জওয়াব দিলেন- এটাও আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তাঁকে বের করার লোক তাঁরই বংশের হবে। যদি আপনি তাকে মেরে ফেলেন তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সিলসিলা শেষ হয়ে যাবে। বাদশাহ আলিমদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন আমি কীভাবে কাবা শরীফকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারি। তারা বলেন- বায়তুল্লাহ শরীফ

তওয়াফ করে এবং তথাকার বাসিন্দাদেরকে দাওয়াত করে। বাদশাহ সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন এবং কয়েকদিন যাবৎ দাওয়াত দিয়ে লোকদেরকে আপ্যায়ন করতে লাগলেন।

ইতোমধ্যে বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন তিনি কা'বা শরীফকে কাপড় পরিধান করাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ কাবা শরীফকে গিলাফ পরান। এজন্য অধিকাংশ কিতাবে লেখা আছে যে, اول من كسا الكعبة التبع الحميري

"তুব্বা হিময়ারীই কা'বাকে সর্ব প্রথম গিলাফ পরিধান করান।" তুব্বা যেই জায়গায় খাবার রান্না করে মানুষকে পরিবেশন করেছিলেন, সেই জায়গার নাম এখনো পর্যন্ত মাতবাখ বা রন্ধনশালা বলে পরিচিত।

মদীনা শরীফে তুব্বা

অতঃপর বাদশাহের অন্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুহাব্বত উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করল। তিনি পুনরায় আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোন দিকে রওয়ানা হবেন, কোথায় কোন শহরে অবস্থান করবেন? এমনকি, তিনি ঐ আলিমদেরকে নিয়ে পবিত্র মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় অবস্থান করে কয়েক জায়গায় বিশ্রামের জন্য বিশ্রামাগার তৈরী করে অবশেষে পবিত্র মদীনায় পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে ঐ জায়গার অসনুন্ধান করতে লাগলেন যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের পরে অবস্থান করবেন, আর যেখানে মসজিদে নববী বানাবেন। তুব্বা বাদশাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুহাব্বতে নিমগ্ন হয়ে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর ঘরের জায়গা এবং মসজীদে নববীর কিছু জায়গা ক্রয় করে ওখানে খুটি মেরে দিলেন। হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.)-এর পিতৃ পুরুষদের একজনকে ঐ জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দিলেন। তাদের কাছে সোনার তক্তার উপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট পৌঁছানোর জন্যে নিজ হাতে একটা চিঠি লিখে আমানত রেখে গিয়েছিলেন। এ চিঠির বিষয় বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্নভাবে লেখা হয়। হযরত আল্লামা হাফিজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কসীর (রা.) স্বীয় তফসীরে এ চিঠির বিষয় কবিতায় এভাবে লিখেছেন-

شهدت علي احمد انه ÷ نبي من الله باري النسم
ولو مد عمري الي عمره ÷ لكنت وزيرا منه وابن عم
وجاهدت بالسيف اعدائه ÷ وفرجت عن صدره كل غم

'আমি একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আহমদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার নবী। তিনি হচ্ছেন পবিত্র আত্মা। যদি আমার আয়ু তাঁর আগমন পর্যন্ত দীর্ঘ হয় আমি তার উযির হব এবং আমি হতাম তার চাচাতো ভাই (এখানে উযীর ও চাচাতো ভাই দ্বারা তিনি সাহায্যকারী হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এরূপ ব্যবহার বহুল প্রচলিত)। আমি তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করতাম এবং তাঁর অন্তর থেকে সকল দুশ্চিন্তার মূলোৎপাটন করতাম।'

বিস্তারিতভাবে এ চিঠি বিভিন্ন কিতাবে লেখা রয়েছে। বিশেষ করে تاريخ الحرمين নামক কিতাবে বিস্তারিত লেখা আছে। তাই এ কথা পরিস্কারভাবে জানা গেল যে, আগের কিতাবগুলোতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ণ জীবনী উল্লেখ রয়েছে। প্রমান স্বরূপ দু একটি ঘটনা শুধু বর্ণনা করলাম। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবির্ভাবের পূর্বে তাঁর অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে যারা না দেখে অন্তরে মুহব্বত রেখেছিলেন যদিও তারা মুসলমান হওয়ার সুযোগ পাননি তদুপরি তারা আহলে ফিতরত হিসাবে বেহেস্ত লাভ করবেন।

Scanned with CamScanner

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে মুহব্বত রাখার মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত

ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হল রাসূলে করীম (সা.)-এর সাথে মুহব্বত রাখা। নিজের মান-মর্যাদা বৃদ্ধিরও অনন্য উপায় হল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে মুহব্বত রাখা। এমন কি অন্যান্য নবী-রাসূল, সাহাবা ও সাধারণ উম্মতের জন্যও একথা প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর কথা উল্লেখ করা যায়। হযরত ইবরাহীম (আ.) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য যে সব ত্যাগ দেখিয়েছেন সবগুলোর বিনিময় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রদান করেছেন। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ভূমিষ্ট হওয়ার জায়গায় কোন তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াই রেখে গিয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য বিশেষ দুআ করেছিলেন। বিশেষ করে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.), তাঁর বংশধর এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের রিযকের আধিক্যের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে একান্তভাবে দুআ করেন। সে দুআর বরকতে আসহাবে সরীমের বাগানকে যমিনসহ উঠিয়ে তায়েফে রেখে দেয়া হয়েছে। এ সব ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)-কে মুমিনের মুখ দিয়ে স্মরণ ও দুআর মাধ্যমে অমর করে রেখেছেন। যেমন দুরূদ শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম ও সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূল (সা.)-এর খিদমতে নিজের মাল কয়েক দফা কুরবান করেছেন। নিজের প্রাণ যা হেরা গুহায় বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাঁর বিনিময় স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে صاحب في الغار অর্থাৎ গুহার সাথী উপাধিতে ভূষিত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا অর্থাৎ তাঁরা যখন গুহায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়জন ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাথীকে বলেন তুমি চিন্তা কর না, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে আছেন। কবরের জীবনেও আল্লাহ আবূ বকর (সা.)-কে রসূল (সা.)-এর সাথী করে রেখেছেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) মৃত্যুকালে অসিয়ত করেছিলেন আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার দাফন যেন রাসূলুল্লাহ (সা.)পাশেই করা হয়। তবে রাসূল (সা.) যদি অনুমতি প্রদান করেন তা হলেই আমাকে তথায় দাফন করবেন; অন্যথায় আমাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করবে। তিনি বলেন, হযরত (সা.) থেকে অনুমতি নেয়ার পদ্ধতি হচ্ছে- যখন আমার মৃত্যু হবে এর পর আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাযার নামায শেষ করে আমার কফিন পবিত্র রওযা শরীফের দরজার সামনে রেখে দিবে, তখনও দরজা বন্ধ থাকবে। একজন লোক আমার কফিনের নিকট দাঁড়িয়ে পবিত্র রওযা শরীফের দিকে মুখ করে আরয করবেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনার আবূ বকর আপনার সামনে উপস্থিত, আপনাকে সালাম পেশ করেছেন। যদি পবিত্র রওযা শরীফ হতে সালামের জওয়াব দেওয়া হয়, তাহলে আমাকে পবিত্র রওযা শরীফের কাছে দাফন করবেন। অন্যথায় আমার লাশ ফিরিয়ে নিয়ে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করবেন। কারণ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর কাছে কবরস্থ হয়ে তাঁর মুহব্বত অর্জন করা। কিন্তু অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে হাজির হলে মুহব্বত থেকে বঞ্চিত হব। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী আমল করা হল এবং দরবারে রেসালতে সালাম পেশ করা হল, রওযা শরীফ হতে সালামের জওয়াব আসল। মুহূর্তেই দরজা খুলে গেল এবং একটি

আওয়াজও শুনা গেল اوصل الحبيب الى الحبيب অর্থাৎ দোস্তকে দোস্তের সাথে মিলিয়ে দাও। প্রকৃত অর্থেই মুহব্বতের সম্পর্ক হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) পেয়েছিলেন। মোটকথা রাসূল (সা.)-এর প্রতি মুহব্বত রাখার কারণে যে উচ্চ মর্যাদা হাসিল হয়ে থাকে এই রকম ঘটনা আরো আছে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত ওয়ায়েস করনীর কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

হযরত ওয়ায়িস করণী (রা.)

তিনি হচ্ছেন হযরত ওয়ায়িস করণী (রা.। যদিও তাঁর সমসাময়িক কালে অনেক আলিম এবং বুজুর্গানে দীন বিদ্যমান ছিলেন কিন্তু তাঁর অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুহব্বত অধিক হওয়ার কারণে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবীয়ীন (خير التابعين) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। যার অন্তরে যত বেশী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আন্তরিক মুহাব্বত বিদ্যমান থাকবে তার মর্যাদা ততো বেশী বৃদ্ধি পাবে। এ নিয়ম কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এ বিষয়টি হচ্ছে রূহানী সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

অপর দিকে নবী-রাসূল ও ওলীগণের সাথে শারীরীক সম্পর্ক ও সংস্পর্শ অনেক জন্তুকে পর্যন্ত মর্যাদাবান করে তুলে । যেমন আসহাবে কাহাফের কুকুর মকবুল বান্দাদের মুহব্বতের কারণেই বেহেশতের সার্টিফিকেট লাভ করেছে। এভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনি এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর গাধা। এছাড়াও রাসূল (সা.) এর সাথে মুহব্বত রাখার জন্য প্রাণহীন জিনিষও যে কত বেশী কল্যাণময় হয়েছে তা অগণিত। اسطوانه حنانه 'উস্তানে হান্নানা' যার কথা বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে। জবলে উহুদ যার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণনা রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুহববতের কারণেই এ সব জিনিষ বেহেশতের সার্টিফিকেট পেয়েছে।

শারীরীক সম্পর্কের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.)এর সাথে শারিরীক সম্পর্ক রাখার কারণে যেই কল্যাণ অর্জন হয় এ ব্যাপারে সার কথা হল, যেই বস্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শরীর মুবারক স্পর্শ করেছে সেই বস্তুর উপর দুযখের আগুন হারাম হয়ে যায়। এ সত্যের অনুকূলে দু'একটা দলিল পেশ করা হল।

সাওয়াদ ইবনে আমর আনসারী (রা.)

বদরের যুদ্ধে যখন যোদ্ধাদেরকে সারিবদ্ধ করা হচ্ছিল তখন হযরত সাওয়াদ ইবনে আমর আনসারী (রা.) যুদ্ধে শাহাদত বরণ করার আকাঙ্খায় সারি থেকে একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এক খন্ড কাঠ দ্বারা ধাক্কা দিয়ে তাঁকে পিছনে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে বেশী কৌতুক প্রিয় ছিলেন। এ ধাক্কা খাওয়ার পর তিনি বলতে লাগলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমি খুব বেশী ব্যথা পেয়েছি। এ শব্দটি তিনি বারবার বলতে লাগলেন। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি কী চাও? তিনি জওয়াব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমি এর বদলা চাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পেট মুবারককে আগে বাড়িয়ে বলেন- এস, তোমার বদলা নাও। যেহেতু তাঁর পেটেই ধাক্কা লেগেছিল, তাই তিনি বলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমাকে আঘাত করার সময় পেটের উপর কোন কাপড় ছিল না। শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) পেট মুবারক হতে কাপড় খুলে বলেন, নাও তোমার বদলা নাও।

Scanned with CamScanner

তখনই সেই সাহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পেট মুবারকে হাত রেখে চুম্বন প্রদান করেন এবং কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কেন চুম্বন দিলে এবং কাঁদলে? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমি বদলা প্রত্যাশী নই, আমি মুনাফিক নই, শুধু আপনার শরীর মুবারক স্পর্শ করার জন্যই একটি অজুহাত দেখিয়ে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করলাম। কেননা আমি নিজ চোখে নিজের মৃত্যু দেখছি। আমার জানাও আছে এবং দলীলও আছে যে, যেই ব্যক্তি আপনার শরীর মুবারক স্পর্শ করবে, যার শরীর আপনার শরীরের সাথে লেগে যাবে তাঁর উপর দূযখের আগুন হারাম হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.); আমার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুর আগে যে কোন উপায়ে আপনার শরীর স্পর্শ করব যেন দূযখের আগুন আমার উপর হারাম হয়ে যায়।

আবূ তালিব

দ্বিতীয় ঘটনা আবূ তালিবের, যিনি ঈমান কবুল করেননি, তবুও দূযখীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘু শাস্তি হবে আবু তালিবের। শুধু দুটি পায়ে দূযখের আগুনের জুতা পরানো হবে এবং বাকী শরীর দূযখের আগুন থেকে সুরক্ষিত থাকবে। ঐ রিওয়ায়াত মুসলিম শরীফেও আছে। আবূ তালিবের শরীর আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হচ্ছে যেহেতু আবূ তালিবের পুরো শরীর রাসূল (সা.) এর শরীর মুবারকের স্পর্শ পেয়েছিল শুধু দু'টি পা ছাড়া। আর নিয়ম হচ্ছে- যে কোন জিনিষ রাসূল (সা.) এর শরীর মুবারকের সাথে স্পর্শ হয় তার উপর দূযখের আগুন হারাম হয়ে যায়। এজন্য দূযখের আগুন আবূ তালিবের শরীর স্পর্শ করবে না।

আবূ তালিব রাসূল (সা.) কে নিজের সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন। কখনো কাঁধের উপর, কখনো কোলে এবং কখনো পেটের উপর উঠাতেন।

আফতাবে রিসালতের নূর থেকে ফয়েয লাভের বর্ণনা

যে মু'মীনের অন্তরের আয়নায় রিসালতের সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর দ্বারা চতুর্দিক আলোকিত হয়ে ওঠে। যে যতটুকু আলো হাসিল করতে পারে সে ততোটুকু কামিয়াবী হাসিল করে। এটা এমন একটা আলো যার সামনে সকল সৃষ্টি জীবের তেজ নিষ্প্রভ হয়, সকল লেলিহান শিখা, নিভে যায়। এর প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর ঘটনা

হযরত ইবরাহীম (আ.) আগুনে জ্বলেননি। তাঁকে মজবুত রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল। রশি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত শরীর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি জ্বলেননি। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার পর আল্লাহ বলেছিলেন- يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ "হে আগুন ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা ও শান্তিময় হয়ে যাও"।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি পশমও না জ্বলার কারণ ছিল-হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মধ্যে তখন নূরে মুহাম্মদী (সা.) বিদ্যমান ছিল। নূরে মুহাম্মদীর জন্য আগুন তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ঘটনা

দ্বিতীয় ঘটনা হযরত ইসমাঈল (আ.) এর। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্ন দেখার পর হযরত ইসমাঈল (আ.)কে নিয়ে মিনায় পৌঁছলেন। শয়তান তিন বার

ধোঁকা দিতে চাইলে হযরত ইসমাঈল (আ.) শয়তানকে পাথর মেরেছিলেন। যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ সন্তানকে স্বপ্নের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন হযরত ইসমাঈল (আ.) সানন্দে কুরবানী হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এবং এর সমর্থনে পাঁচটি ওসিয়ত করলেন।

প্রথমত ঃ প্রিয় আব্বাজান! যদি আপনি আমাকে কুরবানী করতে ইচ্ছা করেন তবে প্রথমে আপনার ছুরি ধার করিয়ে নিন, যেন আল্লাহর নির্দেশ দ্রুত সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ গলা কাটতে যেন বিলম্ব না হয়। যদি গলা কাটতে দেরী হয় সেই মুহূর্তে সন্তানের মুহব্বত জেগে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রিয় আব্বাজান! আপনি যখন আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে আমাকে কুরবান করতে চাচ্ছেন, তাই আপনি কুরবানীর আগে শক্ত রশি দিয়ে আমার পুরো শরীরটা বেঁধে নিন, যাতে কুরবানীর পরে আমার শরীর নড়াচড়া না করে। নড়াচড়া করলে একথা সাব্যস্ত হবে যে, আমি স্বেচ্ছায় আমার গর্দান আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কুরবানী দেইনি।

তৃতীয়তঃ প্রিয় পিতা । কুরবানীর সময় আমাকে চিৎ করে শোয়াবেন না। আমার চেহারার উপর আপনার দৃষ্টি পড়লে পিতৃত্বের স্নেহের প্রবলতা হেতু হয়ত আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং আমাকে মুখ নিচের দিকে করে যমিনে শোয়াবেন।

চতুর্থতঃ প্রিয় আব্বাজান! আপনি আমাকে কুরবানী দেয়ার আগে আপনার কাপড় গুছিয়ে নিন। যাতে আমার রক্তের ছিটা আপনার কাপড়ে না পড়ে। রক্তের চিহ্ন নিয়ে আপনি ঘরে গেলে এবং তাতে আমার আম্মার দৃষ্টি পড়লে হয়ত আমার অসহায় মায়ের কলজে বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

পঞ্চমতঃ প্রিয় আব্বাজান! আমার আম্মাকে আমার কুরবানীর খবর শুনাবেন না। কারণ তার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) আনন্দের সাথে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) অনেক খুশী হয়ে ওসিয়ত করেই স্বীয় গর্দান সোপর্দ করলেন কিন্তু গর্দানের উপর ছুরি নিস্তেজ হয়ে রইলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) পূর্ণ শক্তি দিয়ে ছুরি চালিয়ে ছিলেন, কেন ছুরি চলছেনা সেই রাগে রাগান্বিত হয়ে ছুরি নিক্ষেপ করলে পাথরের উপর পড়ে পাথর কেটে যায় কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) এর গর্দান কাটা যায়নি।

এর কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেইক্ষণে নূরে মুহাম্মদ (সা.) স্থানান্তরিত হয়ে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মধ্যে পৌঁছেছিল।

এনূরের কারণেই উম্মতে মুহাম্মদী (সা.) হতে দোজখ আশ্রয় প্রার্থনা করে বলে যে, حري يا مؤمن فان نورك ليطفي لهبي দ্রুত চলে যাও হে মুমীন! তোমার নূরের কারণে আমার অগ্নিশিখা নিভে যাচ্ছে।

যদিও অন্যান্য নবীদেরকে মুজেযাত প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল জন্মের সময়, জন্মের পর বা নবূয়ত প্রাপ্তির পর। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুজেযাত প্রকাশ পেয়েছিল হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার সাথে সাথে আর তাঁর প্রশংসা সৃষ্টি জগত সৃষ্টির পূর্ব হতেই করা হয়েছিল, যার অনুকূলে একটা দলিল পেশ করা হচ্ছে- যখন হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে বের হচ্ছিলেন- তখন দেখলেন যে, আরশের পৃষ্ঠে এবং বেহেশতের সর্বত্র আল্লাহর নামের সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম

Scanned with CamScanner

মুবারক লেখা রয়েছে। তখন আদম (আ.) বললেন, হে পরওয়ারদিগার! মুহাম্মদ এ নামটি কার? আল্লাহ তায়ালা বলেন- তিনি হচ্ছেন তোমার সন্তান। যিনি না হলে তোমাকে সৃষ্টি হতো না। তিনি তারপর বলেন, হে পরওয়ারদিগার! এ সন্তানের সম্মানার্থে আমাকে দয়া করুন। তখন বলা হয় হে আদম! তুমি আসমান এবং যমীনের যে কোন লোকের জন্য যদি মুহম্মদ (সা.)-এর ওসিলা দিয়ে আমার কাছে শাফায়াত চাও, তা হলে শাফায়াত করা হবে।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমায়েছেন, হযরত আদম (আ.) যখন ভুল করলেন, তখন বললেন ইয়া রব! আমি আপনার কাছে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওসিলা নিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি; আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম! (আ.) কিভাবে তুমি মুহাম্মদ (সা.) কে চিনলে অথচ আমি তাঁকে সৃষ্টি করিনি! তখন তিনি বললেন, পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে আপনার হাত দিয়ে তৈরী করলেন, তারপর আমার মধ্যে রূহ ফুঁকলেন, তারপর আমি মাথা উত্তোলন করে দেখলাম, আরশে লেখা আছে لا اله الا الله محمد رسول الله তখনই আমি বুঝতে পারলাম, আপনি তাঁকে মুহব্বত না করলে তাঁর নাম আপনার নামের সাথে যোগ করতেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন- হে আদম! যেই তাঁর ওসিলা ধরে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। মুহাম্মদ না হলে তোমাকে সৃষ্টি করা হতো না। বায়হাকী এই বর্ণনা করেন। হযরত তিবরানীও অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং কিছু বাড়িয়ে বলেন وهو اخر الانبياء من ذريتك অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে সীরাতের কিতাব সমূহে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র নসবনামা

রাসূলে মাকবুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশতালিকা মোটামুটিভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। সিলসিলায়ে নসবের কিছু অংশে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়।

এ পবিত্র নসবনামা হচ্ছে, সাইয়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আব্দে মনাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা কাব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালিক ইবনে নাদার ইবনে কেনানাহ ইবনে খুজাইমাহ ইবনে মুদরিকাহ ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নাযার ইবনে মা'দ ইবনে আদনান ইবনে আদ ইবনে আরদ ইবনে মাকুম ইবনে নাখির ইবনে তিবরাহ ইবনে ইয়ারব ইবনে ইয়াসতাহিব ইবনে সাবিত ইবনে কায়দার ইবনে ইসমাঈল (আ.) ইবনে ইবরাহীম (আ.) ইবনে তারুখ ইবনে নাখুর ইবনে সারুহ ইবনে রাউ ইবনে ফালিহ ইবনে উবায়র ইবনে শামলূখ ইবনে আরফাহশাদ ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.) ইবনে লামক ইবনে মুতওয়াশালাহ ইবনে আখনু (ইদরীস আ.) ইবনে ইয়ারিদ ইবনে মিহলিন ইবনে কাইনান ইবনে ইয়াইশ ইবনে শীশ (আ.) ইবনে আদম (দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর এবং তাঁর বংশ পরম্পরায় যে সকল নবী রয়েছেন সকলের উপর)

এ নসবনামায় রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে আদনান পর্যন্ত বংশ পরম্পরা সর্বজন স্বীকৃত অর্থাৎ এতে কোন ভিন্নমত নেই। এরপর কিছু অংশে ভিন্নমত থাকলেও পুনরায় কায়দার থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত কোন ভিন্নমত নেই। পুনরায় হযরত নূহ (আ.) হতে আদম (আ.) পর্যন্ত কোন ভিন্নতা মত নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের

বংশ পরম্পরা আদনান পর্যন্ত উল্লেখ করতেন।

এ কথাও উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র নসব জাহিলিয়াতের অন্ধকার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে مواهب لدنيه এর মধ্যে উল্লেখ আছে ঃ

فطهر الله تعالي هذا النسب الشريف من سفاح الجاهلية كما ورد عنه صلي الله عليه وسلم في الاحاديث المرضيته قال ابن عباس فيما رواه البيهقي في سننه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ما ولدني من سفاح الجاهلية شي ما ولدني الانكاح الاسلام ـ

অর্থাৎ - আল্লাহ তায়ালা এ পবিত্র বংশ পরম্পরাকে জাহিলিয়াতের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে পবিত্র রেখেছেন, যেভাবে রাসূল (সা.) এর হাদীস বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যা ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সামান্যতম জাহিলিয়াতের কুসংস্কারের মাধ্যমে আমার জন্ম হয়নি, আমার জন্ম হয়েছে ইসলামী পন্থায় বিবাহের মাধ্যমে।

আরো অনেক বর্ণনা এরূপ রয়েছে যা ইমামগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। নিম্নে এরূপ কতিপয় বর্ণনা উপস্থাপন করা হল-

عن علي بن ابي طالب رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن ادم الي ان ولدني ابي وامي ولم يصبني من نكاح اهل الجاهلية شي رواه الطبراني في الاوسط وابن عساكر

অর্থাৎ- হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি বিবাহের মাধ্যমে জন্মলাভ করেছি, আমি জাহিলী যুগের কুসংস্কারের মাধ্যমে জন্মলাভ করিনি। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আমার পিতামাতা আমাকে জন্ম দেয়া পর্যন্ত আমার পূর্বপুরুষরাও অনুরূপ। জাহিলী যুগের বিবাহ প্রথার সামান্যতমও আমাকে স্পর্শ করেনি।

(উক্ত হাদীস ইমাম তিবরানী আল আওসাত গ্রন্থে ও ইবনে আসাকীর বর্ণনা করেন।)

وروي ابو نعيم عن ابن عباس رض مرفوعا عنه صلي الله عليه وسلم انه قال لم يلتق ابوي قط علي سفاح ـ

ইমাম আবূ নুআইম বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম (সা.) হতে মারুফ সনদে বর্ণনা করেন নবী করীম (সা.) বলেন, আমার পিতামাতা কখনও জাহিলী যুগের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মুখোমুখী হননি।

وقوله صلي الله عليه وسلم لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبة الي الارحام الطاهرة مصفي مزهبا لا تنشعب شعبتان الا كنت في خيرها ـ

অর্থাৎ- রাসূল (সা.)-এর বাণী, আল্লাহ পাক সর্বদা আমাকে স্থানান্তরিত করেছেন পবিত্র ব্যক্তিদের পৃষ্ঠ হতে পবিত্র মহিলাদের রেহেমে আর তাঁরা ছিলেন সত্যপন্থী। তাঁদের বংশধররা দুটি শাখায় বিভক্ত হলে আমি ছিলাম এর উত্তমটিতে। (অর্থাৎ নবী করীম (সা.)-এর পিতৃপুরুষগণ সর্বদাই উত্তম ব্যক্তি ছিলেন)।

وعن ابن عباس رضى الله عنه في قوله تعالي وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِيْنَ ان المراد منه من صلب نبي الي نبي حتي اخرجتك نبيا (رواه بزار) ـ

অর্থাৎ - হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِيْنَ এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন- নবীর পৃষ্ঠে হতে নবীর পৃষ্ঠে আপনাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে; শেষ পর্যন্ত আপনাকে নবী হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। (ইমাম বায্যার এ হাদীস বর্ণনা করেন)

Scanned with CamScanner

وعن ابن عباس رض الله عنه في تفسير قوله وتقلبك في الساجدين اي انتقالك من صلب نبي الي نبي (رواه البزار)

অর্থাৎ- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বলেন, আপনাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এক নবী হতে অন্য নবীর পৃষ্ঠে আপনার (বাযযার)।

وعنه ايضا في تفسير الاية قال مازال النبي صلي الله عليه وسلم يتقلب اي ينتقل في اصلاب الانبياء حتي ولدته امه (رواه ابو نعيم)

অর্থাৎ - হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) এ আয়াতের তাফসীরে আরো বলেন নবী করীম (সা.) সর্বদা নবীদের পৃষ্ঠে স্থানান্তরিত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর মা তাঁকে জন্ম দেন। (ইমাম আবূ নুআইম এ হাদীস বর্ণনা করেন)-

وعن جعفر الصادق ابن محمد عن ابيه محمد الباقر في تفسير قوله تعالي لقد جائكم رسول من انفسكم قال لم يصبه شي من الجاهلية قال محمد وقال النبي صلي الله عليه وسلم من نكاح غير سفاح- هذا مرسل لان محمد تابعي -

অর্থাৎ - হযরত যাফর সাদিক ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মদ আল বাকী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, নবী করীম (সা.)-এর জন্মের মধ্যে জাহিলিয়াতের কোন কিছু স্পর্শ করেনি। নবী করীম (সা.) আরো বলেন, বিবাহ প্রথার মাধ্যমে আমার জন্ম, কুসংস্কারের মাধ্যমে নয়। এই হাদীস মুরসাল, কেননা মুহাম্মদ তাবিয়ী ছিলেন।

وعن انس رضي الله عنه وهو ابن مالك من النضر الانصاري الخزمي الصحابي الشهير بخادم المصطفي مات سنة اثنين وقيل ثلاث وتسعين قال قرء النبي صلي الله عليه وسلم لقد جائكم رسول من انفسكم وقال انا انفسكم نسبا وصهرا و حسبا ليس في ابن من لدن ادم سفاح كنا بنكاح (رواه ابنا مردوية)

অর্থাৎ- হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নদ্বর গোত্রের আনসারী সাহাবী মালিকের ছেলে। তিনি খাদিমুল মুস্তফা (সা.) উপাধিতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ৯২ অথবা ৯৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের মধ্য থেকে বংশগতভাবে, বৈবাহিক সূত্রে ও মর্যাদায় অতুলনীয় হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে আমার পিতৃ পুরুষের মধ্যে কুসংস্কার ছিল না; আমরা বিবাহের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছি। (এ হাদীস ইবনু মারদুইয়া বর্ণনা করেন)।

وفي الدلائل لابي نعيم عن عائشة رضي الله تعالي عنها عنه صلي الله عليه وسلم عن جبرئيل قال قلبت مشارق الارض ومغاربها اي فتشتهم فلم ار رجلا افضل من محمد عليه الصلوة والسلام ولم اربني اب افضل من هاشم وكذا اخرجه الطبراني في الاوسط وقال الحافظ ابن حجر (رح) لوائح الصحة لائمة علي صفحات هذا المتن -

অর্থাৎ- হযরত ইমাম আবূ নুআইম তাঁর দালাইল নামক গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, আমি সমগ্র পৃথিবীর প্রাচ্য এবং পশ্চাত্য পরিভ্রমণ করেছি অর্থাৎ পৃথিবীর সকলকে পর্যবেক্ষণ করেছি; কিন্তু এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে উত্তম। আর হাশিমী বংশের চেয়ে উত্তম কোন বংশও দেখিনি। (অনুরূপ একখানা হাদীস ইমাম তিবরানী তাঁর আল আওসাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন।)

وفي البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه صلي الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتي كنت من القرن الذي كنت فيه -

অর্থাৎ- বুখারী শরীফে আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)থেকে বর্ণিত ঃ তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, আদম সন্তানের উত্তম বংশ থেকে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ভাবে যুগে যুগে বংশ পরম্পরায় অবশেষে আমি সেই বংশ হতে জন্ম নিলাম, যে উত্তম বংশে ছিলাম।

অবিসংবাদিত নসবনামার বিবরণ

আবদুল মুত্তালিব ঃ রাসূল (সা.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের আসল নাম ছিল শাইবাতুল হামদ(شيبة الحمد)। আবদুল মুত্তালিব হিসেবে পরিচিতি লাভ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে দুটি কারণ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত ঃ তাঁর পিতা হাশিম মৃত্যুকালে নিজ ভাই মুত্তালিবকে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর ইয়াসরিব থেকে তুমি নিজের গোলামকে (عبد) নিয়ে আসবে। এর অর্থ হলো তাঁর সন্তান شيبة الحمد কে নিয়ে আসা। এজন্য তাঁর নাম আবদুল মুত্তালিব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ আবদুল মুত্তালিবের পিতার মৃত্যুর পর আবদুল মুত্তালিবের মা সন্তানকে সংগে নিয়ে মদীনা মনোওয়ারায় চলে গিয়েছিলেন। সে সময় ঐ জায়গার নাম ছিল ইয়াসরিব। এ ছেলে কিছুটা বড় হওয়ার পর বাচ্চাদের সাথে খেলা-ধূলায় মশগুল থাকতেন। খেলাধুলার মধ্যে একদা বাচ্চাদের মধ্যে মনোমালিন্য হল। এক ছেলে বলল, তোমরা বিদেশী, আমাদের সাথে তোমাদের তুলনা হয় না। এতে আবদুল মুত্তালিব মনে দুঃখ পেলেন এবং মাকে তা বললেন। তখন তাঁর মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ঐ বাচ্চাদের কথায় তোমার কিছুই হবে না; যেহেতু তোমাদের বংশের মতো লোক দুনিয়াতে নেই। তুমি কুরাইশ বংশের সন্তান। এ কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর বংশের লোকজনের কাছে খবর প্রেরণ করলেন, আমার অভিভাবক যদি কেউ থাকেন, তা হলে তিনি যেন আমাকে এসে তাড়াতাড়ি নিয়ে যান। এ খবর পেয়ে তাঁর চাচা মুত্তালিব উটে আরোহণ করে ইয়াসরিব পৌঁছলেন। তাঁর ভাতিজাকে পাওয়ামাত্র সেখান হতে ময়লা যুক্ত কাপড় পরা অবস্থায় উটের উপর আরোহণ করালেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন। রাস্তায় যখন লোকদের সাথে দেখা হত, তখন মানুষ তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, মুত্তালিব, তোমার সাথে এ কে? উত্তরে তিনি বলতেন ঃ "আমার গোলাম"। আস্তে আস্তে এ কথা প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাঁর নাম আবদুল মুত্তালিব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

আর شيبة এর নামকরণ সম্পর্কে কেউ কেউ লিখেন, জন্মের পরই তার কপালের কিছু চুল সাদা দৃষ্ট হয়, এ জন্য তাঁকে شيبة অর্থাৎ বৃদ্ধ বলা হত।

মক্কার মধ্যে আবদুল মুত্তালিবই প্রথম ব্যক্তি যিনি কাল খিজাব ব্যবহার করেন। আবদুল মুত্তালিব ১৪০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

হাশিম

তাঁর আসল নাম ছিল উমর। হাশিম হওয়ার কারণ হচ্ছে, দুর্ভিক্ষের যুগে তিনি গোশত ও রুটি মিলিয়ে মানুষকে খাওয়াতেন। এটা তাঁর মেহমানদারীর পরিচায়ক ছিল।

রাসূল (সা.)-এর নূর তাঁর কপাল মুবারকে ঝলমল করত। তৎকালের পাদ্রী এবং

Scanned with CamScanner

বিদ্যান লোকেরা যখনই তাঁকে দেখতেন, তাঁর হাতে চুমো খেতেন। নূরে মুহাম্মদ (সা.)-এর কারণেই আরবের সকল গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। এমনকি রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস নিজের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কেননা তাঁর মেহমানদারী ও বদান্যতা সকলকে মোহিত করেছিল। ইনজীলে তার প্রশংসা বর্ণিত ছিল। কিন্তু হাশিম এ সকল মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তাঁর বয়স নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন, বিশ বছর আবার কেউ বলেন পচিশ বছর জীবিত ছিলেন। (যুরকানী)

বনু উমাইয়া এবং বনি হাশিমের মধ্যে শত্রুতা ছিল, যেহেতু আবদুশ শামস এবং হাশিম যমজ ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনের কপাল পরস্পর সংযুক্ত ছিল। এ সব কথা مداحر النبوة - এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। এ কথা খুবই পরিচিত যে, দু'জনের পিঠও কুঁকড়ানো ও লাগানো ছিল। যুরকানী কিতাবে রয়েছে, হাশিমের পদাংগুল আবদে শামসের কপালের সাথে লাগানো ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে পৃথক করার সময় তরবারীর প্রয়োজন দেখা দেয়। এরক্ত ঝরানোর ফলে উভয়ের পরবর্তী বংশের মাঝে তরবারী স্থান করেছিল অর্থাৎ সব সময়ই হিংসা ও হানাহানি লেগেই থাকত।

আবদে মনাফ

তাঁর নাম হচ্ছে মুগীরা। তাঁর পিতার জীবনকালেই তিনি নেতৃত্ব দেন। বিশেষ করে কুরাইশ বংশে তাঁর খ্যাতি ছিল। যেহেতু তিনি অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন, এ জন্যে তাঁকে চন্দ্র বলা হত। ওয়াকিদী বলেন, তাঁর চেহারায় মুহাম্মদ (সা.)-এর নূর ঝলমল করত। তাঁর হাতে সতর্কতার ঝান্ডা এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর ধনুক ছিল। হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত মূসা বিন উকবা থেকে বর্ণনা করেন যে, একটা পাথর পাওয়া গিয়েছিল, যাতে লেখা ছিল انا المغيرة بن قصي امر بتقوي الله وصلة الرحم অর্থাৎ আমি হলাম মুগীরা বিন কুসাই। আমি আল্লাহকে ভয় করা এবং প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখার নির্দেশ করে দেই-

কুসাই

তাঁর নাম ছিল মুজাম্মি। হযরত হাকিম আবূ আহমদ (রা.) হযরত ইমাম শাফিয়ী (রা.) থেকে রিওয়ায়ত করেন, তাঁর নাম ইয়াজিদ ছিল। অন্য রিওয়ায়তে আছে হযরত ইমাম শাফিয়ী (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁর নাম যায়েদ ছিল। তা ছাড়া ইমাম মাওয়ারদী নিম্নের কবিতার দ্বারা শেষোক্ত অভিমতের পক্ষ দলিল পেশ করেন ঃ

وانتم بنو زيد وزيد ابوكم ÷ به ابدت البطر فخرا علي فخر

এখানে দেখা যায় যায়িদ ব্যবহার করা হয়েছে। কুসাই এর হাতে সকলের আগে তাঁর গোত্রের নেতৃত্ব তথা কাবার গিলাফ, জমজম, নেতৃত্বের পতাকা এসব কিছুর দায়িত্ব চলে আসে। গোত্রের মধ্যে সব দিক দিয়ে তাঁরই সম্মান ও মর্যাদা বেশী ছিল। তিনি খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিলেন। কুরাইশের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম এবং ন্যায়বিচারক ছিলেন। ইবনে কিলাব বলেন, তাঁর নাম হাকীম বা বিচারক ছিল।

মুররাহ

তিনি প্রথমে আরুবার জন্যে মানুষকে একত্রিত করতেন। আরুবা বলা হয় জুমআর দিনকে। তিনি ঐদিন কুরাইশদেরকে একত্রিত করে ভাষণ দিতেন। সেই ভাষণ বা খুতবায় রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিতেন। রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ

এবং তার উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিতেন।

ফহির

তাঁর নাম ছিল কুরাইশ। কুরাইশ বংশ তাঁরই নামানুযায়ী হয়। ফিহিরের পরবর্তী বংশধরদেরকে কুরাইশ এবং পূর্ববর্তী বংশধরদেরকে কেনানী বলা হয়। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া কিতাব প্রণেতা উক্ত অভিমতকে সত্য বলেছেন। প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন-

ان الله اصطفي كنانة من ولد اسماعيل (ع) واصطفي قريشا من كنانة ـ الحديث

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কেনানাকে নির্বাচন করেন ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হতে এবং কেনানা থেকে কুরাইশকে নির্বাচন করেন। এ হাদীসখানি ইমাম তিরমিযী রিওয়ায়াত করেন। অধিকন্তু, ইমাম নববী (র.) ঐ হাদীসকে শুদ্ধতম বলে সাব্যস্ত করেন।

কুরাইশ নামকরণের কারণ

এ শব্দটি قـــرش শব্দের তাসগীর। এটা সমুদ্রের বড় একটা জানোয়ারের নাম, যা অন্য জানোয়ারকে খেয়ে ফেলে। কিন্তু কোন জানোয়ার একে খেতে পারে না। এ জানোয়ার অন্য জানোয়ারের উপর বিজয় লাভ করে। অন্য জানোয়ার এ জানোয়ারের উমর জয় লাভ করতে পারে না। এই অবস্থা কুরাইশদের। এ ব্যাপারে কবি শমরখা ইবনে উমর আলী হুমায়রী কবিতা লিখেন -

قريش هي التي تسكن البحر ÷ بها سميت قريش قريشا
تاكل الغث والسمين ولا يترك ÷ فيه لذي الجناحين ريشا
هكذا في البلاد حتي قريش ÷ يأكلون البلاد اكلا كميشا
لهم اخر الزمان نبي ÷ يكثر القتل فيه مود الخوشا
بملاء الارض خيلة ورجال ÷ يحشرون المطي حشرا كشيشا

অর্থাৎ কুরাইশ হচ্ছে যারা পানিতে বাস করে। এ জন্যে কুরাইশকে কুরাইশ নামে অভিহিত করা হয়।

কুরাইশ নামক জানোয়ার আবর্জনা ও মাংস জাতীয় জিনিষ- কিছুই বাদ দেয় না সব খেয়ে ফেলে। তার দুটি পাখা আছে আর পশম আছে।

এভাবে কুরাইশরা দেশ ও শহরকে নির্বিচারে খাচ্ছে অর্থাৎ শাসন করছে।

শেষ নবী তাদের থেকেই আসবেন। অনেক হত্যাকান্ড ঘটবে।

যমানার নেতা গোচের লোক তাদের থেকে হবে এবং অনেক আরোহী হাজির করা হবে।

নদর

তাঁর নাম কাইস, তাঁর উপাধি নদর। নদর বলা হয় লাল হওয়াকে। তাঁর চেহারার সৌন্দর্য্য এবং সুন্দর হওয়ার কারণেই তার উপাধি নদর হয়েছে।

খুযাইমা

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, খুযাইমা ইবরাহীম (আ.)-এর দীনের উপরেই মৃত্যু বরণ করেন।

ইলিয়াস

তিনি সর্বপ্রথম বায়তুল হারামের দিকে উটের হাদী পাঠাতেন। কিতাবুর রওদ এর

Scanned with CamScanner

মধ্যে উল্লেখ রয়েছে তাঁর আপন পৃষ্ঠ থেকেই হযরত (সা.) এর اللهم لبيك অর্থাৎ তলবীয়ার আওয়ায শুনা যেত। তিনি খুবই সুন্দর লোক ছিলেন।
ইমাম সুহাইলী রাসূল (সা.) থেকে বলেন,

لا تسبوا الياس فانه كان مؤمنا

রাসূল (সা.) থেকে বলেন ইলিয়াসকে গালি দিও না। কেননা, তিনি মুমিন ছিলেন। বুরহান বলেন, আমি এ হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নই।

মুদার

মুদারকে যে কোন লোক প্রথম সাক্ষাতেই ভালবাসতেন। তিনিই প্রথম উট পরিচালনার জন্য বিশেষ ধরনের গানের প্রচলন করেছিলেন। তিনিও খুব সুন্দর লোক ছিলেন। কণ্ঠস্বরও খুব বেশী মিষ্টি ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন খালিদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

لا تسبوا المضرفانه كان قد اسلم

মুদ্বারকে গালি দিও না; কেননা তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। নেজার نـذار শব্দটির ن এর নীচে কসরা বা জের দিয়ে পাঠ করতে হবে। তিনি ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাঁর চেহারায় নূরে মুহাম্মদী দেখে তাঁর পিতা খুবই খুশী হয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি তার সমসাময়িক কালে সুন্দরতম এবং জ্ঞানী লোক ছিলেন। তাঁর তুলনা ছিল না। তাঁর কবর মদীনার নিকট ذي الحبش (যিল জাইশ) এ অবস্থিত (الوفاء)।

আদনান

ইনি প্রথম ব্যক্তি যিনি কাবা শরীফকে গিলাফ পরান, অথবা তাঁর যামানায় সর্বপ্রথম কাবা শরীফে গিলাফ পরানো হয়েছে।
রাসূল (সা.)-এর সিলসিলায়ে খান্দানের মধ্যে নবুয়তের নূরের সৃষ্টি হওয়া এবং অনেক আলৌকিক ঘটনার প্রকাশ সাবিত আছে। এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি-
হযরত আবূ বকর বিন আবূ মরিয়ম থেকে বর্ণিত, তিনি সাদ বিন আমর আল আনসারী থেকে রিয়াওয়ত করেন। তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়ত করেন। তিনি কাব আল আহবার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, (তিনি ছিলেন উলামার হুমারীর আলিমগণের অন্যতম) নবী করীম (সা.)-এর নূর যখন আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে স্থানান্তরিত হল, তখন তিনি তা বুঝতে পারতেন। একদা তিনি ঘরে ঘুমিয়েছেন। জাগ্রত হয়ে দেখেন তাঁর চোখে সুরমা ও তৈল লাগানো। তা দেখে তিনি হতবাক হলেন! তিনি জানেন না, কে এ কাজ করেছে, তাঁর পিতা তাঁকে কুরাইশের গণকের কাছে নিয়ে গেলেন এবং এ সব ব্যাপার খুলে বললেন। তখন সে বলল, জেনে রাখ, আকাশের স্রষ্টা এ গোলামকে বিয়ের অনুমতি দিচ্ছেন। তখন কায়লাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেয়া হয় এবং হারিস নামে একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তারপর কয়লা মৃত্যুবরণ করেন অতঃপর তিনি হিন্দা বিনতে আমরকে বিয়ে করেন।
হযরত আল্লামা যুরকানী লিখেন, হিন্দ নামের ভিতর পরিবর্তন আছে। তাঁর আসল নাম হচ্ছে ফাতিমা। كتاب الخميس নামক কিতাবে আছে, আবদুল মুত্তালিব এর পাঁচ জন স্ত্রী ছিলেন। (১) সফিয়া বিনত জুনদুব ইবনে বনি আমির বিন সা'সা' (২) (২) ফতিলা বিনতে জনাব ইবনে কুলাইব বিন মালিক বিন আমর ইবনে আমীর (৩) হালা বিনতে উহাইব ইবনে আবদে মুনাফ ইবনে জুহরা (৪) আমিনা বিনতে বাজির

খাজায়ী (৫) ফাতিমা বিনত আমর বিন যায়িদ ইবনে আমর ইবনে মাখযুম।
শেষোক্ত স্ত্রীর মোহরানা বাবৎ এক শ' উট এবং দশ আওকিয়া স্বর্ণ দেয়া হয়েছিল। তাঁর গর্ভ থেকে যে সকল সন্তান হয়েছিলেন, এঁদের মধ্যে রাসূল (সা.) পিতা ছিলেন। আবদুল মুত্তালিব-এর শরীর আবদুল্লাহও ছিলেন, থেকে মেশক ও জাফরানের খুশবু বের হত। তাঁর কপাল থেকে রাসূল (সা.)-এর নূর এর ঝলক বের হত। কুরাইশদের মধ্যে যখন অভাব অনটন দেখা দিত, মানুষ তাঁর হাত ধরে শবীর পাহাড়ে নিয়ে যেত এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য দুআ করত এবং আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করত।
রুকিয়া বিনতে আবু সাইফী বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ রাসূল (সা.)-এর ওসীলায় এবং আবদুল মুত্তালিবকে মাধ্যম ধরে বৃষ্টির প্রার্থনা প্রসঙ্গে কবিতা রচনা করেন-

بشيبة الحمد اسقي الله بلدنا ÷ وقد فقدنا الحياء واجلوذ امطر
فجاء بالماء جولي له سبل ÷ وان فعاشت به الانعام والشجر
منا من الله الميمون طائره ÷ وخير من بشرت بوما به مضر
مبارك الامر يتقي الغمام به ÷ ما في الانام عدل ولا مطر

এভাবে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.)-এর বরকতে তাদের দুআ কবুল করতেন এবং তাদেরকে রহমতের বৃষ্টি দিয়ে সিক্ত করতেন। এরূপ বার বার পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইলহামের মাধ্যমে অবদুল মুত্তালিবকে বর্বর যুগের অনাচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখেন। এজন্য তিনি নিজের সন্তান-সন্ততি কে অত্যাচার করা থেকে নিবৃত্ত করতেন এবং ভাল চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করতেন ও প্রেরণা দিতেন এবং অসৎ চরিত্র থেকে বিরত রাখতেন যা পরবর্তীতে কুরআন, হাদীসও নিষেধ করেছে। যেমন- কোন কিছু মানত করলে তা পূরণ করা, মুহরিমকে বিয়ে না করা, চোরের হাত কাটা, জীবিত অবস্থায় সন্তান কবরস্থ না করা, যিনা না করা, উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফের তওয়াফ না করা ইত্যাদি (ইবনুল জাওযী)।

হাতী বাহিনীর ঘটনা

আবরাহার কাবা শরীফ থেকে চলে যাওয়া এবং আবদুল মুত্তালিবের কাছে পরাজয় বরণ করা প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সা.)-এর বরকতে হয়েছে। এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা হল- তখন মুহররম মাস ছিল। রাসূল(সা.) মায়ের গর্ভে ছিলেন। আবরাহা বিন আল সাবাহ আল আশরাম কাবা শরীফ ভাঙার জন্যে আসে। নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে আবরাহা ইয়ামনএর উপর বিজয় লাভ করে স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করেছিল। যখন সেদেখল, মানুষ হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে সফর করছে। সে জানতে চাইল, এ সব লোক কোথায় যাচ্ছে? লোকেরা বলল এরা মক্কা মুকররমায় হজ্জের জন্য যাচ্ছে। আবরাহা জিজ্ঞেস করল, যে ঘরে হজ্জ করার জন্যে এ সকল লোক যাচ্ছে, সেই ঘর কি দিয়ে বানানো হয়েছে? লোকেরা জওয়াব দিল, তা পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে। যতটুকু সম্ভব ভাল কাপড় দিয়েই ঐ ঘরের গিলাফ পরানো হয়। তখন আবরাহা বলে, মসীহ এর কসম, আমি তোমাদের জন্য এর চেয়েও ভাল একটা ঘর বানাব। অতঃপর বিভিন্ন রং-এর পাথর দিয়ে একটি গীর্জা বানালো। ঐ ঘর সোনা রূপা মনি মুক্তা দিয়ে অলংকৃত করলো। আহলে ইয়ামনকে গীর্জা বানানোর জন্যে বাধ্য করল। বিভিন্ন ধরনের কাপড় দিয়ে তা সজ্জিত করল।

Scanned with CamScanner

লোকজনকে বাধ্য করে এক ফরসুখ দূর হতে বিলকিসের সিংহাসন থেকে নকশা করা মূল্যবান পাথর আনা হল এবং মধ্যে সোনা-চান্দির বোটা লাগালো। হাতির দাঁত দিয়ে মিম্বর বানালো। এতো বেশী উঁচু করে বানালো, তার উপর দাঁড়ালে আদন পর্যন্ত দেখা যেত। এজন্য এর নাম দেয়া হয়েছে কুল্লাইস। কারণ এর উচ্চতার দিকে তাকালে টুপি মাথা থেকে পড়ে যেত। আবরাহা যখন ঐ ঘরে ঘরের দিকে হাজীদের ফিরানোর ইচ্ছা করলো, তখন নাজ্জাশীর কাছে চিঠি লিখল, আমি বাদশাহর নাম দিয়ে একটা গীর্জা বানিয়েছি, যা সত্যিই অপূর্ব। আমি আরবের হজ্জকে এ গীর্জার দিকে প্রত্যাবর্তন করাতে চাই। ভবিষ্যতে আরববাসীদেরকে মক্কা শরীফ যেতে নিষেধ করা হবে। এ খবর যখন আরববাসীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো তখন বনী কেনানার একজন লোক গিয়ে সেই গীর্জায় মল ত্যাগ করে দিল। আবরাহা কর্তৃক কাবা শরীফ হামলা করার কারণ ছিল এটাই।

কেউ কেউ বলেন- আরবের কিছু সংখ্যক যুবক আগুন জ্বালিয়েছিল এবং বাতাস সেই আগুন উড়িয়ে নিয়ে সেই গীর্জার লাকড়ীতে লাগিয়ে দিয়েছিল যে কারণে সেই গীর্জা জ্বলে গিয়েছিল। এতে রাগান্বিত হয়েই আবরাহা কাবা শরীফ ভাঙার জন্য উদ্যত হয়েছিল।

কাবা শরীফের দিকে রওয়ানা হওয়ার আগে বাদশাহ আসহামার কাছে থেকে হাতী চেয়ে নিয়েছিল। সে হাতীর বহরে মাহমুদ নামীয় একটা হাতীও ছিল। সাথে ছিলষাট হাজার সৈন্য। রাস্তায় দু'বার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু সে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেও চলে গিয়েছিল। তায়েফ পৌছার পর তায়েফ বাসীরা আবূ রিগালকে তার তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছিল। মক্কা এবং তায়েফের মাঝখানে পৌছার পর আবূ রিগাল মারা যায়। তখন থেকেই আরববাসী এ কবরের উপর পাথর মেরে আসছে। এ জায়গায় নাম মুগাম্মিছ (مغمس)। এরপর সে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে আবদুল মুত্তালিবেরসকল উট নিয়ে গিয়েছিল। তবে আবদুল মুত্তালিব যখন আসলেন, তখন তাকে তার উট ফেরত দেয়। আবদুল মুত্তালিব মক্কাবাসীকে উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বলেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা পাহাড়ের শৃঙ্গে চলে যাও। এরপর আবদুল মুত্তালিব কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে কাবা শরীফের দরজার চৌকাট ধরে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তারা আবরাহার মুকাবেলার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

আবদুল মুত্তালিব নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে ফরিয়াদ করেন-

لاهم ان المرء يمنع ÷ رحله فامنع حلالك
وانصر علي ال الصليب ÷ وعابدية اليوم الك
لا يغلبن صليبهم ÷ ومحالهم ابدا محالك

১. হে আল্লাহ! এ লোকটিকে নিবৃত্ত করুন। তার আরোহী যেন কাবা ঘরের সাজ-সরঞ্জাম ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকে।

২. এ ক্রস চিহ্নধারীদের মুকাবিলায় সাহায্য কর। তোমার সম্প্রদায় আজ বিপদে আছে।

৩. এ ক্রসধারীরা যেন বিজয়ী না হয়। তাদের শক্তি সর্বদা তোমার বিরুদ্ধে।

আর দুটি কবিতার চরণ আবৃত্তি করলেন-

جروا جميع بلادهم ÷ والفيل كي يسبوا عيالك
عمدوا حماك بكيدهم ÷ جهلا وما رقبوا جلالك

অতপর আবদুল মুত্তালিব নিজের সাথীদেরকে নিয়ে কাবা শরীফের দরজার চৌকাট

ছেড়ে পাহাড়ের উপর গেলেন যেন আবরাহার অমানবিক আচরণ ও দাম্ভিকতা দেখতে না হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। নিচে এর বর্ণনা করা হল।

আবার অন্য রিওয়ায়তে আছে, আবদুল মুত্তালিব মক্কা শরীফের বাইরে যাননি; বরং মক্কা শরীফের কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন আবরাহা কি করছে।

আবরাহা বাদশাহ নজ্জাসীর পক্ষ থেকে কীভাবে ইয়ামেনের মালিক হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা প্রয়োজন। যখন ইয়ামেনের বাদশাহ জু-নওয়াস "আসহাবে উখদুদ" গোত্রকে নির্বিচারে হত্যা আরম্ভ করল, তখন ইয়ামেন থেকে একজন লোক পালিয়ে সিরিয়ার বাদশার কাছে গিয়ে সাহায্য কামনা করে। সিরিয়ার বাদশাহ কায়সার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট এ লোকটিকে সাহায্য করার জন্য চিঠি লিখে। (আলোচ্য নজ্জাশী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়কার নাজ্জাশীর দাদা ছিলেন।)

নাজ্জাশী প্রতিনিধির সংগে আমীর বিন ইরবাত ও আবরাহাকে একটা বিরাট সৈন্যদল দিয়ে ইয়ামেনের দিকে প্রেরণ করলেন। এরা দু'জনে ইয়ামেন পৌছে তথাকার বাদশাহ জু-নুয়াসকে হত্যা করে তথাকার রাজত্বের উপর চেপে বসেন। এরপর আমীর ইবরাত এবং আবরাহা এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আবরাহা আমীর বিন ইবরাতকে হত্যা করে এবং সে সময় আবরাহার নাক, ঠোঁট, চোখ এবং চোখের পলক কেটে গিয়েছিল। এ জন্যে তার নামের সাথে আশরাম উপাধিও সংযোজিত হয়েছিল। পরে অবশ্য চিকিৎসা দ্বারা ভাল হয়েছিল। এ কথা শুনে নাজ্জাশী বেশ রাগান্বিত হয়। কিন্তু আবরাহা তাকে উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়ে খুশী করে ফেলে। তাই নাজ্জাশী তাকে তথাকার রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। যখন আবরাহা কাবা শরীফ বিধ্বস্ত করার জন্যে আসে, তখন আবদুল মুত্তালিব খবর পেয়ে মক্কাবাসীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আবরাহা এ ঘর পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। কারণ এ ঘরের একজন মালিক আছেন। তিনিই এ ঘর সংরক্ষণ ও হিফাযত করবেন। আবরাহার লোক ওখানে পৌছার পর কুরাইশদের উট ছাগল নিয়ে যায়। এর মধ্যে চার শ' উট আবদুল মুত্তালিবের ছিল।

আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে নিয়ে শাবীর পাহাড়ের উপর উঠেন। তাঁর কপাল থেকে নতুন চাদের ন্যায় রিসালতে রাসূল (সা.)-এর নূর ঝলমল করে বায়তুল হারামে পড়ে। যখন আবদুল মুত্তালিব ঐ আলো দেখেন তখন নিজ গোত্রকে সম্বোধন করে বলেন হে কুরাইশ, তোমরা ফিরে যাও। আল্লাহর কসম আমার থেকে এ আলোকচ্ছটা বের হওয়া মানে আমাদের বিজয়ের প্রতীক।

তখন কুরাইশরা চলে গেল। আবরাহা নিজের গোত্রের একজন লোককে মক্কার লোকজনকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে মক্কায় পাঠিয়েছিল। কিন্তু তার দৃষ্টি আবদুল মুত্তালিবের চোহারার উপর পড়ার সাথে সাথে লোকটি বেঁহুশ হয়ে পড়ে যায়। পরে যবেহকৃত গাভীর গলা থেকে যে শব্দ আসে, তার গলা হতে এমনিই আওয়াজ বের হচ্ছিল। অনেক দেরীতে হুশ আসার পর আবদুল মুত্তালিবের সামনে সিজদায় পড়ে বলতে লাগল- اشهد انت سيد قريش حقا আমি এ কথায় সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি কুরাইশের সত্য নেতা। এ বিষয়টি আল্লামা কসতলানী (র.) উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আবরাহা حناطة الحميري-কে মক্কায় পাঠিয়েছিল। সে বলেছিল তোমরা গিয়ে তথাকার সরদারকে বল, যদি সে আমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তা হলে আমার রক্তপাত করার ইচ্ছে নেই। কারণ আমি রক্তপাত করার জন্যে আসিনি। বরং আমরা

Scanned with CamScanner

শুধু কাবাকে ধ্বংস করার জন্যে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব জওয়াব দিলেন, আমরা যুদ্ধ করতে চাই না এবং আমাদের লড়াই করার শক্তিও নেই। তখন হানাত বলে, তুমি আমার সাথে আবরাহার নিকট চল। আবরাহা তোমাকে সংগে নেয়ার জন্যে বলেছে। আবদুল মুত্তালিব তার ৬ জন সন্তানকে সাথে নিয়ে গেলেন। আনিস নামক একজন লোক বলল, হে বাদশাহ, তিনি কুরাইশের সরদার আপনার দরজায় দন্ডায়মান, যিনি মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করেন, জানোয়ারদেরকেও আপ্যায়ন করেন পাহাড়ের উপর পাখীদেরকে আহার করান, এ কথা শুনে আবরাহা তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। আবরাহা আবুদল মুত্তালিবের মহত্ব ও জালালিয়াত দেখে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। আবদুল মুত্তালিবকে নীচে বসানো সন্মানের হানি মনে করল। আবার সিংহাসনে বসানো হাবশীদের অসন্তুষ্টির কারণ হবে বিধায় আবরাহা এ সিংহাসন ছেড়ে নীচে এসে আবদুল মুত্তালিবের সংগে বসল। দোভাষীকে বলা হল তাকে জিজ্ঞেস কর, তার কি প্রয়োজন। আবদুল মুত্তালিব জওয়াব দিলেন, আমি আমার উটের জন্য এসেছি। আবরাহা বলল, উটের কথা বলছ এবং তোমাদের ধর্মের ঘর সম্পর্কে কিছু বলছ না! আবদুল মুত্তালিব বলেন, উটের মালিক আমি এবং ঐ ঘরের মালিক অন্য একজন। তিনি নিজেই তাঁর ঘর হিফাযত করবেন।

মোট কথা আবরাহা উট ফিরিয়ে দিলে আবদুল মুত্তালিব সকল উটকে হার পরিয়ে পরিয়ে কুরবানীর নিয়তে কাবা শরীফের দিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং সকল উট কুরবানী দিলেন। বর্ণিত আছে, যখন আবদুল মুত্তালিব উপস্থিত হলেন, আবরাহা নিজের শ্বেত বর্ণের হাতীর চালক লোকটাকে বলল, তুমি সাদা হাতিটা নিয়ে আস। হাতী যখন আবদুল মুত্তালিবের সামনে এল তখন দ্রুত বসেই সিজদায় পড়েগেল। আল্লাহ তায়ালা সেই হাতীকে কথা বলার শক্তি দিয়েছিলেন। হাতিটা বলতে লাগল ঃ

السلام علي نور الذي في ظهرك ياعبد المطلب

অর্থাৎ হে আবদুল মুত্তালিব, আমার সালাম ঐ নূরের প্রতি যে নূর তোমার পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান রয়েছে।

বিষয়টি আল্লামা কসতলানী উল্লেখ করেন। এ সাদা হাতি অন্যান্য হাতীর ন্যায় বাদশাহকেও সালাম করত না। শুধু নূরে মুহাম্মদী (সা.) এর সন্মানার্থে আবদুল মুত্তালিবকে সিজদা করেছিল। এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। যদি হাতীর ঘটনার দুবৎসর পরেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম হয় তা হলে আবদুল মুত্তালিবের পৃষ্ঠে নূর হওয়াটার রিওয়ায়াত কীভাবে মেনে নেওয়া যায়? এর জওয়াব হচ্ছে বোতল থেকে আতর শেষ হয়ে গেলেও অনেক দিন পর্যন্ত বোতলের মধ্যে আতরের ঘ্রাণ বা চিহ্ন থাকে।

যখন আবরাহা হাতী আর সৈন্য নিয়ে মক্কা ধ্বংস করার জন্য মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করল, তখন সকল হাতী বসে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে উমাইয়া বিন সলত এ কবিতা পাঠ করেন-

ان ايات ربنا بينات ـ ما يري بهن الا الكفور
حلس الفيل بالمغمس ـ حتي ظل يحبو كانه معقود

১. অর্থাৎ আমাদের পরওয়ারদিগার তার কুদরতের প্রতীকসমূহ প্রকাশ করলেন যা কাফির লোক এর আগে আর দেখেনি।

২. মুগাম্মিস নামক জায়গায় হাতীরা বসে পড়ল যেন তারা ছিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হাতীর চালক হাতীর মাথায় যথাশক্তি মারল বটে ; কিন্তু হাতী উঠলা না। যখন

ইয়ামনে যেতে চাইল, তখন তাড়াতাড়ি হাতি উঠে দাঁড়াল যেন পালিয়ে যাবে।

নফীল এ সম্পর্কে কবিতা রচনা করেন

اين المفرو الا له الطالب ÷ والاشرم المغلوب ليس الغالب

অর্থাৎ কী অবস্থা এসব পলায়নকারীদের। নাক কাটা লোকটি পরাজিত হল, জয়ী হলো না!

আল্লাহ আবাবীল পাখীকে প্রেরণ করেছিলেন। এ পাখীগুলো প্রত্যেকেই সমুদ্র থেকে তিনটি করে পাথর এনেছিল। দু'পায়ে দু'টি পাথর, ঠোঁটে একটা পাথর। ঐ পাথরগুলো ডালের মতো ছিল। যার গায়ে এ পাথর লেগেছিল, সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আবরাহার এক ধরনের অসুখ হল, তার শরীর অল্প অল্প করে ঝরে যেতে লাগল, শেষ তার কলব ফেটে মরে গিয়েছিল। মৃত্যুর অবস্থায় এমন দুর্গন্ধময় রক্ত আর পুঁজ বের হয়েছিল যে, কোন লোক তার কাছে আসতে পারেনি। আবরাহার উজীর আবু ইয়াকসূম পলায়ন করেছিল এবং তার পাখীটা তার সংগে সংগে গিয়েছিল। যখন নজ্জাশীর কাছে গিয়ে এ কাহিনী বলে শেষ করল; তখন পাখিটা তার উপর পাথর নিক্ষেপ করল এবং সাথে সাথে সে মারা গেল।

আল্লাহ তায়ালা তার হাবীব (সা.)-কে এ ঘটনার দিকে اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ বলে ইশারা করেছেন।

এর উপর একটা প্রশ্ন করা যায়, এ ঘটনা তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের পূর্বের। তা-হলে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা الم تر كيف বলে সম্বোধন করেন ?

প্রথম জওয়াব হচ্ছে এই- এ ঘটনা মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আর এ ধরনের ঘটনা চাক্ষুষ দেখার মত।

দ্বিতীয় জওয়াব হল- এখানে অর্থ الم تعلم وتذكر به অর্থাৎ তুমি কি জান না এবং এ ঘটনা কি উল্লেখ করা হয়নি?

আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে, আবরাহা কাবা শরীফের সাথে বেয়াদবী করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর হাজ্জাজবিন ইউসুফ কাবা শরীফ ভাঙ্গার পরও কেন ধ্বংস হয়নি ? এর জওয়াব হচ্ছে

واقعه اصحاب الفيل كان ارهاصا لنبينا ﷺ وواقعة حجاج بعد الظهور والارهاص يحتاج اليه قبل الوجود وبعد الظهور لا يحتاج الي الارهاص اي التاسيس

অন্য একটি উত্তর হল- আবরাহার উদ্দেশ্য ছিল কাবা শরীফকে ধ্বংস করা ও মর্যাদাহানী করা। পক্ষান্তরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উদ্দেশ্য কাবা শরীফ ভাঙ্গা ছিল না: বরং আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-কে হত্যা করাই উদ্দেশ্য ছিল।

নোট ঃ ১. আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম খলীফা আবু আব্বাস سفاح এর যামানায় ফীল ধ্বংস করা হয়।

২.

قال ابن اسحاق ولم كلمه حجارة عن عائشة قالت لقد رايت قائد الفيل وسائسه بمكة اعمى مقعدا يستعطى

অর্থাৎ ইবনে ইসহাক বলেন, সকলকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়নি দলিল হল।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আমি দেখেছি হাতীর চালক মক্কায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বসে বসে খাবার ভিক্ষা করত। (سيرة النبوية لابن كثير)

যমযম খনন

আবরাহা ফিরে যওয়ার পর একদিন আবদুল মুত্তালিব হাতীম বা হিজর নামক স্থানে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন এবং এর রহস্য জানার জন্য কুরাইশের জনৈক গণকের কাছে গেলেন। বললেন, আমি হিজরের মধ্যে ঘুমাচ্ছিলাম, হঠাৎ স্বপ্ন দেখলামঃ একটা বৃক্ষ, যার মাথা আসমান পর্যন্ত পৌঁছেছে, এর শাখা-প্রশাখা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। আমি এর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল আলো আর দেখিনি। মনে হল, সূর্য থেকেও সত্তর গুণ বেশী আলোকিত। আরব এবং আজমের সবাই একে সিজদা করছে। সে সময় দেখি, এ আলো আরো বিস্তৃতি লাভ করছে। এ আলো কখনো লুকিয়ে যায়, আবার কখনো প্রকাশ পায়। কুরাইশের একটা দল এ গাছের ডাল ঝাপটে ধরল। অন্য এক দল এ গাছের ডাল কাটতে চেষ্টা করল। কিন্তু দেখলাম, সুদর্শন এক যুবক তাদের পিঠ ভেঙে দিচ্ছে এবং চোখ বের করে ফেলছে। আমি ডালটি ধরতে চাইলাম। কিন্তু আমার হাত ততটুকু পৌঁছল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার অংশ? জওয়াব দেয়া হল, এ অংশ ঐ সকল লোকের যারা লটকে আছেন এবং আপনার আগেই সফলকাম হয়েছেন। তারপর আমি চিন্তিত হয়ে জাগ্রত হলাম।

এ স্বপ্নের কথা শুনে গণকের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং সে বলল, যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তা হলে জেনে রাখ, তোমার বংশ হতে এক ব্যক্তিত্ব জন্ম নেবেন, যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত রাজ্যের অধিপতি হবেন। লোক তাঁর থেকে দ্বীন (ধর্ম) হাসিল করবে।

কিতাবুল বুসতান, গ্রন্থে উল্লেখ আছে আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখলেন- রূপার একটা শিকল তাঁর পিঠ থেকে বের হল, যার এক প্রান্ত আসমানে এবং অপর প্রান্ত যমীনে। এক দিক পূর্ব দিগন্তে, অপর দিক পশ্চিমে বিস্তৃত। এরপর তা যেন একটা বৃক্ষে রূপান্তরিত হল, এর পাতাগুলো ছিল নূরের। পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা ঐ বৃক্ষের মধ্যে ঝুলে আছে। আবদুল মুত্তালিব এ স্বপ্ন গণককে বললেন। গণক এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করল এভাবে আপনার বংশে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, পূর্ব ও পশ্চিমের বাসিন্দারা যার অনুসরণ করবে। আসমান এবং যমীনের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসা করবে। ইমাম কাসতালানী গণকের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেন এভাবে-

"ان صدقت رؤياك ليخرجن من ظهرك من يؤمن به اهل السموات والارض وليكونن من الناس علما مبينا "

অর্থাৎ - "যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তা হলে তোমার বংশে এমন এক ব্যক্তিত্ব জন্ম নেবেন যাঁর উপর আসমান ও যমীনের বাসিন্দারা ঈমান আনবে। এই ব্যক্তিত্ব জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসাবে আবির্ভূত হবেন।" এ স্বপ্ন দেখার পর আবদুল মুত্তালিব ফাতিমাকে বিয়ে করেন এবং আবদুল্লাহ ফাতিমার গর্ভে আসেন।

যমযমের সূচনা

জমজমের সূচনা হযরত ইসমাঈল (আ.) থেকেই হয়েছে। এ ঘটনাটি পরে বলা হবে। ইবনে হিশাম বলেন, এ কূপ আসাফ এবং নায়েলা নামক দু'টি মূর্তির মাঝখানে কুরাইশদের কুরবানী করার স্থানে অবস্থিত, যে কূপ বনী জরহম পালিয়ে যাওয়ার সময় বন্ধ করে দিয়েছিল। এ কূপ থেকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে পানি পান করানো হয়েছিল, যখন তিনি পিপাসিত ছিলেন। আর হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাতা হযরত হাজেরা সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠে পানির

জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করছিলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে প্রেরণ করলেন এবং জিব্রাইল (আ.) আপন পায়ের গোড়ালি দিয়ে যমীনে আঘাত করলে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। হঠাৎ তাঁর মা জানোয়ারের আওয়াজ শুনে যখন তাড়াতাড়ি দৌড়ে বাচ্চার কাছে এলেন, তখন হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে এমন অবস্থায় পেলেন যে তাঁর পায়ের নীচ থেকে ঘটঘট করে পানি পান করছেন।

হযরত ইমাম সুহাইলী বলেন, হযরত জিব্রাইল (আ.) হাত দ্বারা ভূমিতে আঘাত না করে পায়ের গোড়ালী দিয়ে আঘাত করার রহস্য হল, ইসমাঈল (আ.)-এর عـقـب অর্থাৎ রাসূল (সা.) এবং তাঁর উম্মতের জন্যেই এ পানি বের করা হয়েছিল, যেহেতু রাসূল (সা.) ইসমাঈল (আ.)-এর ওয়ারিশ। এর প্রতি ইশারা করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন- وجعلنا كلمة باقية في عقبه

আবদুল মুত্তালিবের যমযম কূপ খনন

সীরত গ্রন্থকারগণ এর বিভিন্ন কারণ উদ্বৃত করেন। এর মধ্যে কারো বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া কঠিন। হযরত ইবনে ইসহাকের নিকট প্রণিধানযোগ্য বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

যখন আমর বিন আল হারিস জরহমীর কওম আল্লাহ তায়ালার হরমে যুলুম করতে লাগল এবং খানায়ে কাবার হাদীয়া আত্মসাৎ শুরু করল। ফলে সে সময় আল্লাহ তায়ালা বনূ বকর বিন আবদে মনাফ বিন কেনানা এবং গাবশা বিন খুজা'আকে তাদের উপর বিজয়ী করেছিলেন। আমর বিন আল হারিস নফায়েসে কাবা একত্রিত করল। হযরত ইবনে হিশাম লেখেন, نـفـائـس বলতে সোনার হরিণ, তলোয়ার, বর্ম এবং ঘরের ভিত বুঝানো হয়েছে। অতঃপর এ সব জিনিষকে যমযমে ঢেলে দিল এবং খুব শক্তভাবে এটাকে বন্ধ করে দিয়ে নিজের কওমকে নিয়ে ইয়ামনের দিকে পালিয়ে গেল। তখন থেকেই যমযম চিহ্নহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আবদুল মুত্তালিবকে স্বপ্নে জমজমের অবস্থান জানিয়ে দেয়া হয়। যখন আবদুল মুত্তালিব খনন করে জমজম কূপ পুনরুদ্ধারের ইচ্ছা করলেন, কুরাইশরা তখন তাতে বাধা দিল। কেননা এখানে দু'টি মূর্তির সামনে উট কুরবানী করা হত। একটা মূর্তির নাম আসাফ এবং অপরটির নাম নায়েলা। এ মূর্তি দু'টির মাঝখানেই জমজমের অবস্থান ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, একদিন এ মূর্তি দু'টির সামনে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমর বসেছিলেন। সেই সময় জালীহ নামক এক ব্যক্তি একটা উট কুরবানী করার জন্য নিয়ে হাজির হলে মূর্তির মুখ দিয়ে এ আওয়াজ শুনা গেল ঃ

يا جليح امر نجيح رجل فصيح يُصيح بلا اله الا الله

"হে জালীহ, একটি শুভসংবাদ, একজন মাধুর্যপূর্ণ শুদ্ধ ভাষাভাষী লোক لا الـه الـلـه (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই) বলে আহবান করছেন।"

এ কথা শুনার পর সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু হযরত উমর (রা.) সাহস করে বসে থাকলেন। তিনি এ আওয়াজ তিন বার শুনলেন।

আবদুল মুত্তালিবের হারিস নামক এক ছেলে ছাড়া আর কোন সন্তান ছিল না। সুতরাং কুরাইশদের বাধার কারণে কূপ খনন করতে সক্ষম হননি। এ জন্য আবদুল মুত্তালিব মানত করলেন, যদি আল্লাহ আমাকে দশটা সন্তান দান করেন, তাদের মধ্যে এক ছেলেকে আল্লাহর রাস্তায় কাবা শরীফের কাছে কুরবানী করব। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একে একে দশটা সন্তান দিলেন এবং তাঁরা জমজমের কূয়া খনন করলেন। সেই দশ সন্তানের নাম-

Scanned with CamScanner

১. হারিস ২. যুবাইর ৩. হজল ৪. দরার ৫. মাকউম ৬. আবূ লাহাব ৭. আব্বাস ৮. হামযা ৯. আবূ তালিব ১০. আবদুল্লাহ।

জমজম কূপ পুনঃখনন প্রসংগে সীরতে ইবনে হিশাম ও আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া নামক কিতাবে আলী ইবনে আবি তালিব এর সূত্রে যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তা সংক্ষেপে পেশ করা হচ্ছে-

যখন আবুদল মুত্তালিবকে স্বপ্নে যমযমের ঠিকানা বলা হল, তখন তিনি তাঁর ছেলে হারিসকে নিয়ে খুনতা দিয়ে জমজম খনন করতে লাগলেন। তখন তাঁর ছেলে হারিস ছাড়া আর কোন সন্তান ছিল না। যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন তখন তকবীর দিতে লাগলেন। কুরাইশরা বুঝতে পারল আবদুল মুত্তালিব গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছেন। তারা তাঁকে বলতে লাগল, হে আবদুল মুত্তালিব, এটা আমাদের পিতা ইসমাঈল (আ.)-এর কূপ, এর খনন কাজে আমাদেরকে শরীক করুন। আবদুল মুত্তালিব তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এ কাজে আমাকেই নির্বাচন করা হয়েছে। তোমাদের মধ্য হতে আমাকেই বিশেষভাবে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরাইশরা বলল, আমরা আপনাকে বিনা বাধায় ছেড়ে দেব না। আবদুল মুত্তালিব বললেন তোমরা যেভাবে ভাল মনে কর সেভাবে ফয়সালা কর। শেষ পর্যন্ত দু'দলই একমত হয়ে সিরিয়ার বনি সাদ এর জনৈক গণকের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আবদুল মুত্তালিবের সংগে বনি হাশিম ও বনি আবদে মনাফের এক দল এবং কুরাইশের প্রত্যেক গোত্র থেকে এক এক দল রওয়ানা হল। পথে বহু মরু-ময়দান অতিক্রম করতে হল। সিরিয়া এবং হিজাজের মাঝখানে একটি ময়দানে পৌঁছার পর আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সাথীদের পানি ফুরিয়ে গেল। অন্যান্য গোত্র থেকে তাঁরা পানি চাইলেন ; কিন্তু তারা নিজের পানি ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে পানি দিতে অস্বীকার করল। এ অবস্থায় আবদুল মুত্তালিব নিজ কওম থেকে মতামত চাইলেন। তাঁরা ব্যাপারটি আবদুল মুত্তালিবের উপর ছেড়ে দিলেন। আবদুল মুত্তালিব বললেন, প্রত্যেকেই একটা গর্ত খনন কর। যখনই কেউ মরে যাবে, ওখানেই তাকে দাফন করা হবে। শেষ পর্যন্ত একজন লোকের লাশ নষ্ট হবে, সবার লাশ নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

আবদুল মুত্তালিবের নির্দেশ অনুযায়ী সবাই গর্ত খনন করে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকল। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব বললেন, আল্লাহর কসম, এভাবে মৃত্যুর নিকট নিজের প্রাণ নিজেকে সোপর্দ না করে আমরা যদি যমীনে কোথাও পানি তালাশ করি, সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা পানি দিতে পারেন। চল, এদিক সেদিক তালাশ করে দেখি। এদিকে কুরাইশের অন্য দল এ দৃশ্য দেখছিল। আবদুল মুত্তালিব যাত্রার জন্য নিজের সওয়ারীর দিকে গেলেন। সে উঠতেই তার খুরের নীচে হতে পানি বের হতে লাগল। আবদুল মুত্তালিব তকবীর দিয়ে উঠলেন। সংগীরাও তাঁর সাথে সুর মিলালেন। তাঁরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলেন। পাত্রগুলোও পানিতে ভর্তি করা হলো। অতপর অন্য গোত্রের প্রতি সম্বোধন করে বললেন, এসো পানি পান কর, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পানি দান করেছেন। তখন বাকী সবাই পানি পান করল এবং বলতে লাগল- হে, আবদুল মুত্তালিব, ফয়সালা অবশ্যই আপনার অনুকূলে হয়ে গেছে। আমরা জমজম-এর ব্যাপারে কখনো আপনার সাথে ঝগড়া করব না। যে পাক সত্তা আপনাকে এ শক্ত যমীনে পানি দান করছেন, তিনিই আপনাকে জমজমের মালিক বানিয়েছেন। এখন আপনি সানন্দে জমজমের দিকে যেতে পারেন। এ ঘটনার পর গণকের কাছে না গিয়ে সবাই মক্কা শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

জমজম কূপ খনন করার পর একদিন আবদুল মুত্তালিব কাবা শরীফের নিকট ঘুমিয়েছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন ঃ কে যেন বলছেন, হে আবদুল মুত্তালিব, কাবা শরীফের প্রতিপালকের সাথে তোমার মানত পুরা কর। স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে একটি দুম্বা যবেহ করে মিসকীনদের খাওয়ালেন। অতপর দ্বিতীয় রাতে একই স্বপ্ন দেখলেন, হে আবদুল মুত্তালিব, এর চেয়ে বড় জিনিস কুরবানী দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর। এরপর একটা গাভী যবেহ করে ফকীর-মিসকীনদেরকে অপ্যায়ন করলেন। তৃতীয় রাতেও স্বপ্নে দেখলেন, হে আবদুল মুত্তালিব, এর চেয়ে ভাল জিনিষ দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর। এর পর জাগ্রত হয়ে একটা উট কুরবানী করে গরীব-মিসকীনদেরকে আপ্যায়ন করলেন। এরপর যখন ওখানে ঘুমালেন, তখন স্বপ্নে দেখেন, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি এর চেয়ে ভাল জিনিষ দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর। আবদুল মুত্তালিব জিজ্ঞেস করলেন, এর চেয়ে ভাল জিনিষ কী? তখন জওয়াব পেলেন, তুমি তোমার সন্তানকে কুরবানী করার যে মানত করেছিলে, তা পূরণ কর। ভীতি-বিহ্বল হয়ে তিনি জাগ্রত হলেন। তাঁর সকল সন্তানকে একত্রিত করে এ স্বপ্নের কথা বললে সন্তানগণ আনন্দের সাথে জওয়াব দিলেন, আপনি আমাদের থেকে যাকেই কুরবানী করতে চান, তাতেই আমরা রাজী আছি।

যখন লটারী দেওয়া হল, তখন সব চেয়ে 'বেশী প্রিয় পুত্র আবদুল্লাহর নাম লটারীতে উঠল। আবদুল মুত্তালিব ছুরিসহ আবদুল্লাহকে নিয়ে কাবা ঘরের নিকট- যেখানে আসাফ আর নায়েলা রয়েছে - সেখানে গেলেন। আসাফ বিন ই'য়ালা এবং নায়েলা বিনত যায়েদ জুরহুম গোত্রের লোক ছিল। পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। একদা এরা দু'জন হজ্জ করতে এসে কাবা শরীফ এর ভিতর জনশূন্য জায়গা পেয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পাথরে রূপারিত করে দিয়েছিলেন। সকাল হলে মানুষ যখন তাদের এ অবস্থা দেখল, তখন শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে মানুষের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে তাদের পূজা শুরু হয়ে যায়। যখন আবদুল মুত্তালিব নিজের ছেলেকে নিয়ে কুরবানীর জায়গায় পৌঁছলেন, তখন কুরাইশরা জিজ্ঞেস করতে লাগল, আবদুল্লাহকে তুমি কী করতে চাও? তিনি জওয়াব দিলেন, আবদুল্লাহকে কুরবানী করতে চাচ্ছি। কুরাইশরা নিষেধ করে বলতে লাগল, হে আবদুল মুত্তালিব, যদি তুমি তোমার ছেলেকে কুরবানী কর, তা হলে প্রত্যেক লোক কুরবানীর জন্য নিজ নিজ ছেলে এখানে নিয়ে আসবে। এটা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়াবে। তুমি কোন গণকের কাছে যাও, নিশ্চয়ই কোন একটা রাস্তা বের হবে। এ কথা অনুযায়ী আবদুল মুত্তালিব খায়বারের জনৈক গণকের কাছে গেলেন। তার কাছে সমস্ত ঘটনা বললেন। গণক জিজ্ঞেস করে, আপনাদের এখানে একজন লোকের রক্তের বিনিময় কত দিয়ে হয়? আবদুল মুত্তালিব জওয়াব দিলেন, দশটি উট দিতে হয়। গণক বলল, আপনি নিজ দেশে চলে যান এবং দশটি উটের নাম ও আবদুল্লাহর নাম এর মধ্যে একটা লটারী দিন। যদি উটের নাম না আসে, তা হলে আর দশ উট বৃদ্ধি করুন, এ ভাবে যতক্ষণ উটের নাম-না আসে ততক্ষণ দশটি করে উট বৃদ্ধি করতে থাকুন। আবদুল মুত্তালিব ফিরে এসে গণকের কথামত লটারী দিতে লাগলেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহর নামের বদলে এক শত উটের নাম আসল। তিনি সানন্দে তা আদায় করলেন। এ জন্য রাসূল (সা.) বলতেন - انا ابن الذبيحين অর্থঃ আমি দুই যবেহকৃত মানুষের সন্তান।

এ দুইজনের প্রথম জন হযরত ইসমাঈল (আ.) না ইসহাক (আ)-এ ব্যাপারে অনেক

Scanned with CamScanner

মত বর্ণিত আছে। এ তর্ক-বিতর্ক অবসান করার জন্যে একটি উত্তরই যথেষ্ট। তা হল হযরত উমর বিন আবদুল আজিয (রা.) এক লোককে জিজ্ঞেস করেছিলেন (যিনি ইহুদী আলিমদের থেকে মুসলমান হয়েছিলেন) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কোন সন্তানকে কুরবানী দেয়া হয়েছিল। তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। আল্লাহর কসম, ইহুদীরা ভালভাবে জানে, ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী দেয়া হয়েছে। কেননা তওরাতে আছে - ان الله امر ابراهيم ان يذبح ابنه وحيده অন্য এক কিতাবে وحيده শব্দের পরিবর্তে بكره শব্দ আছে। وحيده শব্দ ইহুদী পন্ডিতরা মুছে ফেলেছে। কেননা আরবীরা এ ফযীলতের অধিকারী হোক, ইহুদীরা হিংসার কারণে তা মেনে নিতে পারেনি। যেহেতু আরবরা ইসমাঈল (আ.)- এর সন্তান, তাই তারা ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীকে অস্বীকার করে। বরং তারা বলে, ইসহাক (আ.)-কে কুরবানী করা হয়েছিল। কেননা ইসহাক (আ.) তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন।

প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখযোগ্য, রাসূলুল্লাহর চাচাগণের সংখ্যা কোন কোন রিওয়ায়াতে তের জন বর্ণিত হয়েছে। দশ জনের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাকী তিন জনের নাম হল-

১. غيداق গায়দাক। ২. تحثم তহসম।

৩. عبد الكعبة আবদুল কাবা।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। বলা হয়ে থাকে, আবদুল্লাহ আবদুল মুত্তালিবের সবচেয়ে ছোট ছেলে অথচ সঠিক কথা হল হামযা আর আব্বাস তাঁর ছোট। বিভিন্ন বর্ণনাকে সমন্বয় এভাবে করা যায় ঃ হয়ত আবদুল্লাহ নিজের মায়ের সন্তানদের মধ্যে ছোট ছিলেন। অথবা তখন পর্যন্ত হামযা আর আব্বাসের মায়ের বিয়ে আবদুল মুত্তালিবের সাথে হয়নি।

যমযমের বৈশিষ্ট্য

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল (সা.) বলেছেন, যমযমের পানি যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে পান করবে সফলতা পাবে। যদি আরোগ্য লাভের জন্য পান কর, আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। যদি ক্ষুধা নিবারণের জন্য পান কর, আল্লাহ তোমার ক্ষুধা নিবারণ করবেন। যদি তুমি তা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পান কর, আল্লাহ তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। ইহা জিব্রাইল (আ.)-এর আঘাতে উৎপন্ন, যা আল্লাহ ইসমাঈল(আ.)-কে পান করিয়েছিলেন। (দারকুতনী, তারগীব ও তারহীব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যখনই যমযমের পানি পান করতেন, তখনই নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতেন-

اللهم اني اسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিয্ক ও সকল প্রকার রোগমুক্তি কামনা করছি।' (ইরশাদুস সারী) মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, যমযমের পানি বেশী করে পান করা মুস্তাহাব এবং যমযমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ইবাদত। ইহা পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করা যাবে না (সুতরাং উক্ত পানি দ্বারা অপবিত্র কাপড় ধৌত করা, জানাবতের গোসল করা, অপবিত্রতা দূর করা এবং অপবিত্র জায়গা ধৌত করা উচিত নয়) এবং বিভিন্ন দেশে ইহা নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব।

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণনা করেন- তিনি (হযরত আয়শা রা.) এই পানি নিয়ে যেতেন এবং তিনি বলেছেন মহানবী (সা.) ও বিভিন্ন স্থানে এই পানি নিয়ে যেতেন।

হযরত আমিনার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতার শুভ পরিণয়

যখন আবদুল্লাহ উট কুরবানী শেষে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন কুতায়লা অন্য বর্ণনায় রাফীকা বিনতে নওফেল নামক এক মহিলা আবদুল্লাহকে দেখে বলতে শুরু করল, আপনি যদি এখন আমাকে বিয়ে করেন, তা হলে আপনার এক শত উটের মূল্য আমি দেব। মহিলার এই ইচ্ছা ব্যক্ত করার কারণ তিনি রাসূল (সা.)-এর নূর মুবারক আবদুল্লাহর কপালে চমকাতে দেখেছিলেন। আবদুল্লাহ জওয়াব দিয়েছিলেন- আমার পিতা সংগে আছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়।

কেউ কেউ বলেন-আবদুল্লাহর জওয়াব ছিল- "এটা হারাম- এর শিকার হওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়।'

'انسان العيون' নামক কিতাবে ইমাম হলবী (র.) এ ধরনের ইচ্ছা পোষণ করার কারণ বর্ণনা করেন যে, আগের কিতাবগুলোতে উল্লেখ ছিল, শেষ নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মক্কা শরীফের কুরাইশ খান্দান থেকেই হবেন। সুতরাং এ খবর কিতাবে দেখে অনেক লোক তাদের সন্তানকে এ মর্মে ওসীয়ত করেছিলেন যে, আমার ছেলের নাম আবদুল্লাহ আর আমার নাতির নাম মুহাম্মদ রাখবে। এজন্য সে সময় অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় অন্ততঃ চল্লিশ ব্যক্তির নাম মুহাম্মদ এবং পিতার নাম আবদুল্লাহ ছিল। এজন্য মহিলারা একান্তভাবে কামনা করত যেন মুহাম্মদ (সা.) তার গর্ভেই জন্ম নেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহকে সংগে নিয়ে ওহাব বিন আবদে মানাফ বিন জুহরার কাছে এলেন। তিনি তখন বংশ ও মর্যাদার দিক দিয়ে বনি জোহরার সরদার ছিলেন। তাঁর মেয়ে আমিনার বিয়ে আবদুল্লাহর সাথে দিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় দিন যখন আবদুল্লাহ্ কুতায়লার পাশ দিয়ে গেলেন তখন ঐ মহিলা আগের মত ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ্ কুতায়লাকে আগের মতো বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ না করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কুতায়লা জবাব দিল, গতকাল যে নূর তোমার কপালে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, তা আজ আর দেখা যাচ্ছে না। আমার ইচ্ছা ছিল সেই নূর যেন আমার থেকে প্রকাশ পায়। সেই নূর যেখানে পৌছার কথা সেখানে পৌছে গেছে। তাই, আমার আর আগ্রহ নেই।

হযরত আমিনার গর্ভধারণের পর অনেক আশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল। হযরত খতীব বাগদাদী (র.) বলেন- রাসূল (সা.) মায়ের রেহেমে আসেন রজব মাসের জুমার রাত্রিতে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বেহশতের পাহারাদার রিদওয়ানকে বলেছিলেন, জান্নাতুল ফেরদাউসের দরজা খুলে দাও। এক আহবানকারী যমীন এবং আসমানে আহবান করে বলেছিলেন যে নূর থেকে শেষ যামানার নবী সৃষ্টি হবেন, সে নূর আমিনার রেহেমে স্থান লাভ করেছে। এখন তার সৃষ্টি পুরো হয়েছে, সুসংবাদ প্রদানকারীও ভীতি প্রদর্শনকারী হয়ে তিনি মানুষের কাছে আসবেন। হযরত কা'ব আহবার এভাবে রিওয়ায়াত করেন-

'সে রাত্রে আকাশ ও তার চারপাশে এবং যমীনের সর্বত্র ঘোষণা দেয়া হল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুপ্ত নূর তাঁর মায়ের গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছে। সুতরাং তাঁকে খোশ

Scanned with CamScanner

আমদেদ, অতপর আবারও খোশ আমদেদ। সেদিন পৃথিবীর সকল মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। এ সময় কুরাইশগণ দুর্ভিক্ষ ও খরা-পীড়িত ছিল। মহানবী (সা.)-এর আগমনে পৃথিবী শ্যামল হল, গাছপালা ফলবান হল। চতুর্দিক থেকে তাদের কাছে নিয়ামতরাজি আসতে থাকল। এ কারণে মহানবী (সা.)-এর মাতৃগর্ভে আগমনের বছরটিকে বিজয় ও আনন্দের বছর নামে নামকরণ করা হয়েছে। হযরত ইবনে ইসহাক হযরত আমিনা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত আমিনা (রা.) বলেন আমাকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেয়া হল তোমার গর্ভে এ উম্মতের সরদার রয়েছেন। তিনি আমিনা বলেন, আমার গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আগমন হল কিন্তু কোন অসুবিধা অনুভূত হয়নি। শুধু হায়িয বন্ধ হয়েছিল।

তিনি আরো বলেন, এক রাতে আমি ঘুম এবং জাগ্রত অবস্থার মধ্যখানে ছিলাম অর্থাৎ অবচেতন অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলে গেলেন, তোমার কি জানা নেই তোমার গর্ভে কে? انك حملت بسيد الانام "তোমার গর্ভে যিনি, তিনি অবশ্যই সমগ্র সৃষ্টির সরদার।" যখন ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হল তখন সেই ব্যক্তি এসে আমাকে বলেন, এ'রকম বল, اعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا 'আমি একক সত্তার নিকট সকল হিংসুকের অনিষ্টতা থেকে তাঁর হেফাযত কামনা করছি। এর পর তাঁর নাম রেখো মুহাম্মদ (সা.)।' জাগ্রত হওয়ার পর আমি আমার শিয়রে সোনার এক টুকরায় লেখা দেখলাম।

اعيذه بالواحد من شر كل حاسد و كل خلق رائد من قائم و قاعد عن السبيل حائد علي الفساد جاهد من نافث و عاقد و كل خلق يأخذ بالمراصد في الطريق الموارد ـ

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (র.) হতে বর্ণিত-বনু আমীর এর এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন করল, আপনার প্রকৃত বিষয়টি কি? মহানবী (সা.) বললেন, আমার শানের প্রকাশ হচ্ছে এমন যে, আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর দুআ এবং আমার ভাই ঈসা (আ.) এর সুসংবাদের ফল।

হযরত আবূ নাঈম (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মহনবী (সা.) আমিনার গর্ভে অবস্থানের নিদর্শন সমূহের একটি নিদর্শন হচ্ছে, সে রাত্রে কুরাইশদের সকল চতুষ্পদ জন্তু কথা বলেছিল। তারা বলেছিল- কাবা শরীফের প্রতিপালকের শপথ! রাসূলুল্লাহ (সা.) মাতৃগর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছেন। আর তিনি হচ্ছেন দুনিয়াবাসীদের ইমাম ও প্রদীপ স্বরূপ। সেদিন পৃথিবীর সকল সম্রাটদের সিংহাসনসমূহ উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তের চতুষ্পদ জন্তুগুলো পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সুসংবাদ নিয়ে বিচরণ করেছিল। এমনিভাবে সাগরে বসবাসকারী প্রাণীগুলোও একে অপরকে সুসংবাদ দিয়েছিল। আর মহানবী (সা.) মাতৃগর্ভে স্থানান্তরিত হওয়ার পর প্রতি মাসে আকাশে একজন ও যমীনে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলতেন তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। বরকতপূর্ণ ও নিরাপদ নবী আবুল কাসিম (সা.)-এর প্রকাশ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

আল্লামা কসতলানী (র.) এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন-এ হাদীস ضعيف। ইমাম জুরকানী (র.) এ হাদীসের উপর একটা অভিযোগ করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তখন উপস্থিত ছিলেন না। এ হাদীসের ঘটনা তিনি নিজে দেখেন নি এবং কারো থেকে বর্ণনাও করেননি। এ জন্যে হাদীস কীভাবে সঠিক বলে গ্রহণ করা যাবে? পরক্ষণে হযরত ইমাম যুরকানী (রা.) নিজেই জবাব দেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র.) ও অন্যরা এ হাদিসের সনদ মারফূ হিসেবে নকল করেন। যদিও ভাষার

কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তদুপরি এ মর্মে সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। যা এ হাদীসকে শক্তিশালী করে, যেমন-

لم يبق في تلك الليلة دار الا اشرقت ولا مكان الا دخله النور ولا دابة الا نطقت

অর্থাৎ এ রাতে এমন কোন ঘর আলোকিত হওয়ার বাকী থাকেনি এবং এমন কোন স্থান বাকী ছিল না যেখানে নূর (আলো) প্রবিষ্ট হয়নি। এবং এমন কোন পশু ছিল না যে কথা বলেনি। মোট কথা অন্যান্য অনেক হাদীস দ্বারা পশুর কথা বলা সাব্যস্থ আছে যদিও পশুরা কি বলেছিল স্পষ্ট নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মায়ের গর্ভে যখন দু'মাসের ছিলেন, তখন তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। এটাই প্রসিদ্ধ মত। ইন্তেকালের সময় হযরত আবদুল্লাহ্র বয়স ছিল পঁচিশ বছর। হযরত ওয়াকীদী (র.)-এ মতটি বেশী গ্রহণযোগ্য বলে বর্ণনা করেন। অন্য মত অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স আঠার বছর ছিল। এ বক্তব্যকে হাফিয আলাঈ এবং ইবনে হাজর সঠিক বলেন। এ মতই ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র.) গ্রহণ করেছেন।

আবদুল্লাহ ব্যবসায়ীদের সাথে ফিরে আসার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনা শরীফে নিজ পিতা আবদুল মুত্তালিবের মামার বাড়ী রয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে এক মাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। আবদুল মুত্তালিব যখন কাফেলাকে জিজ্ঞেস করেন, তখন তারা জওয়াব দিয়েছিল আমরা তাঁকে মদীনায় অসুস্থ অবস্থায় রেখে এসেছি। এ কথা শুনার পর আবদুল মুত্তালিব তাঁর ছেলে হারিসকে সেখানে পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন এবং দারে তাবেয়ায় তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

হযরত আবূ সায়িদ আবদুল মালিক নিশাপুরী (র.) 'معجم الكبير এ এবং السعادة والبشري নামক কিতাবের লেখক হযরত কা'ব থেকে এবং আবূ নুয়াইম হযরত ইবনে অব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়ত করেন, আমিনা বলেন আমার গর্ভ যখন ছয় মাস হয় তখন আমার কাছে এসে একজন লোক বলে- হে আমিনা, আপনি বিশ্বজগতের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে আপনার গর্ভে ধারণ করছেন। তিনি যখন জন্ম নেবেন, তখন তার নাম রাখবেন মুহাম্মদ। আর আপনার বিষয়টি গোপন রাখবেন। হযরত আমিনা বলেন, অতঃপর অন্যান্য মহিলার যা হয়, আমারও তা হলো। অথচ একজন লোকও (পুরুষ হোক বা মহিলা) তা জানত না। আমি ছিলাম বাড়ীতে সম্পূর্ণ একা, আর আবদুল মুত্তালিব ছিলেন তওয়াফরত। আমি বিকট একটি শব্দ শুনলাম যা শুনে ভীত হয়ে পড়লাম। অতঃপর আমি সাদা রঙের একটি পাখির ডানা দেখলাম। তা আমার অন্তরকে স্পর্শ করল। তাতে আমার সকল ভীতি ও কষ্ট দূর হয়ে গেল। অতঃপর আমি তাকালাম। দেখলাম একটি সাদা পান পাত্র আমার সামনে রাখা আমি তা পান করলাম। তাতে সুউচ্চ নূর আমাকে বেষ্টন করে নিল। অতঃপর আমি খেজুর গাছের ন্যায় লম্বা মহিলাদের দেখলাম। তাদেরকে আবদে মুনাফের গোত্রের মেয়েদের মত মনে হচ্ছিল। আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম এবং বলছিলাম- কে আছ আমাকে সাহায্য কর। এরা আমার সম্পর্কে কি ভাবে জানল? বর্ণনাকারী বলেন, অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমিনা বলেন, অতঃপর ঐ মহিলাগণ আমাকে বললেন, আমরা হচ্ছি ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া, ইমরানের মেয়ে মরিয়ম, আর এরা হচ্ছে বেহেশতের হুর।

তিবরানী (র.) বর্ণনা করেন, যখন রাসূল (সা.) ভূমিষ্ট হলেন, তাঁর হাতের আঙুলগুলি

Scanned with CamScanner

বন্ধ ছিল। শাহাদাত অঙ্গুলি এমনভাবে ছিল যেন তা দিয়ে তসবীহ পাঠ করছেন। হযরত উসমান বিন আবুল আস (রা.) তাঁর মাতা উম্মে উসমান সকফিয়াহ হতে বর্ণনা করেন, যাঁর আসল নাম ছিল ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ্। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় উপস্থিত হলে আমি দেখলাম, তাঁর জন্মের ঘরখানা আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে; আর আমি নক্ষত্রগুলোকে অবনত হতে দেখলাম। আমার মনে হচ্ছিল, যেন এগুলো আমার উপর পড়ে যাবে! -(বায়হাকী, তিবরানী ও ইবনে আবদুল বার)

যদিও হযরত আমিনার রিওয়ায়তে উল্লেখ রয়েছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভূমিষ্ট হওয়ার মুহূর্তে আমি একা ছিলাম আর ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক্কালে উপস্থিত ছিলাম। সে ক্ষেত্রে এ দু হাদীসের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে জওয়াব এভাবে দেয়া যাবে-রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভূমিষ্ট হওয়ার পর পরই ফাতিমা বিনত্ আবদুল্লাহ্ উপস্থিত হয়ে এ দৃশ্য দেখেন।

اخرج احمد و البزار والطبراني والحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية ان رسول الله ﷺ قال اني عند الله لخاتم النبين وان ادم لمنجدل في طينة وساخبركم عن ذالك اني دعوة ابي ابراهيم وبشارة عيسى و رويا امي التي رأت وكذالك امهات النبين يرين وان ام رسول ﷺ رأت حين وضعته نورا اضائت له قصور الشام قال الحافظ ابن حجر صححه ابن حبان والحاكم -

হযরত আহমদ, বাযযার, তিবরানী, হাকীম ও বায়হাকী (রা.) হযরত ইরবাদ্ব বিন সারিয়া (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, আমি তখন থেকেই আখেরী নবী যখন আদম (আ.) মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলেন। আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি যে, আমি আমার পিতা ইবারাহীম (আ.)-এর দুয়া, হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের এর স্বপ্নের ফসল। এমনিভাবে সকল নবীদের মাতাগণ স্বপ্ন দেখে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মা স্বপ্নে দেখেন যখন তাঁর গর্ভে রাসূল (সা.)-এর নূর রাখা হয়, তখন সিরিয়ার প্রাসাদ সমূহ আলোকিত হয়ে যায়।

হাফিয ইবনে হজর (র.) বলেন, এই হাদীসখানা হিব্বান এবং হাকীম সহীহ বলেছেন।

হযরত আল্লামা কাসতালানী (র.) বলেন- এখানে নূর দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী "قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ" অর্থাৎ তোমাদের কাছে আল্লাহর নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে।

আল্লামা বয়দ্বাবী (র.) বলেন- কুরআনের আয়াতে নূর উল্লেখ করে ইশারা করা হয়েছে কুরআনের প্রতি, কেউ কেউ বলেন- এখানে নূর বলে ইশারা করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি।

দ্বিতীয় অর্থই সঠিক। যেভাবে বায়দ্বাবী (র.) ও অনুরূপ বলেন, আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন, "আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সা.) দ্বারা মানুষকে শান্তির পথ দেখান। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিবেদিত তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসেন আল্লাহরই অনুমতিক্রমে।" (সূরা ঃ মায়িদা-১৬)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ভূমিষ্ট হওয়ার প্রাক্কালে সিরিয়ার প্রাচীর আলকোজ্জ্বল হয়ে যায় বলে ইশারা করা হয়েছে একথার প্রতি যে; নবুওয়াতের নূরে বিশেষ করে সিরিয়ার যমীন, আলোকিত হয়েছিল। কারণ তা ছিল তৎকালীন রাজধানী।

যেমন হযরত কা'ব আহবার বর্ণনা করেন যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে-

محمد رسول الله مولده بمكة مهاجره يثرب وملكه بالشام فمن مكة بدت نبوة نبينا ﷺ والي الشام انتهي ملكه لهذا اسري ﷺ الي الشام الي بيت المقدس كما هاجر قبله ابراهيم ع الي الشام وبها ينزل عيسي ع بن مريم ع وهي ارض المحشر والمنشر -

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম স্থান হল মক্কা, হিজরতের স্থান হল ইয়াসরিব, তাঁর রাজত্ব সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত আরম্ভ হবে মক্কায় এবং সিরিয়া পর্যন্ত তার রাজত্ব বিস্তৃতি লাভ করবে। এ জন্য তিনি মিরাজের রাত্রে সিরিয়া বায়তুল মুকদ্দস ভ্রমণ করিবেন। যেমন রাসূল (সা.)-এর আগে হযরত ইব্রাহীম (আ.) সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং সেই খানেই হযরত ঈসা (আ.) বিন মরিয়ম (আ.) অবতরণ করবেন এবং ঐ যমীনেই হাশর হবে।

অলৌকিক ঘটনাবলী

হযরত মুহাম্মদ(সা.) জন্ম লাভ করার প্রাক্কালে যে সকল অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ ঘটে, এর মধ্যে একটা ঘটনা হল এই হযরত বায়হাকী, আবু নুআইম (র.) হযরত হাচ্ছান বিন সাবিত (রা.) (যিনি পরিচিত ছিলেন شاعر الرسول হিসাবে) থেকে রিওয়ায়াত করেন যিনি এক শত বিশ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর ওফাত চুয়ান্ন হিজরীতে হয়েছিল। তিনি বলেন আমার বয়স তখন সাত কী আট বছর। একদিন সকাল বেলা শুনলাম, এক ইহুদী উচ্চকণ্ঠে নিজের গোত্রকে ডাকছে। সে গোত্রের লোকেরা একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, ভাই, তোমার কী হয়েছে? সে জওয়াব দিল, আহমদ (সা.) নামক নবী সৃষ্টি হওয়ার ইশারা স্বরূপ যে তারকা উদয় হওয়ার কথা, তা উদিত হয়ে গেছে। আমি তা শুনেছিলাম। রাসূল (সা.) জন্মের সময় যে সকল অলৌকিক ঘটনার কথা রয়েছে, তার মধ্যে আরেকটি ঘটনা হল এই ঃ এক ইহুদী মক্কা শরীফে অবস্থান করত। যে রাত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ পার্থিব জগতে পদার্পণ করলেন, ভোরে ঐ ইহুদী বলতে লাগল, হে কুরাইশ! আজ রাত্রে কী তোমাদের মধ্যে কোন সন্তান পয়দা হয়েছে? কুরাইশের লোকটি জওয়াব দিল, আমার জানা নেই। ঐ ইহুদী আবার বলল, তোমাদের স্ত্রীদের কাছে জিজ্ঞেস কর। কারণ আজ রাত্রে ঐ উম্মতের নবী পয়দা হয়েছেন। তার দুই বাহুর মধ্যখানে আলামতে নবুওয়াত রয়েছে।

এ কথা শুনে কুরাইশরা অনুসন্ধান করতে লাগল। সেই ইহুদীও সংগে বের হল। অনুসন্ধান করে সংবাদ পাওয়া গেল, সেই রাত্রে আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিবের এক শিশুপুত্র জন্ম লাভ করেছে। ইহুদী লোকটি কুরাইশদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাতার কাছে গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বের করে যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতের চিহ্ন দেখল, তখনই বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। হুঁশ হওয়ার পর বলতে লাগল ذهبت النبوة من بني اسرائيل অর্থাৎ বনী ইসরাইল থেকে নবুওয়াত চলে গেছে। আল্লাহর কসম, তোমাদের খ্যাতি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করবে।

হযরত ইয়াকুব বিন সুফিয়ান হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন এবং আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (র.) যিনি 'ফতহুল বারী'র লেখক এ হাদীস সম্পর্কে اسناده حسن অর্থাৎ উহার সনদ হাসান।

Scanned with CamScanner

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভূমিষ্ট হওয়ার অলৌকিক ঘটনার মধ্যে আরো কয়েকটি হল-

ارتجاس وارتجاس ايوان كسري وسقوط اربع عشر شرفه من شرفاته وغيض بحيرة طبرية وخمود فارس وكان لهبات عام لم تخمد كمارواه البيهقي وابو نعيم والخرائطي في الهواتف وابن عساكر وابن جرير

অর্থাৎ কিসরা বাদশাহের প্রাসাদ কম্পিত হওয়া ও চৌদ্দটি প্রসাদ পড়ে যাওয়া। এ কথা বলে ইশারা করা হয়েছে যে, চৌদ্দটি রাষ্ট্রের অবসান হবে এবং তদ্রূপ হয়েছিল। হযরত ইবনে যাফর বলেন, দশটি রাষ্ট্র চার বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আর অবশিষ্ট রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে শেষ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম মুহূর্তের অলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যে আরো রয়েছে-আসমান থেকে অগ্নির লেলিহান শিখা বের হওয়া, জীনদের আসমান থেকে বিতাড়িত হওয়া ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর খতনাসহ জন্মগ্রহণ

মুহাম্মদ (সা.) খতনা করা অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নাড়ী কর্তিত অবস্থায়ও জন্মগ্রহণ করেন। যেমনিভাবে হযরত ইবনে আসাকীর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে, তিনি হযরত মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেন -

হযরত তিবরানী (র.) আওসত কিতাবে বর্ণনা করেন, আবূ নাঈম ও ইবনে আসাকীর বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, আমার রবের কাছে আমার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের মধ্য হতে একটি হচ্ছে আমি খতনা করা অবস্থায় জন্ম নিয়েছি। আমার লজ্জাস্থান কেউ দেখেনি। হযরত জিয়া (র.) এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। المختارة নামক গ্রন্থে আছে - হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, মহানবী (সা.) খতনা করা অবস্থায় ও নাড়ী কর্তিত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন। এ হাদীস শরীফ বর্ণনা করেন হযরত ইবনে আসাকীর (র.)। ইমাম হাকীম (র.) তাঁর المستدرك কিতাবে উল্লেখ করেন - মহানবী (সা.) খতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন- এ জাতীয় হাদীস সমূহ মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌছে গেছে। হযরত আল্লামা কসতলানী (র.)-এ প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

ولد محمد ﷺ معذورا اي مختونا مسرورا اي مقطوع السرة كما روي عن حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عساكر وروي الطبراني في الاوسط و ابو نعيم وابن عساكر من طرق ـ عن انس رضي الله عنه ان النبي ﷺ قال من كرامتي علي ربي اني ولدت مختونا ولم ير احد سوائي وصححه الضياء وفي المختارة و عن ابن عمر رضي الله عنه قال ولد النبي ﷺ مختونا مسرورا رواه ابن عساكر وقال الحاكم في المستدرك تواترت الاخبار انه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا انتهى ـ

হযরত হাফিয জাওবী (র.) এর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, আমরা এ হাদীসকে সহীহ বলেই গ্রহণ করছি না। আর কিভাবে তা মুতাওয়াতির হতে পারে? এ কথার জবাব এভাবে দেয়া হয়ে থাকে যে, ইমাম হাকীম (র.) কর্তৃক উল্লিখিত মুতাওয়াতির শব্দ দ্বারা পারিভাষিক মুতাওয়াতির অর্থ গ্রহণ করা হয়নি। বরং এর দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করা এবং সীরাত গ্রন্থসমূহে ব্যাপকভাবে বর্ণিত হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আল কাইয়্যিম (র.) বলেন- খতনা করা অবস্থায় পয়দা হওয়াটা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষত্ব নয়। কারণ অনেক লোকই খতনা অবস্থায় পয়দা হয়। হযরত হাফিয ইবনে হাজর (র.) বলেন, আরবী লোকদের ধারণা, যে বাচ্চা

চাঁদনী রাতে জন্ম গ্রহণ করে সে খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। হযরত হাফিয ইবনে হাজর (র.) নবী করীম (সা.) আল ওয়াসসাহ নামক কিতাবে হযরত ইবনে দরীদ (র.) লেখেন- قال ابن كلبي بلغني ان ادم خلق مختونا واثنا عشر نبيا من بعده خلقوا مختونين ـ

হযরত ইবনে কলবী (র.) বলেন ঃ আমার যতটুকু জানা আছে তার আলোকে বলছি, হযরত আদম (আ.) খতনা করা অবস্থায় আসেন এবং এর পর আরো বার জন নবী খতনা করা অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে আখেরী নবী ১. হযরত মুহাম্মদ (সা.) ২.হযরত শীস্ (আ.) ৩. হযরত ইদরীস (আ.) ৪.হযরত নূহ (আ.) ৫. সাম (আ.) ৬.হযরত লূত (আ.) ৭. হযরত ইউসূফ (আ.) ৮. হযরত মূসা (আ.) ৯. হযরত সুলাইমান (আ.) ১০. হযরত শুআইব (আ.) ১১. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এবং ১২. হযরত হূদ (আ.)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাপারে তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে ঃ ১. তিনি খতনা করা অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন। ২. রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর জন্মের সপ্তম দিন তাঁকে খতনা করান।

৩. হযরত জিব্রাইল (আ.) যখন হযরত হালিমা (রা.)-এর গৃহে বক্ষ মুবারক উন্মোচন করেন, তখন খতনাও করিয়ে দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের বছর নিয়ে মতভেদ রয়েছে। 'মাওয়াহিবে লেদুনিয়া'র লেখক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম হাতির ঘটনার বছর (عام الفيل) হয়েছে। এ ব্যাপারে উলামা-এ কিরাম একমত। হযরত আল্লামা জুরকানী (র.) বলেন-যে দিন আল্লাহ তায়ালা আবাবীল পাখী পাঠিয়েছিলেন, সেই দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম হয়েছিল। হযরত ইবনে হাব্বান নিজের লিখিত ইতিহাসে তা'ই বর্ণনা করেন। আরো অনেক প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম عام الفيل এর পরে হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মত হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) রবীউল আউয়াল মাসেই জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে জাওযী (র.) বলেন, এ বক্তব্যই সঠিক।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম যে ১২ই রবীউল আউয়াল, এটাই অধিক প্রসিদ্ধ। হযরত আল্লামা কসতলানী (র.) লেখেন- ১২ ই রবীউল আউয়াল মক্কাবাসীরা তাঁর জন্মোৎসব পালন করেন। অতঃপর তিনি লেখেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ১২ই রবীউল আউয়াল জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত ইবনে ইসহাক (র.) এবং অন্যারাও একই কথা বলেন।

হযরত ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এ মতই বেশীরভাগ উলামায়ে কিরামের নিকট প্রসিদ্ধ। হযরত ইবনুল জাওযী ও ইবনুল জাযার একটু বাড়িয়ে এ প্রসঙ্গে ইজমা হওয়ার কথা বর্ণনা করেন। আর ইজমার উপর আমল করা আবশ্যক। মহানবী (সা.)-এর রবীউল আউয়াল মাসে জন্ম গ্রহণ করাই সঠিক মত।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম দিন সোমবার। তার দলীল হচ্ছে-

عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذالك يوم ولدت فيه وانزلت علي فيه النبوة ـ رواه مسلم رح

হযরত আবূ কাতাদাহ আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সেই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি। সেই দিন আমার উপর নবুওয়াত (কুরআন) নাযিল হয়। মুসলিম শরীফেও এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম সোমবার দিন

Scanned with CamScanner

হয়েছে। তা ছাড়া হযরত ইমাম আহমদ (র.) নিজের মসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওহীর অবতরণ হয়েছে সোমবার। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরত করেছেন সোমবার। মদীনা শরীফ তিনি পৌঁছেছেন সোমবার। কা'বা শরীফ নির্মাণের পর হাজরে আসওয়াদ উঠিয়েছিলেন সোমবার দিন। এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ভোর হওয়ার সময় ভূমিষ্ট হন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস (রা.) থেকে বর্ণিত- আইস (عيـــــس) নামক একজন পাদ্রী মাররুয যাহরান নামক জায়গায় থাকতেন। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, হে মক্কাবাসী! সত্বর তোমাদের মাঝে এমন এক সন্তানের আবির্ভাব হবে, যাঁর সামনে সমগ্র আরব ঝুঁকে পড়বে। আর তিনি সমগ্র আযম অর্থাৎ আরব ছাড়াও আরবের বাইরের দেশেরও সম্রাট হবেন। এটাই তাঁর জন্মের সময়। এরপর হতে যত সন্তানই হত সে সম্পর্কে পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করা হত। যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) জন্মগ্রহণ করলেন, সেদিন দ্রুত আবদুল মুত্তালিব বের হয়ে আইসকে ডাকলেন। আইস বলতে লাগল, হে আবদুল মুত্তালিব, তুমি এ বাচ্চার অভিভাবক হয়ে যাও। কারণ যে বাচ্চার কথা আমি বলতাম, তিনি আজ সোমবার ভূমিষ্ট হয়েছেন। তিনি সোমবারে জন্ম নেবেন এবং সোমবারে মৃত্যু বরণ করবেন।

দুধ পান

ঐতিহাসিকদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ লিখেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আটজন মহিলার দুধ পান করেছেন।

১. তাঁর মা আমিনা ২. সুয়াইবিয়াহ্ ৩. খাওলা বিনত আল মুনজর ৪. সাদিয়া ৫. ৬.৭. আতিকা নাম্নী তিন জন মহিলা এবং ৮. হালিমা সাদিয়া। জাদুল মাআদ নামক কিতাবের লেখক এ আট মহিলার মধ্যে তিন জন মহিলার কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তাঁরা হলেন ১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মা-আমিনা ২. সুয়াইবাহ্ ৩. হালিমা সাদিয়া।

মহিলার কথা বলে থাকেন। তাঁরা হলেন, ১. মা আমীনা ২. সুয়াইবাহ্ ৩. হালিমা সাদিয়া৪. খাওলা বিনতে আল মুনজর ৫. হালিমা ছাড়া বনি সাদ গোত্রের আরেক মহিলা ৬. উম্মে আইমন বারকা আল হাবশা ৭. উম্মে ফারুয়াহ এবং ৮. ৯. ১০. আতিকা নামের তিনজন মহিলা।

সুয়াইবিয়াহ্ হলেন সেই মহিলা যাকে আবূ লাহাব আযাদ করেছিল, যখন সুয়াইবিয়াহ্ রাসূলুল্লাহ এর জন্মের খবর দিয়েছিলেন। আবূ লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) স্বপ্নে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবূ লাহাব, তোমার সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে? তখন আবূ লাহাব জওয়াব দিয়েছিল, আমার কষ্টের আর সীমা নেই। কিন্তু প্রত্যেক সোমবার রাতে আমার আঙুল দু'টা ভিজানো হয় যা চুষে তৃষ্ণা নিবারণ করি। এটা দেওয়া হয় সুয়াইবিয়াহ্কে আযাদ করার বিনিময়ে। যখন সুয়াইবিয়াহ্ আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) জন্মের সংবাদ দেয়, তখন খুশীতে আমি তাকে আযাদ করে দিয়েছিলাম এবং সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দুধ পান করিয়েছিল। উল্লেখ্য, দুটি আঙুল প্রদর্শনের মাধ্যমেই সে মুক্তি দিয়েছিল, এটা আরব রীতি।

হযরত আল্লামা কসতালানী লিখেন- যে কাফিরকে কেন্দ্র করে পবিত্র কুরআনের

লানতসূচক সূরাহ অবতীর্ণ হয়েছে, মহানবী (সা.) এর জন্ম গ্রহণের সংবাদে খুশী হওয়ার কারণে দুযখেও যখন তাকে এমন প্রতিদান দেয়া হয়েছে, তা হলে যে একত্ববাদী মুসলমান মহানবী (সা.)-এর উম্মত রাসূল (সা.) এর জন্মের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করবে, যথাসম্ভব তাঁর মুহব্বতে কিছু খরচ করবে, তাঁর অবস্থা কিরূপ হবে? আমার জীবনের শপথ। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কাজের প্রতিদান এরূপ হবে যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে এরূপ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে মীলাদের অনুষ্ঠান করে আসছেন শুধু তাই নয় তারা এ মাসে অধিক হারে উত্তম কাজ এবং মীলাদ মাহফিল আয়োজন করেন, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর বরকতের ভান্ডার থেকে ব্যপকহারে করুনা বর্ষণ করে থাকেন।

মীলাদ শরীফের পরীক্ষিত বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে একটি হল এ কাজটি একটি বছরের জন্য নিরাপত্তা বিধায়ক, আকাঙ্খিত বস্তু লাভে এবং উদ্দেশ্য সাধনে ইহা তাৎক্ষনিক সুসংবাদ প্রদানকারী। সুতরাং তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মমাসের রাতগুলো আনন্দোৎসবের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেন। এটা রোগাক্রান্ত হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিক যন্ত্রনা ও রোগবৃদ্ধির কারণ হয়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁদের উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন যারা মহানবী (সা.) এর জন্ম মাসের রাতগুলোকে ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করেন, যাতে করে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তার পূর্ণ নিরাময় হয়।

ইমাম হালবী (র.) বলেন- মক্কাবাসীদের প্রথা ছিল, প্রত্যেক মাসে বাচ্চাদেরকে একদিন হারাম শরীফে নিয়ে যেত যেন গ্রাম্য মেয়েরা এসে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করার জন্যে নিয়ে যায়। গ্রাম্য মেয়েরা বাচ্চাদের দুধ পান করানো এবং লালন পালন করার মধ্যে এ রহস্য বর্ণনা করা হয় যে প্রত্যেক ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা বেশী শুদ্ধ ভাষা বলতে পারে। আবার এর মধ্যে শহর এলাকার মেয়ের চেয়ে গ্রাম্য মেয়েদের ভাষা শুদ্ধ বেশী।

তাই শিশুদেরকে দুধ পানের জন্য গ্রাম্য মেয়েদের হাতে দেয়া হত প্রথমতঃ শুদ্ধভাবে ভাষা শিখার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ মুক্ত ও অনাবিল আবহাওয়া পাওয়ার জন্য।

প্রকৃতপক্ষে সন্তান মানুষ বানানো বা অমানুষ বানানো মা-এর উপর নির্ভরশীল। কারণ ام(মা) বলতে বুঝা যায় প্রত্যেক জিনিষের মূল এবং ভিত। যেমন ام القـــران ـ ام القري ـ ام الجبال

মক্কা শরীফকে এ জন্য ام القري বলা হয়, যেহেতু পুরো দুনিয়ার ভিত্তি হল মক্কা শরীফ, অনুরূপ ام القـــران ـ ام الجبـــال এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মায়ের চরিত্র সন্তানদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। যেমন সংকীর্ণমনা মায়ের সন্তান সাহসী হয় না। বে-শরম মায়ের সন্তানের লজ্জা-শরম থাকে না। মায়ের রক্তের সাথে সন্তানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ জন্যে মা দুর্বল হলে সন্তানও দুর্বল হয়। তা ছাড়া মায়ের খাদ্য সন্তানের খাদ্য হয়। এ জন্য হযরত ইমাম দামীরী (র.) লেখেন, যে মহিলার সন্তানের গায়ে দাগ বা কালো দাগ থাকবে সেই মহিলার গর্ভে যতগুলো বাচ্চা হবে, তাদেরও সেই ধরনের দোষ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ দোষ থেকে সন্তানের বাঁচানোর উপায় হল গর্ভকালীন সময় বেশী বেশী করে সাফারজীল ফল খাওয়া। তা হলে আর সন্তানের এ দোষ থাকবে না। সাফারজীল ফল না পেলে পেয়ারা খেলেও উপকার পাওয়া যায়। তবে একটু পরিমাণে বেশী খেতে হয়।

Scanned with CamScanner

দুধ পান করার মধ্যে সন্তানদের অনেক প্রভাব রয়েছে। চারিত্রিক ভাবে তো আছেই, আকৃতি ও গঠনগত পরিবর্তনও আনতে পারে। হযরত ইমাম দমীরী লিখেন- যদি কোন সন্তান সাদা চোখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ বিড়ালের চোখের মত চোখ হয়, তা হলে তার চিকিৎসা হচ্ছে হাবশী অর্থাৎ খুবই কাল মহিলার দুধ পান করানো। এতে চোখ কালো হয়ে যাবে। দুধের মধ্যে এ ধরনের প্রভাব রয়েছে।

হালিমা সা'দিয়া

আল্লাহ তায়ালা আগেই নির্ধারণ করে রেখেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন কোন মহিলার দুধ পান করবেন। ইমাল হলবী (র.) বর্ণনা করেন ঃ হযরত হালিমা বলেন, আমার সওয়ারী দুর্বল ছিল বিধায় আমার পৌছতে দেরী হয়েছিল। আমি তথায় গিয়ে দেখি সকল মহিলা বাচ্চা নিয়ে গিয়েছে। আমি নিরাশ হয়ে এক বৃদ্ধ লোককে বললাম। আমি দুধ পান করানোর জন্য সন্তান তালাশ করছি। আপনার কাছে কি দু'একটা বাচ্চার খবর আছে? তখন সেই বৃদ্ধ লোকটি আমাকে বলল, তোমার নাম কী? আমি উত্তর দিলাম, আমার নাম হালিমা। এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন বংশের? আমি জওয়াব দিলাম, আমি সা'দ গোত্রের। সেই বৃদ্ধ হেসে উঠল। আমি বললাম, আপনি আমার নাম এবং বংশের কথা জিজ্ঞেস করার পর হাসলেন কেন? বৃদ্ধ জবাব দিল, তোমারই দুধ খাওয়ানোর জন্য একটা বাচ্চা ঐ ঘরে রয়েছে। যাও, তাকে কোলে উঠিয়ে নাও। কারণ আমি আগের কিতাবগুলোতে দেখেছি, এ বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য হালিমা নামক এক মহিলা হবে। অধিকন্তু সে বনী সাদ থেকে হবে। তখনই আমি তাড়াতাড়ি করে আমীনার কাছে পৌছলাম এবং বাচ্চাকে উঠিয়ে নিলাম।

মাওয়াহিব কিতাবের লেখক বলেন, হালিমা সাদিয়া বলেন যে, আমার আগে ও দুধ পান করার মহিলা ওখানে পৌছেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নেয়ার জন্যে সবাইকে বলা হয়েছিল; কিন্তু এতিম হওয়ার কারণে কেউই তাকে নেয়নি। আমি সবার শেষে পৌছে শেষ পর্যন্ত কোন বাচ্চা না পেয়ে খালি হাতে ফিরে আসার পরিবর্তে সেই বাচ্চার খবর শুনে তালাশ করতে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি শুয়ে আছেন, একটু অগ্রসর হয়ে যখন বুকের উপর হাত রাখলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃদু হেসে চোখ মুবারক খুললেন। তাঁর দু'চোখ থেকে দুটি নূরের ঝলক ঝলমল করে উঠল, যার রশ্মি আসমান পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। আমি চাঁদের জ্যোৎস্না দেখে তাঁর কপালে চুমো দিলাম এবং আমার ডান স্তন তাঁর মুখে চুষার জন্য দিলাম। তিনি তা পান করে তৃপ্তি মিটালেন। এরপর আমি বাম স্তনটি তাঁর মুখে দিলাম। তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ অভ্যাস রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সর্বদা বিদ্যমান ছিল। কারণ সৃষ্টিগতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) ন্যায়বান ছিলেন। তাঁর জানা ছিল, এ দুধের মধ্যে তাঁর আরেকজন দুধ-ভাই শরীক রয়েছে।

মক্কা শরীফ থেকে তাঁকে নিয়ে যখন আমি ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন সব ধরনের কল্যাণ ও বরকত আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমনকি আমাকে আমার স্বামী বলতে লাগলেন, হে হালিমা! তুমি এ বাচ্চার অবস্থা গোপন রাখবে। এর মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে। ফেরার পথে আমার দ্রুততা দেখে অন্যান্য মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, হে আবূ যুয়াইবের মেয়ে! এটাই কি তোমার সওয়ারী যা নিয়ে তুমি এসেছিলে? ঘরে গিয়ে দেখি, ছাগলগুলো পেট ভরে খেয়ে ময়দান থেকে ফিরে

এসেছে। তারা অনেক দুধ দিল। পক্ষান্তরে অন্যদের ছাগল খাবার না পেয়ে চলে এসেছে এবং আগের চেয়ে দুধও কম দিল। এমন কি আমাদের ছাগলগুলো আগে যেখানে চরত, সেখানে বিচরণ সত্বেও এগুলোর এমন অবস্থা হয়েছিল।

শায়মা

শায়মা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুধ-বোন ছিলেন। তিনি তাঁকে দোলনা দেওয়ার সময় এ কবিতা আবৃত্তি করতেন ঃ

هذا اخ لي لم تلده امي - وليس من نسل ابي وعمي
يا ربنا ابق اخي محمدا - حتي اراه يافعا و امردا
ثم اراه سيدا ومسودا - واكبت اعاديه معاد الحسدا

১. এই আমার ভাই যাকে আমার মা জন্ম দেননি এবং সে আমার বংশেরও নয়। না বাপের পক্ষ থেকে, না চাচার পক্ষ থেকে।
২. হে আমাদের পালনকর্তা, আমার ভাই মুহাম্মদকে দীর্ঘজীবী রাখুন যেন তাকে যুবক ও পূর্ণ বয়স্ক রূপে দেখি।
৩. এরপরও যেন তাঁকে স্বীকৃত সরদার হিসেবে দেখি তাঁর শত্রুরা যেন তাদের হিংসার অনলে জ্বলে পুড়ে মরে।

বন্দীনী শায়মা

শায়মা হাওয়াজিনদের সাথে যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে এসেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বলতে লাগলেন ঃ انا اخت صاحبكم আমি তোমাদের সাথী লোকের বোন। এ খবর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পৌছলে তাঁকে ডাকা হল। রাসূল (সা.) বললেন তুমি নাকি আমার বোন হওয়ার দাবী করছ? তিনি জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ বললেন, এ ব্যাপারে তোমার কী কোন প্রমাণ আছে? তখন শায়মা নিজের পিঠের সামান্য কাপড় খুলে দেখালেন, হে ভাই, আপনি ভুলে গেছেন আপনি আপনার দাঁত দিয়ে এ কামড় দিয়েছিলেন। যখন আমি আপনাকে আমার পিঠে উঠিয়েছিলাম। এ চিহ্ন এখন পর্যন্ত আছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) তৎক্ষনাত দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, হে বোন! আপনি এ চাদরের উপর বসুন। যদি আপনার ইচ্ছে হয়, আপনি সানন্দে এখানে থেকে যান। আমি আপনার খেদমত করব। আর যদি আপনি আপনার ঘরে যেতে চান, তা হলে আমি আপনাকে পৌছিয়ে দেব। যখন শায়মা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, তখন তার কওম ফরিয়াদ করতে লাগল, হে শায়মা, তোমার ওসীলায় আমরাও মুক্ত হতে পারবো। তখন হওয়াজিনের কয়েদীকে গনীমতের মালের নিয়ম অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এর উপর শায়মা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট আরয করতে লাগলেন, হে ভাই, আমার গোত্রের লোকেরা আশা করছে আমার ওসীলায় তারাও মুক্ত হয়ে যাবে। তখন রাসূল (সা.) বললেন, কুরাইশের অংশে যত কয়েদী আছে, তাদেরকে ফিরিয়ে নাও। এ কথা শুনার পর মুহাজীরগণ বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমরা মুহাজিরদের নিকট যত কয়েদী আছে, সবাই আপনার জন্যে কুরবানী। আনসারগণ এ কথা শুনে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আনসারদের কাছে যত কয়দী আছে, সব আপনার জন্যে কুরবাণী। এর পর শায়মা ছয় হাজার কায়েদী নিয়ে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাসূল (সা.) তাদের আরোহণের জন্য উট, আসবাবপত্র এবং রসদ ইত্যাদি

Scanned with CamScanner

দিয়ে বিদায় দিলেন।

হযরত আব্বাস (রা.) রাসূল (সা.)-এর নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), আমি ইসলাম গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে, আপনি দোলনায় দোলতেন, অপর দিকে চাঁদের সাথে খেলা করতেন। কথা বলতেন, অপর দিকে আপনি আঙুলি দিয়ে যে দিকে ইশারা করতেন, সেই দিকে চাঁদ ঝুঁকে পড়ত। এ হাদীস ইমাম বায়হাকী, ইমাম সাবুনী, আল্লামা খতীব বাগদাদী এবং ইবনে আসকির নিজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেন।

রাসূল (সা.)-এর মুখ- নিসৃত প্রথম বাণী

ফতহুল বারী নামক কিতাবে আছে, সীরাতুল ওয়াকিদী নামক গ্রন্থ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ মায়ের উদর হতে ভূমিষ্ট হওয়ার পর প্রথম যে বাক্য বলেন তা হলো- الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة واصيلا

রাওদ্ব নামক গ্রন্থে আল্লামা ওয়াকিদী (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) জন্ম নিয়ে সর্বপ্রথম যে কথা বলেন, তা হল শাওয়াহিদুন নবুওয়াত নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- রাসূলুল্লাহ (সা.) যমীনে অবতরণ করার সাথে সাথে তার মাথা মুবারক আসমানের দিকে করে শুদ্ধ ভাষায় বলেন- لا اله الا الله واني رسول الله

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি যা বলেছেন সব কিছুর সারমর্ম হল এই। রাসূল (সা.) দোলনায় কথা বলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষ বিশেষত্ব নয়, আম্বিয়াদের জন্যও বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ পাঁচজন শিশু দোলনায় কথা বলা সম্পর্কে রিওয়ায়ত রয়েছে, যাঁদের মধ্যে কেউ নবী ছিলেন না ১. ইবনে মশাত ২. ইউসুফ (আ.)-এর সততার সাক্ষী ৩. ছাহেবে জুরাইজ এবং ৪ আসহাবে উখদুদ কর্তৃক দন্ডিত মহিলার কোলের বাচ্চা। এ কাহিনীর ব্যাপারে হযরত ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন- একজন মহিলাকে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্যে আনা হয়েছিল। সে মহিলা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় তার কোলের বাচ্চা বলতে লাগল, মা! তুমি, সত্যের উপর আছ, তুমি ধৈর্য্য ধর। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত সূরা বুরুজের তাফসীরে রয়েছে। ৫. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যামানায় মুবারক আল ইয়ামামা দোলনায় কথা বলেন। এ কাহিনীর দলিলাদি বায়হাকীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) যারা দোলনায় কথা বলেছেন তাদের কথা কবিতায় উল্লেখ করেন ঃ

تكلم في المهد النبي محمد ÷ ويحيي وعيسي والخليل ومريم
ومبرئ جريج ثم شاهد يوسف ÷ وطفل لدي الاخدو ديروبه مسلم
وطفل عليه مر بامه التي ÷ بقال لها ترني ولاتتكلم
وماشطة في عهد فرعون طفلها ÷ وفي زمن الهادي المبارك يختم

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইয়াহইয়া (আ.), হযরত ঈসা (আ.) হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.) হযরত মরিয়ম (আ.) জুরাইজ (র.) এর পবিত্রতা ঘোষণাকারী, ইউসুফ এর সাক্ষী, আসহাবে অখদুদের সাথে সম্পর্কিত শিশু এবং যে ব্যভিচারে অপবাদগ্রস্থ মায়ের পবিত্রতা ঘোষণা করেছিল দোলনায় কথা বলেন এবং মাশিতা ফিরআউনের যামানায় এবং মহানবীর যামানায় মুবারক কথা বলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষত্বের মধ্যে রয়েছে ফিরিশতা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দোল দিতেন। ইমাম বায়হাকী ও ইবনে আসাকীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে

রিওয়ায়ত করেন, হালিমা সাদিয়া বর্ণনা করেন, তাঁর দুধ পান করার প্রাক্কালে সর্বাগ্রে রাসূল (সা.) তাঁর মুখ দিয়ে এ বাক্যসমূহ বলেন, الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا

রাসূল (সা.) একটু বড় হওয়ার পর যখন বাচ্চারা খেলত তখন রাসূল (সা.) একা দাঁড়িয়ে দেখতেন; কিন্তু খেলায় শরীক হতেন না। মুহাম্মদ বিন সাদ, আবূ নাঈম এবং ইবনে আসাকীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, হালিমা (রা.) তাকে দূরে যেতে দিতেন না। একদিন দুপুরের সময় হালিমার অজান্তে শায়মার সাথে তিনি বাইরে চলে গিয়েছিলেন। হালীমা বলেন, আমি উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে তালাশ করে তাঁর বোনের সাথে রোদে তাঁকে পেলাম। আমি শায়মাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন তাঁকে রোদে নিয়ে এসেছ? তখন শায়মা বলেন- আমার ভাইকে রোদ ক্ষতি করতে পারে না? কারণ মেঘ তাঁর মাথার উপর ছায়া দেয়। যখন তিনি চলেন, তখন ছায়াও চলে। যখন তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন ছায়াও দাঁড়িয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি যুবক হলেন। কিন্তু এরপরও তাঁর মধ্যে শিশুসুলভ কোন কাজ পরিলক্ষিত হয়নি।

দুধ ছাড়ানো

হযরত হালিমা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন দুধ পান করা ছেড়ে দিলেন, তখন আমি তাঁকে নিয়ে তাঁর মা আমিনার নিকট উপস্থিত হলাম এবং পুনরায় আমাদের ঘরে নিয়ে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। বিবি আমিনা রাসূল (সা.)-কে আমার সাথে দিয়ে দিলেন। তাঁকে নিয়ে ঘরে আসার দু'তিন মাস পর রাসূল (সা.) তাঁর দুধ ভাই আবদুল্লাহর সংগে পশুচারণ ভূমিতে গেলেন। হঠাৎ আবদুল্লাহ দৌড়ে এসে বলেন, দু'জন সাদা কাপড় পরিহিত লোক এসে আমার কুরাইশী ভাইকে যমীনে শুইয়ে দিয়ে তার পেট ছিঁড়ে ফেলছেন! এ খবর শুনে আমি এবং আমার স্বামী দৌড়ে এলাম এবং তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থায় পেলাম। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর চেহারা মুবারক কিছুটা পরিবর্তিত দেখলাম। অবস্থা জিজ্ঞেস করতেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার কাছে সাদা পোষাক পরিহিত দু'জন লোক আসেন এবং আমাকে চিৎ করে শুইয়ে আমার পেট ছিঁড়ে ফেলেন এবং ভিতর থেকে কিছু বের করে ফেলে দিলেন। পরে আমার শরীর ঠিক করে দিয়ে চলে যান।

তখন আমার স্বামী রাসূল (সা.)-কে কোলে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে আসেন এবং আমাকে বুঝিয়ে বললেন, হালিমা, এ বাচ্চাকে নিয়ে আরো কোন বিপদ ঘটতে পারে। সুতরাং বাচ্চাকে নিজের মায়ের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। আমি স্বামীসহ বাচ্চাকে নিয়ে মক্কা শরীফ পৌঁছলাম। রাসূল (সা.)-কে নিয়ে আমি মক্কার গেট পর্যন্ত পৌঁছলাম। তখন আমরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে একটু দূরে গেলাম। ফিরে এসে তাঁকে পেলাম না। আমি চিন্তিত হয়ে আবদুল মুত্তালিবকে বিষয়টি অবহিত করলাম। আবদুল মুত্তালিব সাত বার কাবা শরীফ তওয়াফ করে আল্লাহ তায়ালার কাছে দু'আ করলেন। সে সময় অদৃশ্য থেকে একটা আওয়াজ শুনা গেল, 'হে লোকগণ! তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ো না। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একজন রব আছেন, যিনি তাঁকে ধ্বংস হতে দেবেন না। তাঁকে অসম্মানিতও করবেন না।' আবদুল মুত্তালিব বলেন, 'হে গায়েবী আওয়াজ প্রদানকারী! তিনি কোথায়?' প্রত্যুত্তর এলো, 'তিনি তাহামা ময়দানে আছেন।' অতঃপর আবদুল মুত্তালিব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সওয়ারীর উপর আরোহণ করে রওয়ানা হন। রাস্তার মধ্যে ওরাকা বিন নওফল এর সাথে সাক্ষাত হয়। দু'জন এক সাথে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁরা

Scanned with CamScanner

দু'জন রাসূল (সা.)-কে একটা বৃক্ষের নীচে দাঁড়ানো অবস্থায় পেলেন।
অন্য রিওয়ায়তে আছে, হযরত আবূ মাসউদ, সকফী, আমর বিন নওফল সওয়ারীর উপর আরোহণ করে আসার পথে তাঁরা দু'জন রাসূল (সা.)-কে পাতা ছেঁড়া একটি কলা গাছের নীচে দেখেন। ইহা শুনে আমর তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? যেহেতু তাঁরা রাসূল (সা.) সম্পর্কে জানতেন না। তিনি জবাব দিলেন, আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম। ইহা শুনে তারা রাসূল (সা.)-কে উঠিয়ে তাঁদের সামনে বসিয়ে নিয়ে আসেন এবং আবদুল মুত্তালিবের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আবদুল মুত্তালিবের কাছে ফিরিয়ে দিলেন, তখন আবদুল মুত্তালিব এক হাজার উট সদকা করেন এবং পঞ্চাশ রতল স্বর্ণ সদকা করেন। হালীমাকে উত্তম উপহার দিলেন। কোন কোন মুফাস্সির وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى অর্থ : 'তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন, এআয়াতে উক্ত হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।
হযরত হালীমা সাদিয়া বলেন, রাসূল (সা.)-কে বিবি আমিনার কাছে নিয়ে গেলে তিনি প্রশ্ন করলেন তাঁর সন্তানকে এতো তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেবার কারণ কী? আমরা তাঁর বক্ষ উন্মোচনের কথা বললাম এবং দ্বিতীয় ঘটনায় হারিয়ে যাওয়ার আশংকার কথা বললাম। আমীনা আমাকে প্রশান্তি দিলেন, তোমরা তাঁর উপর শয়তানের ভয় কর না। কারণ তাঁর অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে। তিনি গর্ভধারণ ও জন্মকালীন আলৌকিক ঘটনা থেকে কিছু বললেন।
বক্ষ উন্মোচনের তারিখ নিয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়াতে মতভেদ রয়েছে। হাফিয ইরাকী তাঁর نظم السيرة এবং তাঁর শিষ্য ইবনে হাজার তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্ষ উন্মোচন তাঁর চার বছর বয়সে হয়েছে।

খতমে নবুয়ত

'খতমে নবুওয়াত' বলে অনেকে 'মোহরে নবুওয়াত' অর্থ নিয়ে থাকেন। মোহরে নবুওয়াত দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা সিরিয়ার বড় বড় পাদ্রী হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর নিকট উল্লেখ করেন, তাঁর মধ্যে দুটি বিশেষ চিহ্ন পাবেন। প্রথমতঃ রাসূল (সা.) সদকা কবুল করবেন না এবং দ্বিতীয়তঃ দু কাঁধের মধ্যে মোহরে নবুওয়াত থাকবে।
হযরত সলমান ফার্সী বলেন, আমি প্রথম সক্ষাতে চিহ্ন দু'টির যাচাই করার নিমিত্ত যখন রসূল (সা.)-কে সদকা পেশ করলাম, তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন না। আর যখন হাদীয়া পেশ করলাম, তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন। আমি তাঁর পিঠ মুবারকের দিকে এগোলে তিনি বুঝতে পারলেন আমি মোহরে নবুওয়াত দেখতে চাচ্ছি। তখন রাসূল (সা.) চাদর মুবারক একটু সরিয়ে নিলেন। তখন মোহরে নবুওয়াত দেখে চুমু খেতে লাগলাম এবং বলতে শুরু করলাম-
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدارسول الله এটাই গ্রহণযোগ্য কথা। কিন্তু
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا
আয়াতের মধ্যস্থিত خاتم النبين এর তফসীরে রাসূল (সা.) নিজেই لانبي بعدي (আমার পরে কোন নবী নেই) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।
মহানবী (সা.) ও আয়াতখানা দ্বারা খতমে নবুওয়াত অর্থ নিয়েছেন, মোহরে নবুওয়াত নয়।

এখন আমার কথা হচ্ছে, যাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি বেশী বুঝবেন না অন্য কেউ ! যদি এ কথা অবধারিত হয় যে রাসূল (সা.)-ই কুরআনের মর্ম বেশী বুঝবেন, তা হলে অন্য কারো এ ব্যাপারে কথা বলার অবকাশ থাকে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতা-মাতা নাজাতপ্রাপ্ত

অধিকাংশ বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতা-মাতা নাজাতপ্রাপ্ত অর্থাৎ আখিরাতে আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবেন। এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।

প্রথম মত

তাঁরা দু'জন আহলে ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। আর যাঁরা তাঁর নবুওয়াত লাভের আগে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাঁদেরকে আযাব দেয়া হবে না।
আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন-
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا الاية
'আমি কাউকে আযাব দেব না, যতক্ষণ না আমি রাসূল প্রেরণ করি।'

দ্বিতীয় মত

তাঁরা শিরক করেননি বরং তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তৃতীয় মত

নবুওয়াত লাভের পর আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে জীবিত করে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁরা মহানবী (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছেন। মুহাদ্দিসীনে কিরামের এক বিরাট অংশ এ বক্তব্যই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং হযরত ইবনে শাহীন, হাফিয আবু বকর, খতিব বগদাদী, সুহাইলী, কুরতুবী, তাবারী, ইবনে মুনীর (র.) এবং অন্যরা এ গ্রহণ করেন। এ সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) ছয়খানা পুস্তিকা লিখেছেন-

১. مالك الحنفاء في والدي المصطفي صـ
২. الدرج المنيفة فى الاباء الشريفة
৩. المقامة السندسية التسمية المصطفوية
৪. التعظيم والمنة في ان ابوي رسول الله في الجنة
৫. المنيفين في احياء الوالدين الشريفين
৬. السبيل الحلية في الأباء العلية

হযরত ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লিখিত পুস্তিকাগুলোয় মুহাক্কিকীনের বর্ণিত বক্তব্য তিনটি কুরআনের অনেক আয়াত ও হাদীসের আলোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যাকরেন। এখন এ সব কথা কিছুটা বিস্তৃতিসহ আলোচনা করা হচ্ছে।
মালিকী মাযহাবের অনুসারী ইমামদের অন্যতম ইমাম হযরত কাযী আবূ বকর ইবনুল আরবী রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর পিতা দুযখী বলে অভিমত পোষণকারী জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে জবাবে বললেন, এমন ব্যক্তি লানতপ্রাপ্ত। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন-
اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ
অর্থাৎ যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে কষ্ট দেবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই

Scanned with CamScanner

দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের উপর লানত করেন এবং তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

ইমাম তাবারী (রা.)স্বীয় সনদে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) হাজুন নামক স্থানে মনঃক্ষুণ্ণও চিন্তিত অবস্থায় অবতরণ করলেন, সেখানে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছু সময় অবস্থান করলেন। তারপর সেখান থেকে আনন্দিত অবস্থায় ফিরে এসে বললেন, আমার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করলে তিনি আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে আমার মাকে জীবিত করলেন, অতঃপর তিনি আমার উপর ঈমান আনলে তাঁকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিলেন।

হযরত আবুল খাত্তাব ইবনে দাহিয়া এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, মৃত্যু চাক্ষুস দেখার পর যেখানে ঈমান আনার মধ্যে কোন উপকার নেই, সেখানে মৃত্যুর পর যিন্দা হয়ে ঈমান আনার মধ্যে কি উপকার থাকতে পারে?

হযরত ইমাম কুরতুবী (র.) জওয়াব দেন মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াটা তো (نقلا) অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। عقلا ও মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াটা সম্ভব। যেহেতু তার নযীর বা দলিল রয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতেও তা জায়িয।

যদি রাসূল (সা.)-এর মাতা-পিতার ঈমান গ্রহণ করার ব্যাপারটা গ্রহণযোগ্য না হয়, তা হলে বনী ইসরাইলের নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করে তার সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল? নিয়ম হচ্ছে এই যে, সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে ইবাদত সম্পাদনের সুযোগও চলে যায়। অথচ একদা সোলায়মান (আ.)-এর আসরের নামায কাযা হয়ে গেলে তাঁর আবেদন কবুল করে আল্লাহ তায়ালা সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে পুনরায় উঠিয়ে দেন। ফলে তিনি আসরের নামায আদায় করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ নামাযকে কাযা হিসেবে বিবেচনা না করে আদা তথা যথাসময়ে সম্পাদন হিসেবে কবুল করেন। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা নিয়ম বহির্ভূত আসরের নামায কবুল করে নেন। সে ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও সকল রাসূলের সরদার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাতা-পিতার ঈমান কবুল করাটা বিচিত্র কিছুই নয় এবং নিয়ম বহির্ভূত নয়।

যদি বলা হয়, এটা তো গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত কথা যে, মানুষ মরে যাওয়ার পর তার মধ্যে সাক্ষীর উপযুক্ততা থাকে না। এর জবাবে বলা হবে যখন মূসা (আ.)-এর খাতিরে বনি ইসরাইলের মৃত ব্যক্তিকে যিন্দা করে তার সাক্ষ্য অনুযায়ী হত্যাকারীকে শাস্তি পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। অথচ নিসাবে শাহাদত তথা সাক্ষীর পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ দু'জন পর্যন্ত ছিল না। সে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাতা-পিতার মৃত্যু পরবর্তী সাক্ষী তওহীদ আর রিসালত সম্পর্কে কেন কবুল হবে না?

মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা সম্পর্কে

মৃত ব্যক্তিকে যিন্দা করার কথা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাপারে হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাসতালানী (র.) সংক্ষেপে লিখেন, ঈসা (আ.) মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন তেমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী (সা.)-এর হাতে একদল লোককে জীবিত করেন।

এর বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা যুরকানী (র.) তাঁর কিতাবের প্রথম পরিচ্ছেদের ১৭০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেন, (মিস্‌রী ছাপা)। আল্লামা যুরকানী (র.) আরও বলেন, আসহাবে কাহাফকে শেষ যামানায় যিন্দা করা হবে। তাঁরা হজ্জ করবেন, তাঁরা রাসূল (সা.)-এর উম্মতে দাখিল হয়ে মর্যাদা হাসিল করবেন।

রাসূল (সা.)-এর উম্মত হয়ে বিশেষ মর্যাদা লাভের জন্য আসহাবে কাহাফের জীবনের কিছু অংশ যখন আল্লাহ তায়ালা বাকী রাখলেন, তখন রাসূল (সা.)-এর মাতা-পিতার জীবনের একাংশ অবশিষ্ট রাখা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

হযরত আবূ তালিবের শরীর দুযখের আগুন থেকে রক্ষা পাবে, শুধু দুটি পায়ে আগুনের জুতা পরানো হবে। তিনিই হবেন দোযখের সবচেয়ে কম ও হালকা শাস্তি ভোগকারী (এ প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফে রিওয়ায়াত রয়েছে)। তাঁর এ হালকা শাস্তির কারণ লেখা হয় যে, নিয়ম হল, রাসূল (সা.)-কে স্পর্শ করলে ঐ স্পর্শকারী ব্যক্তির উপর দুযখের আগুন হারাম হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর মাতা-পিতার রক্তের, শরীরের, নূরের এবং আত্মার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কেন রাসূল (সা.)-এর মাতা-পিতা দুযখ থেকে পরিত্রাণ পাবেন না!

হযরত আল্লামা ইবনে জরীর (র.) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (অচিরেই আপনাকে আপনার প্রতিপালক এমন কিছু দান করবেন, যার ফলে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন)-এর তাফসীরে বলেন, لا يدخل احد من اهل بيته النار -'তাঁর পরিবারবর্গ হতে কেউ দুযখে যাবেন না।'

রাসূল (সা.)-এর পিতা-মাতা যেহেতু তাঁর নবুওয়াত লাভের আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাই তাঁদেরকে আহলে ফিতরাত গণ্য করা যায়।

হযরত ইমাম قسطلاني رحـ লিখেন, উসূলের মধ্যকার আশায়েরা সম্প্রদায় ও হযরত ইমাম শাফী (র.)-এর অনুসরণকারী ফকীহগণ বলেন, যে ব্যক্তি নবুওয়াত ও রিসালাতের ইসলামী দাওয়াত পৌছার পূর্বেই মারা যাবে, সে দুযখের আগুন হতে পরিত্রাণ পাবে। এর অনুকূলে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে কুরআনের আয়াত-وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا রয়েছে। অর্থাৎ যার নিকট আল্লাহর রাসূল পৌছেননি, তাকে আযাব দেয়া হবে না।

হযরত ইমাম রাযী (র.) তাঁর কিতাব اسرار التنزيل এ লিখেন-আল্লাহ তায়ালার বাণী 'الَّذِينَ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ এর অর্থ মহানবী (সা.) এর নূর প্রবাহমান এবং তা প্রবাহিত হয়েছে একজন সিজদাকারীর নিকট হতে অন্য সিজদাকারীর কাছে। এখান থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রাসূল (সা.)-এর সকল পূর্বপুরুষ মুসলমান ছিলেন। হযরত রাসূল (সা.) সম্পর্কে হযরত আমীনার আকীদা ও নিম্নলিখিত কবিতা থেকে বুঝা যায়। আমীনা (রা.) মৃত্যুর আগে রচনা করেন-

بارك فيك الله من غلام ÷ يا ابن الذي من حومة الحمام
نجابعون الملك العلام÷ فودي غداة الفرب بالسهام
بمائه من ابل سوام ÷ ان صح ما البصرت في المنام
فانت مبعوث في الانام÷تبعث في الحل والرام
تبعث في التحقيق ولا بلام ÷ اين ابيك البر ابراهام
فالله انهاك عن الاثام÷ وان لا تولي بها مع الاقوام

আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বরকত দান করুন, হে বৎস! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন।

মালিক অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার অপার মহিমায় তোমাকে নাজাত দান করুন, তোমাকে তীরের আঘাত থেকে রক্ষা করুন।

তোমার কল্যাণের জন্য এক শত উট সদকা করা হয়েছে। আমি স্বপ্নে যা দেখেছি তা যেন ঠিক হয়।

Scanned with CamScanner

মানব সমাজে তুমি আবির্ভূত হয়েছ হিল্ল ও হরম তথা সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি।
দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তোমার আবির্ভাব হয়েছে, তোমার বাপ ইবরাহীমের দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।
আল্লাহ তায়ালা তোমার দ্বারা মূর্তি ধ্বংস করুন। তোমারই নেতৃত্বে সকল জাতি পরিচালিত হোক।
এপরও তাঁকে দোযখী বলাটা কতই বেইনসাফী। তাছাড়া আরো অনেক হাদীস থেকে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, তার পিতা-দাদা তথা উর্ধ্বতন পুরুষদের মধ্যে কেউই মুশরিক ছিলেন না। কারণ রাসূল (সা.) বলেন- لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات সব সময় পবিত্র পৃষ্ঠ থেকে পবিত্র উদরে আমি স্থানান্তরিত হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, انما المشركون نجس মুশরিকগণ নাপাক। এর থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাপ-দাদা মুশরিক ছিলেন না। হযরত আল্লামা মক্কী সুন্নাসী এবং তিলমসানী শিফা কিতাবের হাশিয়ায় লিখেছেন, তাঁরা বলেন, রাসূল (সা.)-এর মা-বাপ থেকে শিরক প্রকাশ পায়নি। কেননা রাসূল (সা.) পবিত্র পৃষ্ঠ থেকে পবিত্র উদরে স্থানান্তরিত হন। আর এর জন্য ঈমান অপরিহার্য।
হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, আমি হযরত ইমাম রাযী থেকে একটি শক্ত দলিল সংগ্রহ করেছি, যা আম এবং খাসের অর্থাৎ সাধারণ ও বিশেষ উভয় প্রকারেই হয়ে থাকে। আম এর ক্ষেত্রে দুইটি অবস্থা হতে।
প্রথম অবস্থা ঃ হচ্ছে রাসূল (সা.)-এর পূর্ব পুরুষগণ প্রত্যেকই তাঁদের সম-সাময়িককালের সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণনা রয়েছে-
بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتي بعثت من القرن الذي كنت فيه
দ্বিতীয় অবস্থা ঃ যমীনে সব সময় কমপক্ষে সাত জন মুসলমান থাকেন। এর চেয়ে কম হয় না। যাদের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা আযাব দূর করেন, এর প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীস- হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- সর্বদা সর্বকালে যমীনের উপর কমপক্ষে সাত জন মুসলমান থাকেন, যাদের কারণে যমীন ধ্বংস হয় না, যদি এরা না হতেন, তাহলে দুনিয়া ও তাতে যা আছে, সব ধ্বংস হয়ে যেত। এভাবে ইমাম আহমদ (র.) كرامات الاولياء নামক কিতাবে এ কথা উল্লেখ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নূহ (আ.)-এর পর থেকে সব সময় যমীনে কমপক্ষে সাত জন মুসলমান সৃষ্টি করা যায় যাদের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা যমীন থেকে বালা মুসীবত দূর করেন।
এখন যদি এ দু'টি ভূমিকাকে একত্রিত করা হয় তখন এটা দু'টি অবস্থা থেকে খালি হয় না। হয়ত রাসূল (সা.)-এর পূর্ব পুরুষগণ সে যামানায় উল্লেখিত সাত জনের মধ্যে ছিলেন তা হলে আমাদের দাবী সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর যদি তাঁরা ঐ সাত জনের বাইরে হন সেই ক্ষেত্রে আবার দু'অবস্থা হতে খালি হবে না। হয়ত ঐ সাতজন তাঁর পূর্ব-পুরুষদের চেয়ে ভাল ছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ এ দাবী সঠিক নয়, যেহেতু ইহা হাদীসের বিরোধী হয়। অথবা তাঁর পূর্বপুরুষগণ সর্বোত্তম ছিলেন এবং শিরকের উপর ছিলেন, তাও সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল।
কারণ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন - وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ নিশ্চয়ই একজন মুমিন দাস মুশরিক হতে উত্তম। তা হলে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, তারা তাওহিদের উপর ছিলেন। কারণ তারাই তাদের যামানায় যমীনের উপর উত্তম ছিলেন। খাস-এর ক্ষেত্রে হযরত ইবনে সাদ (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়ত করেন, তিনি

বলেন, হযরত নূহ (আ.) থেকে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত পূর্বপুরুষ সকলই ইসলামের উপর ছিলেন। হযরত ইবনে জরীর (র.) ইবনে আবূ হাতীম (র.), ইবনে মুনযীর (র.) বাযযার, হাকীম (র.) সকলেই সহীহ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন, হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত দশটি করন (قرون) বা এক হাজার বছর সময় ছিল। এ সময়কার সকলেই শরীয়তের উপর এবং হকের উপর ছিলেন। এরপর যখন মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ (রা.)-এর কিরাতে আছে- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا فى التنزيل فبعث الله النبين সকল লোকই একটি উম্মতের ছিল, এরপর যখন তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে প্রেরন করেন। পবিত্র কুরআনে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। নূহ (আ.) আল্লাহ তায়ালার নিকট দুআ করেন-
رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا
হে আল্লাহ আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও মুমিন অবস্থায় যারা আমার ঘরে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে ক্ষমা করুন।
আর সাম বিন নূহ (আ.)-এর ঈমান কুরআন এবং ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এমনকি তিনি নবী হওয়ার ব্যাপারেও হাদীস রয়েছে। তাঁর ছেলে আরফখশাদও মুমিন হওয়ার ব্যাপারে হাদীস রয়েছে।
হযরত ইবনে সাদ (রা.) কলবীর মাধ্যমে রিওয়ায়ত করেন। হযরত নূহ (আ.)-এর সময় বাবেল শহরের সকল লোক ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নমরূদ তাদের বাদশাহ হওয়ার সময় পর্যন্ত। অতঃপর নমরূদ তাদেরকে মূর্তিপূজার দিকে আহবান করল। নমরূদের যামানায় হযরত ইবরাহীম (আ.) ও আযর বিদ্যমান ছিলেন। ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে করীমে বলেন-
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ -
অর্থাৎ যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতা ও তাঁর কওমকে সৎপথের দিকে আহবান করে বলেন, তোমরা যার পূজা করছ আমি তা থেকে বাইরে। তাতে আমি নেই। আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে হিদায়াত করবেন। অন্য এক হাদীসে আছে।
হযরত ইবনে আবদ হামিদ (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এবং হযরত মুজাহিদ (রা.) থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন, একত্ববাদের বাণী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরও অবশিষ্ট থাকে।
হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, شهادة ان لا اله الا الله হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরের মধ্যে সর্বদা তওহীদ চালু রয়েছে, এ জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَّاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ
এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে জরীর (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দুআ করার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুআ কবুল করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আর কেউই এ দুআর পর মূর্তি পূজা করেননি।
হযরত ইবনে হাতিম (রা.) হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা (রা.) থেকে হাদীস বয়ান করেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ মূর্তিপূজা করত? হযরত সুফিয়ান বিন উআইনা (রা.) জওয়াব দিলেন, তোমরা কী

Scanned with CamScanner

শুননি আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ
(হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার বংশধরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।) তাঁকে তারপর প্রশ্ন করা হল, এ দুআর ভিতর কি হযরত ইসহাক (আ.)-এর সন্তানগণ অন্তর্ভূক্ত নয়? তিনি উত্তর দিলেন। জ্বী-না! কারণ এ দুআ বিশেষ করে এ শহরের বাসিন্দাদের জন্য করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ যেন মূর্তি পূজা না করে। আর সেই সময় সেখানে কেবল মাত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে অবস্থান করানো হয়েছিল।
ইবরাহীম (আ.) দুআ করেছিলেন- اجعل هذا البلد امنا
এর মধ্যে তো অন্য কোন শহর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং আরো দুআ করেছিলেন-
وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ -
মোট কথা এ দুআ শুধু হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানদের জন্য করা হয়েছিল। এটা তাঁর দুআর শব্দ চয়ন থেকে আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। তিনি বলেন- رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
হে আমার পরওয়ারদিগার। আমি আমার সন্তানকে তোমার ঘরের পাশে এমন এক ময়দানে অবস্থান করিয়েছি যেখানে কোন ক্ষেত-খামার নেই। হে পরওয়ারদিগার! তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে।
হযরত ইবনে জরীর (র.) থেকে ইবনে মুনযির (র.) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي আয়াতের তফসীর এভাবে করেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দল ফিতরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করতে থাকেন। সহীহ বুখারী ও অনান্য কিতাবে আছে, তা ছাড়া অনেক আলিম থেকে দলীল সাব্যস্ত আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যামানা থেকে হযরত আমর বিন আমীর আল-খুযায়ীর যামানা পর্যন্ত আরববাসী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের উপর ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউই কুফর বা মূর্তিপূজা করেননি। আমর বিন আমীরকে আমর বিন লুহাই নামেও ডাকা হত।
আমর বিন লুহাই সর্ব প্রথম দ্বীনে ইবরাহীমকে পরিবর্তন করে মূর্তিপূজার প্রবর্তন করে। এটা হয়েছিল রাসূল (সা.)-এর পূর্বপুরুষ কেনানার কাছাকাছি সময়ে। অতঃপর আলিমগণ দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ করেন যে, আদনান, মা'দ, রবীয়া, মুদর, খুযাইমা, আসাদ, ইলিয়াস এবং কাব হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাযহাবের উপর ছিলেন।
হযরত আল্লামা কাসতালানী (র.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর সম্মানিত পূর্বপুরুষগণ হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে কাব পর্যন্ত শুধু আযর ছাড়া সকলেই ঈমানের উপর ছিলেন। আযর যদি ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা হয়ে থাকেন, তা হলে তাদের থেকে তিনি ব্যতিক্রম। আর যদি চাচা হয়ে থাকেন, তা হলে কোন কথা নেই। বাকী মুররাহ থেকে আবদুল মুত্তালিব পর্যন্ত চার স্থর সম্পর্কে পরিষ্কার কোন দলিল নেই। আবদুল মত্তালিব আহলে ফিতরাত ছিলেন। তাঁর কাছে কোন দাওয়াত পৌঁছেনি। এ বিষয়টি হযরত হাফিয শামসুদ্দীন ইবনে নাসির দিমাশকী (র.) তাঁর কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেন ঃ

تنقل احمد نورا اعظيما÷تلألأ لا في جباه الساجدين
تنقل فيهم قرنا فقرنا÷الي ان جاء خير المرسلين

অর্থাৎ আহমদ (সা.)-এর মর্যাদা সম্পন্ন নূর স্থানান্তরিত হয়, তা সিজদাকারীদের কপালে ঝলমল করছে।
তা যুগে যুগে তাদের মাঝে স্থানান্তরিত হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের থেকেই শ্রেষ্ঠতম

রাসূলের আবির্ভাব হয়।
যে সকল হাদীস থেকে রাসূল (সা.)-এর পিতা-মাতা দুযখী হওয়ার কথা রয়েছে তা সব তাদের জীবিত হওয়ার আগের হাদীস, যা হযরত কাসতালানী, সুয়ূতী (র.) এবং অন্যরা বর্ণনা করেন- والله ورسوله اعلم

আমনা (রা.)এবং আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল

হযরত ইমাম কাসতালানী (র.)-এর মত অনুযায়ী যখন রাসূল (সা.)-এর বয়স আট বছর এক মাস দশ দিন, তখন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল হয়। এরপর রাসূল (সা.)-এর যিম্মাদারী আবূ তালিবের উপর সোপর্দ হয়। আবদুল মুত্তালিব তাঁকে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন, কারণ আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহর সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল আবদে মুনাফ। কিন্তু আল্লামা ইবনে খলদুন নিজের লিখিত ইতিহাসে, ইমাম হলবী (র.) انسان العيون - গ্রন্থে (যা সীরাতে হলবী নামে প্রসিদ্ধ) বলেন, আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর সময় রাসূল (সা.)-এর বয়স আট বছর ছিল। মৃত্যুকালে আবদুল মুত্তালিবের বয়স এক শ চুয়াল্লিশ বছর ছিল।

হযরত আমিনা (রা.)-এর ইন্তিকাল

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স যখন ছয় বছর, রাসূল (সা.)-এর মা তাঁকে এবং উম্মে আইমন কে সংগে নিয়ে আবদুল মুত্তালিবের মামার বাড়ী মদীনা শরীফের বনী আদী বিন নাজ্জারের নিকট দারুত তাবেয়ায় গিয়ে অবস্থান নিলেন এবং এক মাস সেখানে থাকার পর ফিরে আসলেন। ফিরে আসার কারণ এই ঃ তথায় ইহুদীদের এক দল বারবার রাসূল (সা.)-এর নিকট আসত এবং তাঁকে অবলোকন করত। উম্মে আইমন বলেন, ইহুদীরা বলত, ইনি হলেন এ উম্মতের নবী আর এটা হল তার হিজরতের স্থান। উম্মে আইমন এ কথা শ্রবণ করার পর রাসূল (সা.) এর মাকে তা বললেন এবং সত্বর তাঁরা মক্কা শরীফের পথে রওয়ানা হওয়ার অনুরোধ করলেন। আসার পথে মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফের মধ্যখানে মদীনা শরীফের একটু কাছে আবুয়া নামক স্থানে পৌঁছলে তথায় রাসূল (সা.)-এর মাতা ইন্তিকাল করেন।
ইন্তিকালের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারার দিকে চেয়ে চেয়ে হযরত আমিনা (রা.) নিম্নের কবিতার চরণগুলো আবৃত্তি করেন ঃ

بارك فيك الله من غلام÷يا ابن الذي من حومة الحمام
نجابعون الملك العلام÷فودي غداة الضرب بالسهام
بمائة من ابل سوام÷ان صح ما ابصرت في المنام
فانت مبعوث في الانام÷تبعث في الحل وفي الحرام
تبعث في التحقيق والاسلام÷دين ابيك البر ابراهام
فالله انهاك عن الاصنام÷ان لا توالها مع الاقوام

এর পর তিনি ইন্তিকাল করেন। আমিনার ওফাতের পর জিনরা নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে-

تبكي الفتاة البرة الامينة ÷ذات الجمال العفة الرزينة
زوجة عبد الله والقرينة ÷ام نبي الله ذي السكينة
صاحب المنبر بالمدينة ÷صارت لذي حضرتها رهينة

আমীনার জওয়ান ছেলে কাদছেন যার সৌন্দর্য্য অসুন্দরকে সুন্দর করে। আবদুল্লাহর স্ত্রী এবং সংগীনীর জন্য আল্লাহর নবীর মা প্রশান্তির মালিক। তিনি মদীনার মিম্বরের মালিক,

Scanned with CamScanner

তিনি যেন যামীনদার। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আম্মাজানের ইন্তিকালের পর তিনি পাঁচ দিন পর্যন্ত আবওয়া নামক জায়গায় অবস্থান করেন। এর পর উম্মে আয়মন তাঁকে নিয়ে মদীনা শরীফে চলে আসেন। উম্মে আইমন রাসূল (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহর মুক্তি দেওয়া দাসী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে খুবই স্নেহ করতেন। রাসূল (সা.)ও তাঁকে মায়ের মত জানতেন।

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু

হযরত ইবনে খলদুন হালবী এবং কাসতালানী (র.)-এর মত অনুযায়ী যখন রাসূল (সা.)-এর বয়স আট বছরে পৌছে, তখন রাসূল (সা.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব মারা যান। মৃত্যুর আগে রাসূল (সা.)-এর চাচা আবূ তালিবকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ (সা.)-এর যিম্মাদারী তোমারই নেওয়া দরকার। আবূ তালিবের আসল নাম হল আবদে মুনাফ। সেই সময় আরবে দুর্ভিক্ষ চলছিল। আবূ তালিব যখন কুরাইশদের সাথে বৃষ্টির জন্য দুআ করতে বের হলেন, সংগে রাসূল (সা.)-কেও নিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) কাবা শরীফের সাথে পিঠ মুবারক লাগিয়ে আঙুল মুবারক দিয়ে ইশারা করে দুআ করেন।

সেই সময় আকাশে এক টুকরা মেঘও ছিল না। যখন রাসূল (সা.) আঙুল দিয়ে বারবার ইশারা করতে লাগলেন, তখন এদিক সেদিক হতে মেঘের টুকরা একত্রিত হতে লাগল এবং শহরে ও গ্রামে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। এ ঘটনার দিকে ইশারা করে আবূ তালিব বলেন-

ابيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتمي عصمة للارامل

যার চেহারায় বারি বর্ষণের চিন্তায় শ্বেত বর্ণ প্রতিফলিত হয়, তিনি ইয়াতিমদের পরিচালক, বিধবার পবিত্র নিরাপত্তাস্থল।

আবূ তালিবের কাসীদাহ থেকে আশিটি কবিতার চরণ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন। অন্যান্য কিতাবে এক শত পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়।

ইবনে খালদুনের মত অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর বয়স বার বছর শেষ হয়ে যখন তের বছর আরম্ভ হয়, তখন তাঁর চাচা আবূ তালিবের সংগে তিনি বসরা যান। তথায় পাদ্রী বোহাইরা যাঁর আসল নাম জরজিস্, তিনি রাসূল (সা.)-কে দেখে তাঁর নবুওয়াতের প্রতীক সমূহ দেখে তাকে চিনে ফেললেন এবং হাত ধরে বলতে লাগলেন, هـذا سيـد المرسلين هذا سيد العلمين هذا يبعثه الله رحمة للعلمين

তিনি রাসূলগণের সায়্যিদ, সকল সৃষ্টিজগতের সায়্যিদ, তাঁকে আল্লাহ তায়ালা রাহমাতুল্লীল আলামীন বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কীভাবে আপনি তাঁকে চিনতে পেরেছেন? তিনি জওয়াব দিলেন, তুমি তাঁকে নিয়ে আকাবার দিকে থেকে আসছিলে। এমন কোন গাছ আর পাথর নেই যে তাঁকে সিজদা করেনি। এ কথা অতীব স্পষ্ট যে, নবী ছাড়া অন্য কাউকে পাথর বা গাছ সিজদা করে না। আর আমি মোহরে নবুওয়াত-এর মাধ্যমে চিনতে পেরেছি, যা তাঁর দু'পাঁজরের মধ্যে বিদ্যমান। এ সব চিহ্ন আমি আমার কিতাবে পেয়েছি। ঐ পাদ্রী আবূ তালিবকে বলেছিলেন, যেন তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কেননা ইহুদীগণ রাসূল (সা.)-এর শত্রু। তাই তাদের থেকে কোন অঘটন ঘটতে পারে। এ সফর সম্পর্কে অনেক রিওয়ায়াতকারী রিওয়ায়াত করেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত বিলালকে সংগে নিয়েছিলেন। এ জন্য কিছু কিছু মুহাদ্দিসীন এ হাদীসকে موضوع বলে থাকেন। হযরত ইবনে হাজর اصـــابة নামক কিতাবে লেখেন, এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী

নির্ভরযোগ্য। হযরত ইমাম বুখারী (র.) হাদীস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যে হযরত বেলাল (রা.)-কে রাসূল (সা.) এর সঙ্গে দিয়েছেন, তা অস্বীকার করেন। সুতরাং হতে পারে এ অংশটি কারো দ্বারা সংযোজিত হয়েছে। কেননা বাইহাকীর রিওয়ায়তে আছে যে, বুহাইরা গীর্জার ভিতর থেকে দেখছিলেন রাসূল (সা.) কাফেলার ভিতর আছেন এবং রাসূল (সা.)-এর মাথার উপর মেঘ সাথে সাথে চলছে। অবশেষে রাসূল (সা.) গীর্জার নিকট একটি গাছের নীচে অবতরণ কররেন সাথে সাথে ছায়াও গাছের উপর এসে অবস্থান নিল।

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আঠার বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর সংগে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তখন রাসূল (সা.)-এর বয়স ছিল বিশ বছর। রাসূল (সা.) একটা কুল বৃক্ষের নীচে গিয়ে তশরীফ রাখলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা.) পাদ্রীর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেন, তখন পাদ্রী জিজ্ঞেস করলেন, এ বৃক্ষের নীচে কে? হযরত আবূ বকর (রা.) জওয়াব দিলেন, ইনি হচ্ছেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব। তখন পাদ্রী বললেন, খোদার কসম, তিনি নবী। কেননা এ বৃক্ষের নীচে হযরত ঈসা (আ.) এর পরে মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কেউ বসতে পারেন না। এ কথা থেকে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বিশ্বাস হয়ে গেল এবং তিনি রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতের উপর ঈমান আনলেন। হাফিয আবুল ফযল ইবনে হাজর (র.) اصـــابة নামক কিতাবে লেখেন, যদি এ হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হয়, তা হলে এ সফর আবূ তালিবের সফর ছাড়া অন্য সফর হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হরবুল ফুজ্জারে অংশ গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সে চাচাদের সাথে হরবুল ফুজ্জারে অংশ গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) বলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হল। তাই আমি কোষা হতে তীর বের করে তা তাদেরকে দিতাম। এটা চতুর্থ যুদ্ধের কথা। কেননা প্রথম যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.)-এর বয়স দশ বছর ছিল।

الوفاء কিতাবের লেখক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) فجار البراض অর্থাৎ ৪র্থ যুদ্ধ করেননি। তীরও নিপেক্ষপ করেননি। বরং নিজের চাচাদের প্রতি যেসব তীর আসত, তা প্রতিরোধ করতেন মাত্র। কিছু তীর নিক্ষেপ করেছেন, যেহেতু আবূ তালিব ফুজ্জার যুদ্ধে হাজির ছিলেন। এ যুদ্ধ চার দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। সে সময় রাসূল (সা.) উপস্থিত ছিলেন। এ যুদ্ধগুলোকে হরবুল ফুজ্জার বলা হয়। কারণ যুদ্ধগুলো হারাম মাসে (সম্মানিত মাস সমূহ যেগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল) সংঘটিত হয়েছিল।

প্রথম যুদ্ধের কারণ

প্রথম যুদ্ধের কারণ ছিল উকাজের বাজারে বদর বিন মা'শর-এর এক মজলিস ছিল। যেখানে সে বসে গর্ব করত, সে গিফার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। একদিন সে গর্ব করে বলে উঠে, আমিই আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। অন্য কেউ যদি নিজেকে আমার চেয়ে সম্মানিত মনে কর, তা হলে দেখি তলোয়ার নিয়ে এস এবং পায়ের উপর আঘাত কর। এ কথা শুনে এক লোক এসে তার পায়ের উপর আঘাত করল। আঘাতের কারনে সে আহত হয়ে যায়। এ থেকেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল।

দ্বিতীয় যুদ্ধের কারণ

দ্বিতীয় বার হরবুল ফুজ্জার হওয়ার কারণ ছিল যে বনু আমিরের এক মহিলা উকাজের বাজারে বসেছিল। তখন কুরাইশের কেনানা গোত্রের এক যুবক তার

Scanned with CamScanner

আশে-পাশে ঘুরঘুর করছিল এবং ঐ মহিলার সাথে কথা বলতে চেয়েছিল। মহিলা তাতে অসম্মতি জানাল। যুবক লোকটি গোপনে ঐ মহিলার পিছনে বসে কাঁটা দিয়ে কাপড়ে গিরা লাগিয়ে দিল। যখন ঐ মহিলা দাঁড়াল তখন কাঁটার সাথে কাপড় আটকে গেল এবং তার সতর খুলে গেল। লোকজন তা দেখে হাসতে লাগল। মহিলা তার গোত্রকে আহবান করল। তারা সাথে সাথে তার আহবানে সাড়া দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দৌড়ে এল। অপর দিকে যুবকও তার সম্প্রদায়কে আহবান করল। এভাবে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, আইয়ামে জাহিলিয়াতেও মহিলাদের বেপর্দা থাকা অসম্মানজনক বিবেচিত হত।

তৃতীয় যুদ্ধের কারণ

বনু আমিরের একজন লোকের বনি কানানার এক লোকের নিকট কিছু পাওনা ছিল। শক্ত ভাষায় উক্ত পাওনার তাগাদা দেয়ার ফলে রাগারাগির সৃষ্টি হয় এবং উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ বিন জাদআন নিজের সম্পদ থেকে তা আদায় করে দিয়েছিলেন। এ কারনে সে যুদ্ধে বিরতি ঘটেছিল।

চতুর্থ যুদ্ধের কারণ

হযরত ইমাম হালবী (র.) الوفاء নামক কিতাব হতে বর্ণনা করেন যে, ফুজ্জারের চতুর্থ যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাসূল (সা.) শরীক হয়েছিলেন, ঐ যুদ্ধকে فجار البراض ও বলা হয়। এ যুদ্ধ হারাম মাসে সংঘটিত হয়নি। তবে যে কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তার সূত্রপাত হয়েছিল হারাম মাসে। আর সে কারণটি হল বারাদ গোত্রের উরওয়াতুর রেহাল নামক এক ব্যক্তির হত্যাকান্ড।

আর কেউ কেউ এ যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বলেন, উরওয়াতে রেহাল হাওয়াজিন গোত্রের লোক ছিল। সে 'লতিমা'কে প্রতিবেশী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। জাররার অধিপতি نعمان بن المنزر এর লোক ছিল। সে আতর এবং কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিল। উকাজের বাজারে মাল বিক্রয় করার জন্য পাঠিয়েছিল, যেন তার আতর ও কাপড় বিক্রয়ের টাকা দিয়ে তায়েফ থেকে তরিতরকারী খরিদ করে নিতে পারে। এর আগে লতীমাকে আশরাফের আশ্রয়ে পাঠিয়েছিল। অর্থাৎ আরবের কোন এক সম্ভ্রান্ত লোকের আশ্রয়ে পাঠিয়েছিল। যখন লতিমা মাল নিয়ে এল তখন তার সামনে একদল আরবী লোক ছিল। এদের মধ্যে বনি কানানার 'বারাদ' এবং হাওয়াজিন গোত্রের 'উরওয়াতুর রেহাল'ও ছিল। বারাদ বলল, আমি এ লোককে বনি কানানার প্রতিবেশী হিসেবে নিচ্ছি। সে সময় নোমান বলল, আমি তার প্রতিবেশী হিসেবে এমন একজন লোক চাই যে তাকে নজদ এবং তাহামার প্রতিবেশী হিসেবে নিতে পারবে। তখন রেহাল আরও বলল, তোমার কারণেই আমি তাকে প্রতিবেশী হিসেবে নেব? বারাদ বলল তুমি কি বনি কেনানাকে ডিঙ্গিয়ে তাকে প্রতিবেশী হিসেবে নিয়ে নিলে? উরওয়া বলল, হ্যাঁ! বরং সম্মান ও সাহসের ভিত্তিতেই তাকে নিতে চাচ্ছি। এতে বারাদ দুঃখ পেল। তারপর উরওয়া ভ্রমণে বের হল। বারাদও তাকে গাফিল অবস্থায় পাওয়ার লক্ষ্যে তার পিছু নিল এবং যখন একটু গাফিল অবস্থায় পেল, তখন তাকে হত্যা করে ফেলল।

ঘটনা হল, উরওয়াতুর রেহাল মদ্যপ অবস্থায় নর্তকীদের গান শুনতে শুনতে অবচেতন অবস্থায় শুয়ে পড়েছিল। তখন বারাদ এসে তাকে জাগালে রেহাল তাকে অনুরোধ করল,

তোমাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আমাকে হত্যা করনা। আমার পক্ষ থেকে একটি ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বারাদ তার কোন অজুহাত কানে না তুলে তাকে হত্যা করে ফেলল। এ ঘটনাটি হারাম মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

কেনানার কাছে এক লোক গোপনে সংবাদটি পৌছে দেয়। সে উকাজে হাওয়াজিন গোত্রের সাথে ছিল। এ সংবাদ শুনে বনি কেনানা তাড়াতাড়ি সটকে পড়ে। তখনও হাওয়াজিন গোত্রের কাছে সংবাদটি পৌছেনি। যখন হাওয়াজিন গোত্র সংবাদটি পায় তখনই তারা কেনানা গোত্রের পিছু নেয় এবং হরমে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদেরকে ঘিরে ফেলে। করাইশরা বনি কেনানা সাহায্য করে। এ যুদ্ধ চার দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অবশ্য সুহাইল (র.) যুদ্ধ ছয় দিন স্থায়ী ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। যুদ্ধের দিনগুলোতে কখনও কখনও রাসূল (সা.) হাযির হতেন। যখন রাসূল (সা.) যুদ্ধে হাযির হতেন তখনই বনি কেনানা বিজয় লাভ করত। আর যখন রাসূল (সা.) উপস্থিত থাকতেন না, তখন তারা হারতে বসত।

অতঃপর উভয় দল আগামী বছরে মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি নিল। আবদুল্লাহ বিন জাদআ'ন কোন কোন বর্ণনা মতে আবূ সুফিয়ান (রা.)- এর পিতা হরব বিন উমাইয়া কুরাইশ ও কেনানা গোত্রের নেতা ছিলেন। তার এতিম ভাতিজা উতবা বিন রবীআ বিন আবদে শামস্ তার তত্ত্বাবধানে ছিল। হরব তাকে সাথে যেতে দেননি। কিন্তু উতবা তার অনুমতি না নিয়েই বের হয়ে পড়লেন। যখন দু'দল মুখোমুখী হল, তখন দুই কাতারের মধ্যখানে এক উটের ওপর আরোহণ করে বললেন, হে মুদর সম্প্রদায়! তোমরা কিসের জন্য ধ্বংস হতে যাচ্ছ? আওয়াজ শুনে হাওয়াজিনরা বলল, তুমি কিসের কথা বলছ? উতবা বললেন, আমি তোমাদেরকে সন্ধির দিকে আহবান করছি এই শর্তে যে, আমরা তোমাদের নিহতদের দিয়াত আদায় করব এবং আমাদের নিহতদের দিয়াত তোমাদের জন্য মওকুফ করে দেব। যেহেতু কেনানা ও কুরাইশ হাওয়াযিন গোত্রের অনেক লোককে হত্যা করেছিল- যদিও কোন কোন সময় তাদেরকে পলায়ন করতে হয়েছিল- হাওয়াযিনরা বলল, এটা কেমনে হবে? উতবা বললেন, আমরা দিয়াতের টাকা আদায়ের পূর্বে তোমাদের কাছে কিছু বন্ধক রাখব। হাওয়াযিন বলল, এর যিম্মাদার কে হবে? উতবা বললেন, আমি উতবা বিন রবীআ বিন আবদে শামস। সুতরাং হাওয়াজিন গোত্র রাযী হয়ে গেল। এমনকি কেনানা ও কুরাইশও তাতে রাযী হয়ে গেল। বন্ধক হিসেবে তাদের ৪০ জন লোক হাওয়াযিন সম্প্রদায়ের কাছে দিয়ে দিল, এদের মধ্যে হযরত হাকিম বিন হিযাম এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের ভ্রাতুষ্পুত্রও ছিলেন। হাওয়াযিনরা তাদের হাতে বন্ধক রাখল, যখন তাদের দিয়াত মওকুফ করে দেয়া হল, তখন তারা লোকদেরকে ছেড়ে দিল। এভাবেই حرب الفجار শেষ হল। উতবা কাফির অবস্থায় বদর যুদ্ধে মারা যায়। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার পিতা।

الوفاء কিতাবে হরবুল ফুজ্জার দু'বার সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথম বার তিন দফা যুদ্ধ হয়েছে। ১ম দফার কারণ বদর বিন মা'শর গিফারীর ফয়সালা, ২য় দফা ঐ মহিলা সংক্রান্ত এবং ৩য় দফা ঋণ সংক্রান্ত। এ তিন দফার যুদ্ধে মহানবী (সা.) শরীক হননি। দ্বিতীয় বার হাওয়াযিন ও কেনানা গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মহানবী (সা.) অংশ নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে দুই রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তু এক।

Scanned with CamScanner

মহানবী (সা.)-এর হিলফুল ফুযুলে অংশগ্রহণ

পরবর্তী বছরের প্রতিশ্রুত হরবুল ফুজ্জার হতে ফেরার সময় যিলকদ মাসে আবদুল্লাহ বিন জাদআন আমীরীর ঘরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা যুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিব বৈঠক আহবান করলেন। তাদের সাথে বনু হাশিম, বনু যুহরা, বনু আসাদ বিন আবদুল উজ্জা, বনু তামীমও একত্রিত হল। ঐ লোকেরা আবদুল্লাহ বিন জাদআনের জীবিতাবস্থায় একই ঘরের লোকের ন্যায় ছিলেন। তিনি তাদের খাবার দিতেন। প্রতিদিন তাঁর ঘরে উট জবেহ করা হত, তিনি সকলকে আহবান করতেন-

من اراد الشحم واللحم فعليه بدار جدعان

অর্থাৎ যে চর্বি ও গোশত চায়, সে যেন জাদআনের বাড়ীতে যায়। তার বাড়ীতে ফালুযাজ পাকানো হত এবং কুরাইশদেরকে তা খাওয়ানো হত। ফালুযাজ খাওয়ানোর কারণ ছিল এই যে, ইবনে জাদআন প্রথমে খেজুর ও ছাতু খাওয়াতেন এবং দুধ পান করাতেন। ঘটনাক্রমে উমাইয়া বিনতে আবূ সলত আবদুল মাদান গোত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, সে এসব খাবার দেখল, এতে ছিল হালুয়া রুটি ও মধু। উমাইয়া বলল-

ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم ÷ فرأيت اكرمهم بني المدان
البر يلبك بالشهاب طعامهم÷لا ما يعللنا بنو جدعان

"আমি কর্তা ও তাদের কর্ম দেখলাম, আমি তাদের মধ্যে বনু মদানকে সবচেয়ে সম্মানী পেলাম। তাদের খাবারে দুধের সাথে রুটি মিশ্রিত থাকে, যা বনু জাদআন আমাদেরকে পান করায়নি।" এ কবিতার সংবাদ যখন আবদুল্লাহ বিন জাদআন অবগত হল, তখন সে সিরিয়ার বসরায় লোক পাঠিয়ে দিল সেখান হতে মধু ও ঘি নিয়ে আসার জন্য। এ সময় সে ঘোষণা করে দিল, তোমরা সবাই আবদুল্লাহ বিন জাদআনের বাড়িতে খাবার খেতে আস। ইবনে জাদআনের বদান্যতার প্রশংসা করে উমাইয়া বিনতে আবূ সলত নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করে-

اذكر حاجتي ام قد كفاني ÷ حياءك ان سمتك الحياء
ان الثني عليك المرء يوما÷ كفاه من تعرضك الثناء
كريم لا يغيره الصباح÷ عن الخلق الجميل ولا المساء
يباري الريح مكرمة وجودا÷ اذا انما الغنى احجره الثناء

আমি তোমাকে حيـــــاء নাম দিয়ে থাকব তা থেকে আমার প্রয়োজনের উল্লেখ নাকি তোমার حيـــاء ই আমার জন্য যথেষ্ট। যখন একদিন কোন লোক তোমার প্রশংসা করে, তখন এ প্রশংসাই তাকে তোমার পেছনে লেগে থাকা থেকে বিরত রাখে। দানশীল লোককে তার সুন্দর আচরণ হতে সকাল সন্ধ্যার কোন পরিস্থিতিই পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি বাতাসকে স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় পরিচালনা করেন যেমনিভাবে শীত ওই সাপকে তার গর্তে প্রবিষ্ট করে।

আবদুল্লাহ বিন জাদআন

আবদুল্লাহ বিন জাদআন একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক ছিলেন। তিনি জাহিলী যুগে নিজের উপর মদ নিষিদ্ধকারী লোকদের একজন ছিলেন। মদ হারাম করার কারণ ছিল নিম্নরূপ : এক রাতে তিনি মদ পান করে নেশাগ্রস্থ হয়ে চাঁদের আলো ধরতে লাগলেন। হাত দিয়ে চাঁদের আলো ধরতে গিয়ে বার বার কুঞ্চিত হতে থাকলেন। তা দেখে উপস্থিত লোকেরা হাসতে লাগলো। যখন তার সঠিক জ্ঞান ফিরে আসল, তখন লোকেরা তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। এটা শুনে তিনি শপথ করলেন যে, আর

কখনো মদ পান করবেন না। পূর্ণাঙ্গ ইসলাম-পূর্ব যুগে নিজের উপর মদ পান নিষিদ্ধকারী অন্য একজন ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.)। তিনি বলেন, আমি এমন কোন বস্তু পান করব না যা আমার বুদ্ধি লোপ করে দেয়। আর সামান্য লোক আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এবং আমি না জেনেই আমার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলব।

একদিন আবদুল্লাহ বিন জাদআন তাদের জন্য খাবার তৈরী করলেন। ঐ মজলিসে আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তাঁরা সব সময় অত্যাচারিতের পাশে থাকবেন, যতক্ষণ না তাঁরা অত্যাচারীর কাছ থেকে তাঁদের দাবী আদায় করে দেন।

হযরত আয়িশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! ইবনে জাদআন অন্যকে খাবার প্রদান করে, মেহমানদারী করে, উত্তম কাজ করে, কিয়ামতের দিন সে কি তার এ সব কাজের প্রতিদান পাবে? মহানবী (সা.) বললেন, না। কারণ সে দিন রাতের একটি সময়ও এ কথাটি বলেনি رَبِّ اغْفِرْلِي خَطِيْئَتِي يَوْمَ الدِّيْنِ অর্থাৎ সে মুসলমান হয়নি। ইবনে জাদআন এর উপনাম ছিল আবূ যুহাইর। রাসূল (সা.) বদর যুদ্ধে বন্দীদের প্রসংগে বলেছিলেন- 'যদি আবূ যুহাইর অথবা মুতইম বিন আদী বন্দীদের মুক্তি চাইত, তা হলে আমি তাদেরকে তার কারণে মুক্তি দিয়ে দিতাম।'

আবদুল্লাহ বিন জাদআন প্রথম জীবনে দরিদ্র ছিল। এ কারণে সে পাপিষ্ঠ ও মন্দ আমলকারী ছিল। সর্বদা খারাপ কাজে লিপ্ত থাকত। তার পিতাকে এসব কাজের ক্ষতি পূরণ দিতে হত। কোন কোন সময় তার সম্প্রদায়ের লোকদেরও তার ক্ষতিপূরণ দিতে হত। এ কারণে তার সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাকে ঘৃণার পাত্র মনে করত। অবশেষে তার পিতা তাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন এবং শপথ করলেন যে, তাকে কখনো আশ্রয় দেবেন না। তখন আবদুল্লাহ মৃত্যু কামনায় মক্কার কোন এক গিরিপথের উদ্দেশে বের হল। সে পাহাড়ের উপর একটি গর্ত দেখে সেখানে প্রবেশ করল। গর্তের ভেতরে ছিল একটি অজগর সাপ। তার চোখ দুটি ছিল বাতির মত আলোকিত। যখন সে নিকটবর্তী হল, তখন অজগরটি তার উপর চড়াও হল। যখন সে পেছনে সরল, অজগরটিও পিছু হটল। এভাবে কয়েক বার হল। পরে সে বুঝতে পারল, এটা কৃত্রিম সাপ। তখন আবদুল্লাহ সামনে অগ্রসর হয়ে সাপটিকে ধরে ফেলল। দেখল সাপটি স্বর্ণের তৈরী এবং তার দুটি চোখ বলতে দুটি ইয়াকুত পাথর। আবদুল্লাহ সাপটিকে ভেঙে ফেলল এবং যেঘরের দরজায় সাপটি ছিল, তথায় প্রবেশ করল। কুঠুরীতে প্রবেশ করে কতকগুলো মৃত দেহ দেখল যা বাদশাহদের মৃতদেহ ছিল। সে কক্ষে অনেক স্বর্ণ-রৌপ্য, ইয়াকুত, মুক্তা ও যবরজদের অলংকারাদি দেখতে পেল। আবদুল্লাহ তা থেকে সাধ্যমত নিল এবং পাহাড়ের ঐ গুহায় একটি চিহ্ন লাগিয়ে দিল। প্রয়োজন মত সে এখান থেকে সামান্য সামান্য নিত। ঐ মহলে সে একটি স্বর্ণের ফলক পেল, যাতে লেখা ছিল, "আমি নফিলা বিন জুরহম বিন কাহতান বিন হুদ (আল্লাহর নবী), আমি ৫০০ বছর জীবিত ছিলাম। ঐ মৃত দেহগুলো জীবিত অবস্থায় পৃথিবীর আনাচে কানাচে পরিভ্রমণ করেছে প্রতিপত্তি মর্যাদা ও রাজত্ব লাভের আশায় ; কিন্তু এটা তাদেরকে মৃত্যু হতে মুক্তি দিতে পারেনি।" অতপর আবদুল্লাহ বিন জাদআন এ সম্পদ হতে তার পিতার কাছে কিছু পাঠাল, যাতে তিনি তা তার ক্ষতি পূরণ প্রদানে ব্যয় করতে পারেন। সে সকল বংশীয় লোকদের সাথে সম্পর্ক ভাল করতে শুরু করল। এক সময় সে গোত্রের নেতা হয়ে গেল। তার এ সম্পদ হতে লোকজনকে খাওয়ানো ও কল্যাণ কাজে ব্যয় শুরু করল।

Scanned with CamScanner

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, আমি আমার চাচাদের সংগে আবদুল্লাহ বিন জাদআনের বাড়ীতে হিলফুল ফুযুলে অংশ নিলাম। فضول বলতে যা অর্থ নেয়ার সম্ভাবনা আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হল, হিল্‌ফের আহ্বায়ক গণ্যমান্য তিন জন লোকের সবার নামই ছিল ফযল ১. ফযল বিন ফুজালা ২. ফযল বিন বিদাআ' ৩. ফযল বিন হারিস।

দ্বিতীয় কারণ হল, যারাই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন, তারা সকলে তাঁদের فضول اموال অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ জনসেবার কাজে আলাদা করে রেখেছিলেন। কারো মতে উপরোক্ত লোকদের প্রতিশ্রুতি দেখে কুরাইশরা বলতে লাগল - لقد دخل هؤلاء في فضول الامر ফযল এ فضول শব্দ হতেই حلف الفضول নামকরণ করা হয়েছে। فضول এর আরেক অর্থ হল, মযলুমের হক যালিমের কাছ থেকে আদায় করে দেয়া। এরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কারণ ছিল, যুবাইদ গোত্রের এক লোক কিছু ব্যবসায়ের সম্পদ নিয়ে মক্কায় এল। তার এ মাল আস বিন ওয়াইল ক্রয় করল, কিন্তু তার মূল্য প্রতিশোধ করল না। আস বিন ওয়াইল ছিল মক্কার অভিজাত ও শক্তিশালী লোকদের অন্যতম। যুবাইদী আবদুদ্দার, মখজুম, জুমহ, সহম ও আদী বিন কাব সম্প্রদায়ের নেতাদের কাছে বিচার দায়ের করল। কিন্তু তারা আস এর বিপক্ষে তাকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল এবং যুবাইদীকে বের করে দিল। যুবাইদী অবস্থা বেগতিক দেখে আবূ কুবাইস পর্বতে আরোহন করে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করে।

يا فبر لمظلوم بضاعته÷ببطن مكة ناني الدار والفقر
ومحرم اشعث لم يقض عمرته÷يا للرجال وبين الحجر والحجر
ان الحرام لمن تمت مكارمه÷ولاحرام لثوب الفاجر الغدر

উল্লেখ্য, এ সময় কুরাইশগণ কাবা শরীফের পাশে পরামর্শসভায় বসেছিল। কবিতা শুনে যুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিব উঠলেন, সাথে আবদুল্লাহ বিন জাদআন এবং উপরোল্লিখিত লোকেরাও উঠলেন। কারো মতে আব্বাস ও আবূ সুফিয়ান উঠে দাঁড়ালেন এবং সকলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন যে, তারা অত্যাচারিতকে রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এক হাত হয়ে কাজ করবেন, যতক্ষণ না যালিমের কাছ থেকে মযলুমের হক আদায় করে দেন- চাই সে অভিজাত হোক অথবা নিম্ন শ্রেণীর লোকই হোক। অতঃপর তারা আস বিন ওয়াইলের কাছে গেলেন এবং তার কাছ থেকে যুবাইদীর সম্পদ এনে তাকে ফিরত দিলেন।

সহল বলেন, খাসআম গোত্রের এক লোক হজ্জ অথবা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় এল। তার সাথে ছিল তার এক মেয়ে। মেয়েটি ছিল اضوء نساء العالمين অর্থাৎ পৃথিবীর সুন্দরতম মহিলা। নবীয়া বিন হাজ্জাজ মেয়েটিকে জোর পূর্বক অপহরণ করে নিল। লোকেরা তাকে হিলফুল ফুযুলে বিচার দায়ের করার পরামর্শ দিল। ফলে লোকটি কাবা শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে বলল, 'হে হিলফুল ফুযুল'। আওয়াজ দিতেই আকস্মাৎ ঐ লোকেরা খোলা তরবারী নিয়ে চার দিক থেকে দৌড়ে এল এবং পরস্পর বলতে লাগল, তোমাদের কাছে ফরিয়াদ এসেছে। তোমরা কি দেখছ? তারা লোকটিকে বলল, কি তোমার ফরিয়াদ? লোকটি বলল, নবীয়া আমার মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এটা শুনে সবাই ফিরে গেল এবং নবীয়ার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। নবীয়া বের হয়ে এলে তারা বললেন, তুমি জান, আমরা কারা এবং আমরা কিসের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং সাথে সাথে মেয়েটিকে বের করে দাও। নবীয়া বলল, আমি তাকে দিয়ে দেব, তবে একটি রাতের জন্য মুতার অবকাশ দাও। তারা বললেন- না, আমরা তোমাকে একটি

উট দোহনের পরিমাণ সময়ও দিতে পারব না। এটা শুনে সে মেয়েটিকে বের করে দিল।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে শাদী মুবারক

মহানবী (সা.) ২৫ বছর বয়সে খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ বিন আসাদের দাস মাইসারাকে সাথে নিয়ে ষোলই যিলহজ্জ বসরার বাজারে তশরীফ নিলেন। তসতুরা নামক এক পাদ্রী তাঁকে দেখে বলল, এই বৃক্ষের নিচে নবী ছাড়া আর কেউ এসে থামেননি। কোন কোন বর্ণনায় 'ঈসা (আ.)-এর পরে' শব্দটি উল্লেখ আছে। আবূ সাঈদ 'শরফ' নামক গ্রন্থে লেখেন, পাদ্রী রাসূল (সা.)-এর নিকটবর্তী হলেন এবং মহানবী (সা.)-এর মাথা ও পা মুবারকে চুমু খেয়ে এবং বললেন- "আমি আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনিই সেই প্রতিশ্রুত নবী, যাঁর কথা আল্লাহ তায়ালা তওরাতে উল্লেখ করেছেন।" অতঃপর যখন তিনি খতমে নবুয়ত দেখলেন, তাতে চুমো খেলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি উম্মী নবী, যার সুসংবাদ প্রদান করেছেন হযরত ঈসা (আ.)। কারণ তিনি বলেছেন, আমার পর এ গাছের নিচে নবীয়ে উম্মী হাশিমী আরবী মক্কী ছাড়া আর কেউ অবস্থান করবেন না। যে নবী হবেন হাউজে কাওসার, শাফাআত ও লেওয়ায়ে হামদের মালিক। 'ওয়াকীদী ও ইবনুস সাকিন এর মতে, এরপর পাদ্রী বললেন', তাঁর চোখে থাকবে লাল চিহ্ন। মাইসারা বলেন, হ্যাঁ', এ রক্তিমাভা কখনো দূর হয় না। রাহিব বলেন, তিনি হবেন শেষ নবী। হায় আফসোস! যদি আমি থাকতাম যখন তাঁকে নবুওয়াত প্রদান করা হবে। মায়সারা সে কথার সত্যায়ন করেন।

হলবী বলেন, যখন মহানবী (সা.) গীর্জার নিকটবর্তী গাছের নিচে অবতরণ করলেন, তখন তসতুরা মাইসারার নিকটবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? কারণ তসতুরা মাইসারাকে চিনতেন। মাইসারা জবাব দিলেন, তিনি কুরাইশ বংশের এক লোক, হরমের অধিবাসী। তখন পাদ্রী বলতে লাগলেন, এই গাছের নিচে নবী ছাড়া কেউ অবতরণ করেননি। অর্থাৎ এ গাছের নিচে নবী ছাড়া অন্য কাউকে অবতরণ করা থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত রেখেছেন। এরপর বললেন, তাঁর চোখে কি রক্তিম চিহ্ন আছে? মাইসারা বললেন, হ্যাঁ, তা বিলীন হয় না। পাদ্রী বললেন, তিনি এবং তিনিই শেষ নবী। হায় আফসোস, আমি যদি তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত জীবিত থাকতাম! তখন মাইসাসারা তা স্বীকার করলেন। কারন রাসূল (সা.)-এর حمرة العينين কে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে তাঁর নবুওয়াতের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হলবী বলেন এবং নিশাপুরী তাঁর الشرف নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যখন পাদ্রী দেখলেন, মেঘখন্ড তাঁকে ছায়া দিচ্ছে, তখন তিনি সন্ত্রস্ত হলেন। অতপর পাদ্রী মাইসারার অগোচরে মহানবী (সা.)-এর নিকটে এলেন এবং তাঁর মাথা ও পা মুবারকে চুমু খেলেন এবং বললেন, "আমি আপনার উপর ঈমান এনেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সেই নবী, যার উল্লেখ আল্লাহ তায়ালা তাওরাতে করেছেন।" এরপর বললেন, "হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি আপনার মধ্য নবুওয়াতের সকল চিহ্ন পেয়েছি, যে চিহ্নগুলোর কথা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে উল্লেখ রয়েছে। তবে একটি চিহ্ন দেখি নাই। সুতরাং আপনার কাঁধ থেকে কাপড়টুকু সরান।" মহানবী (সা.) তা উন্মুক্ত করলেন, তখন দেখলেন, খতমে নবুওয়াত ঝলমল করছে! তা দেখে তিনি আরও নিকটবর্তী হলেন এবং তাতে চুমু খেলেন। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল ও উম্মী নবী যাঁর সুসংবাদ দিয়েছিলেন ঈসা বিন মরইয়ম (আ.)। তিনি

Scanned with CamScanner

বলেছিলেন, আমার পরে এ গাছের নিচে নবীয়ে উম্মী হাশিমী, আরবী, মক্কী ছাড়া আর কেউ অবস্থান করবেন না। যিনি হবেন হাউজ, শাফাআত ও লিওয়ায়ে হাম্‌দের মালিক। বুহায়রা ও তসতুরাকে কেউ কেউ সাহাবী বলে থাকেন, তবে তা ঠিক নয়; কারণ সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পর তাঁর প্রতি ঈমান আনা। আর নবুওয়াত লাভের পূর্বে ঈমান গ্রহণকারীগণকে আহলে ফিতরত বলে। বুহায়রা এবং তসতুরা দু'জনই নবুওয়াত লাভের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, নাসারাগণ তিন দলে বিভক্ত ছিল-১. তসতুরিয়া- তাদের দাবী ছিল যে ঈসা (আ.) আল্লাহর ছেলে। ২. ইয়াকুবিয়া - তারা বলে, ঈসা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ, যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন; পরে আবার আকাশে আরোহণ করেছেন। ৩. মুলকানিয়া-তাদের দাবী হল, ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। কেউ কেউ চতুর্থ আরেকটি দলের কথা বলেন; তারা হচ্ছে ইসরাইলিয়্যাহ। তাদের কথা হল - ঈসা হচ্ছেন ইলাহ, তাঁর মাতাও ইলাহ এবং আল্লাহও হচ্ছেন ইলাহ। قـــامـوس -এ আছে. তসতুরিয়া নাসারা হচ্ছে এমন একটি দল, যারা অন্য সকল দলের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে থাকে। তারা তসতুরুল হাকীম এর অনুসারী। সে খলীফা মামুনের রাজত্বকালে প্রকাশ লাভ করেছিল এবং নিজের ইচ্ছেমত ইনযিল কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন করেছিল। তার মতাদর্শ ছিল- ان الله واحد ذوا قانيم ثلث আল্লাহ হচ্ছেন একজন, তিনি তিন মহাদেশের অধিপতি। রোমান ভাষায় তাদেরকে তসতুরস বলা হয়।

ইহুদীরাও তিনটি দলে বিভক্ত ১. কুরআনিয়াহ ২. রব্বানিয়াহ ও ৩. সামিরিয়্যাহ। এখানে ইমাম হলবী একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। একটি গাছ ঈসা (আ.)-এর সময় থেকে মহানবী (সা.)-এর সময় পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকা যুক্তি বিরোধী। এর জবাবে বলা যায় যে, হয়ত গাছটি যয়তুন বৃক্ষ হবে। কারণ বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, যয়তুন গাছ তিন হাজার বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। মহানবী (সা.) শুকনা গাছের নিচে বসেছিলেন। তাঁর বসার পরেই গাছে পাতা ও ফল ফুটে বের হয়। এ ঘটনা দেখে তসতুরা পেরেশান হয়ে নেমে আসেন। আরেকটি প্রশ্ন আসে- এ সফরের সময় মহানবী (সা.)-এর বয়স ২৫ বছর ছিল। সুতরাং এটাকে মুজিযা বলে গণ্য করা হবে কি না? আমার ধারণা প্রশ্নকর্তা এ ঘটনাকে নবুয়াতের পূর্বের ঘটনা বুঝাতে চাচ্ছেন। যদি তার কথাই মেনে নেয়া হয়, তবুও এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কারণ ইমাম হালবী (র.) বলেন, জমহুর মুহাক্কিকীন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, নবীগণের নিকট হতে যে সকল মুজিযা প্রকাশ পাওয়া জায়িয আছে, ওলীগণের পক্ষ হতে অনুরূপ কারামত প্রকাশ পাওয়া জায়িয আছে। তবে শর্ত হল তাতে চ্যালেঞ্জ থাকবে না, পক্ষান্তরে মুজিযায় চ্যালেঞ্জ থাকবে এবং মুজিযা হবে নবুওয়াতের পর যা নবুওয়াতের পূর্বে প্রকাশিত হবে- যেমন উপরোল্লিখিত ঘটনা- তা বিশেষ ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ তিনি জন্মের পূর্ব হতেই নবী ছিলেন। যেমন- তিনি বলেন, আদম যখন মাটি আর পানিতে ছিলেন, তখনও আমি নবী ছিলাম।

মাওয়াহিব গ্রন্থকার বলেন, মহানবী (সা.) দ্বি-প্রহরের সময় মক্কা শরীফ এসে পৌছেন। এ সময় খাদিজা তাঁর দালানের উপর বসেছিলেন। তিনি দেখলেন, মহানবী (সা.) বাহনের উপর সওয়ার হয়ে আসছেন আর দুজন ফেরেশতা তাঁরা মাথায় ছায়া প্রদান করছেন। মাইসারা বলেন, তিনি যাওয়ার সময়ও তারা ছায়া দিচ্ছিলেন। কোন কোন মুহাদ্দিসীনের মতে, ফেরেশতা মেঘের আকৃতিতে তাঁকে ঢেকে রেখেছিলেন। মাইসারা যখন এ সফরের অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং তিনি যখন ব্যবসায় মুনাফার আধিক্য

দেখলেন, তখন তিনি মহানবী (সা.)-কে নির্ধারিত অংশের চেয়ে অনেক বেশী দিয়ে দিলেন। এটা ছিল খাদিজার মাল নিয়ে মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় সফর। ইমাম কাসতালানী (র.)-এর বর্ণনা মতে এর দু'মাস পঁচিশ দিন পর মহাবনী (সা.)- এর সাথে হযরত খাদিজা (রা.)- এর নিকাহ সংঘটিত হয়। আল্লামা ইবনে খলদুনের মতেও এ সময় মহানবী (সা.)-এর বয়স ছিল ২৫ বছর। হযরত খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল তখন ৪০ বছর। তিনি তাহেরা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে কুরাইশদের নেত্রীও বলা হত। ইতিপূর্বে তাঁর বিবাহ হয়েছিল আবূ আলা বিন যুরারা তমীমীর সাথে। সে ঘরে তাঁর দুই সন্তান জন্ম লাভ করেন- হিন্দ ও আলা। হুফ্‌ফাজ -এর বর্ণনা মতে তাঁরা দু'জনই সাহাবী ছিলেন। এরপর তাঁর বিয়ে হয়েছিল আতিক বিন আবিদ-এর সাথে। তাঁর ঘরে এক মেয়ে জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁর নামও ছিল 'হিন্দ', তিনিও মুসলমান হয়েছিলেন। মহানবী (সা.) যখন শাদীর ইচ্ছে পোষণ করলেন, তখন কারো মতে হযরত হামযা (রা.), আবার আরেক মতে আবূ তালিব বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। কিন্তু ইবনে খলদুন, ইমাম হলবী ও কাসতালানী (র.)-এর দৃঢ় মত হল, আবূ তালিবই বিবাহের খুতবা পড়িয়েছিলেন। এ বৈঠকে কুরাইশদের প্রবীণ লোকেরা এবং মুদর গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা ইবনে খলদুন খুতবার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ উল্লেখ করেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর, ইসমাইল (আ.)-এর পর পুরুষ, সাদ গোত্রের অংশ ও মুদর এর উপগোত্র করেছেন। তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন সংরক্ষিত ঘর, নিরাপদ হরম। তিনি আমাদেরকে তাঁর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক করেছেন এবং তাঁর হরমের শৃংখলা রক্ষাকারী করেছেন। তিনি আমাদেরকে মানুষের মধ্যে ফয়সালাকারী করেছেন। আমার ভাই-এর ছেলে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ- তোমরা অবশ্যই তাঁর নৈকট্যের কথা জান। তাঁকে কেবল বাতাসের সাথেই তুলনা দেয়া চলে। তাঁর সম্পদে যদি স্বল্পতা থাকে, তবে জেনে রাখ, সম্পদ হচ্ছে ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। তিনি খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন এবং আমার সম্পদ হতে এই এই নগদ ও বাকী সম্পদ তাকে মোহর স্বরূপ প্রদান করেছেন। আল্লাহর কসম, পরবর্তীতে তার জন্য রয়েছে মহান সংবাদ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আভিজাত্য। আবূ তালিবের খুতবা প্রদান শেষে ওরাকা বিন নওফল নিম্নোক্ত খুতবা পাঠ করলেন-

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে দিয়েছেন, যা আপনি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন এবং আমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন, যেমনিভাবে আপনি বললেন, আমরা হচ্ছি আরবের নেতা ও পরিচালক। আপনারাও এ সবের অধিকারী। কোন আরবই আপনাদের মর্যাদা অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনাদের গৌরব ও অভিজাত্যকে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। আমাদের আগ্রহও হচ্ছে আপনাদের আভিজাত্যের সাথে একাত্ম হওয়া। সুতরাং আমি কুরাইশ সম্প্রদায়ের সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেছি যে, আমি খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদকে মুহাম্মদের সাথে বিবাহ দিলাম। এই বলে তিনি মোহরও উল্লেখ করলেন।

ইমাম হলবী ওরাকা বিন নওফলের খুতবা উল্লেখ করে বলেন, মহানবী (সা.) সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করার পর দু'মাস বা পনের দিন পর খাদিজার সাথে তার শাদী মুবারক সংঘটিত হয়।

ইমাম কাসতালানী (র.) বলেন, মহানবী (সা.)- এর এ বিবাহে মোহর ছিল ১২

Scanned with CamScanner

আউকিয়া রৌপ্য এবং অর্ধ আউকিয়া স্বর্ণ। এক আউকিয়া ৪০ দিরহাম হয়। অতএব, সর্বমোট মোহর ছিল ৫০০ দিরহাম।

কুরাইশ কর্তৃক কা'বা শরীফ নির্মাণ

আল্লামা শামীর মতানুসারে মহানবী (সা.)-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, আল্লামা কাসতালানী ইমাম হলবী ও ইবনে খলদুন একই মত পোষণ করে থাকেন - তখন কুরাইশরা কা'বা শরীফ ধ্বসে পড়ার আশংকা করেন। কারণ ইতিপূর্বে এর গিলাফ পুড়ে গিয়েছিল এবং তার উপর দিয়ে বন্যা প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা শরীফের গিলাফ পুড়ে যাওয়ার কারণস্বরূপ লিখেন - এক মহিলা আগুন জ্বালিয়েছিল। এর কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ এসে কাবা শরীফের গিলাফে পড়ে গিলাফ জ্বলে গিয়েছিল। এ স্থানে দেয়াল দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং বন্যার বিষয়টি সুপরিচিত।

কাবা শরীফ পুনঃ নির্মাণকারী এক লোক ছিলেন রোমের অধিবাসী, অন্যজন কিবতী ছিল। দু'জনের নামই ছিল 'বাকুম'। তাদের মধ্যে কিবতী লোকটি হযরত সাঈদ বিন আস এর গোলাম ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে মসজিদে নববী ও হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর মিম্বর তৈরী করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি রোম থেকে জাহাজ ভর্তি কাঠ নিয়ে এসেছিলেন। প্রতিকূল বাতাস জাহাজটিকে জিদ্দায় নিয়ে এসে ভেঙে দেয়। কুরাইশরা জিদ্দা থেকে কাঠ সংগ্রহ করার সময় লোকটিকেও সাথে নিয়ে যায়। কাবা শরীফ ভেঙে দিতে সকলেই ভয় পেল। শেষে ওয়ালিদ বিন মুগীরা সাহস করে ভাঙার জন্য অগ্রসর হল। এমনি একটি সাপ তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। এ সাপের একটি ঘটনা আছে - কাবা শরীফের ভিতর দরজার ডান দিকে একটি কূপ খনন করা হয়েছিল। কাবা শরীফের জন্য যে সকল মূল্যবান বস্তু হাদিয়া স্বরূপ আসত, তা এখানে ঢেলে দেয়া হত। দুবার এখান থেকে তা চুরি হয়ে গেল। এরপর চোর মারা গেল। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য একটি সাপ পাঠিয়ে দিলেন। এ সাপ সব সময় পাহারা দিত। যখন কাবা শরীফ ভাঙতে যাওয়ায় সাপ আক্রমণ করল, তখন কুরাইশরা মাকামে ইবরাহীমে একত্রিত হল। সে বৈঠকে আবূ ওহব বিন উমর বিন আমির বিন ইমরান বিন মখজুম বললেন, সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, এ ঘরে কোন ছিনতাইকৃত মাল, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকৃত মাল এবং কোন অবৈধ মাল খরচ করা হবে না। সবাই অনুরূপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল। তখন ওলীদ বিন মুগীরা বলতে লাগলেন, তোমরা কি এ ঘরটির সংস্কার চাচ্ছ? সকলেই জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সংশোধনকারীকে ধ্বংস করেন না। আরও বললেন, তোমরা আল্লাহর ঘরে পবিত্র মাল ছাড়া অন্য মাল লাগাবে না। অপবিত্র মাল লাগানো থেকে বিরত থাকবে। কারণ আল্লাহ পবিত্র, তিনি কেবল পবিত্রতাই গ্রহণ করেন। এরপর সকলে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! যদি কাবা শরীফ ভেঙে ফেলার মধ্যে সন্তুষ্টি নিহিত থাকে, তা হলে তা পূর্ণ হতে দিন এবং এ সাপটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিন। দু'আ শেষ হওয়ার পূর্বেই আকাশ থেকে কাকের মত একটি পাখি আসল। এর পিঠ ছিল কাল, পেট সাদা বর্ণের এবং ডানাগুলো ছিল ধূসর বর্ণের। পাখিটি যখন এল, তখন সাপ কাবা শরীফের দেয়ালে ছিল। পাখিটি ঠোঁট দিয়ে সাপটিকে উঠিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে মারল তৎক্ষণাৎ মাটি তা গ্রাস করে নিল। এরপর তারা কা'বা শরীফ ভাঙ্গতে শুরু করল। যখন ইবরাহীমী ভিত্তি পর্যন্ত পৌঁছল, তখন সেখানে উটের মত বড় একটি পাথর বের হল। তাতে আঘাত করা হলে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হতে লাগল। তারা বুঝে নিলেন, এতটুকুই ভাঙার অনুমতি রয়েছে। এজন্য বাকী অংশ আর ভাঙা হল না।

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সময়ে কা'বা শরীফ ৯ হাত উঁচু ছিল। কুরাইশরা পুনঃনির্মাণের সময় উচ্চতা আরও ৯ হাত বাড়িয়ে দেয়। জানালা দরজাগুলোকে উঁচু করে দেয়, যাতে সিঁড়ি ছাড়া কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারে না। কা'বা শরীফের দৈর্ঘ্য ছিল ২৭ হাত। কুরাইশরা ১৮ হাত মূল ঘরে প্রবিষ্ট করে। বাকী অংশ 'হাতিম' নাম দিয়ে নিচু দেয়ালে আবৃত করে রেখে দেয়, যাতে করে বুঝা যায়, তা-ও কা'বা শরীফের অংশ। হাতিমকে কা'বার বাইরে রাখার কারণ বর্ণনা করা হয় এভাবে যে, কুরাইশদের অর্থসংকট দেখা দিয়েছিল। ইসমাঈল (আ.)-এর সময়ে কা'বা শরীফের ছাদ ছিল না। কুরাইশরা এর ছাদ দিয়ে দেন।

কাবা শরীফ তৈরীর কাজে যখন সকলে পাথর সংগ্রহে লাগলেন, তখন মহানবী (সা.) ও তাঁদের সাথে পাথর সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। সব লোকেরা পাথর উঠানোর সময় তাদের লুঙ্গি কাঁধের উপর রাখত। কিন্তু রাসূল (সা.) অনুরূপ করতেন না। একবার মহানবী (সা.) অন্যান্য সকলের অনুসরণ করে তাঁর লুঙ্গি কাঁধের উপর রেখে পাথর উঠাতে চাইলেন, অমনি তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এ সময় একটি আওয়াজ আসল, يـا محـمـد غـط عـورتك (হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার সতর ঢেকে রাখবেন।) আল্লামা কাসতালানী (র.) বলেন, এটা ছিল তাঁর প্রথম অদৃশ্য আহবান। এ সময়ও তাঁর পূর্ণ সতর উন্মুক্ত হয়নি। বরং যুরকানী (র.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সতরে আওরত কোন দিন উন্মুক্ত হয়নি। এরপর আবূ তালিব ও হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, 'ভাতিজা! লুঙ্গি কাঁধের উপর রাখ।' তিনি জবাব দিলেন, "আমার উপর যে বিপদ এসেছিল, তা এ সামান্য সতর উন্মুক্ত হওয়ার কারণেই এসেছিল।"

انسان العيون গ্রন্থের বর্ণনা হতে ফেরেশতাগণ যে কা'বা শরীফের প্রথম নির্মাতা ছিলেন, তা প্রমাণিত হয় না। বরং প্রতীয়মান হয় যে, আদম (আ.)-ই ছিলেন প্রথম নির্মাতা। অধিকন্তু ইমাম হলবী (র.) বলেন, আদম (আ.) কর্তৃক কাবা শরীফ নির্মাণের পূর্বে সেখানে লাল রঙের ইয়াকুতের তৈরী একটি তাঁবু ছিল। এটা জান্নাত হতে আদম (আ.) এর জন্য অবতীর্ণ হয়। এর পূর্ব দিকের দুটি দরজা ছিল সবুজ যমরুদের তৈরী এবং পশ্চিম দিকের একটি দরজা ছিল স্বর্ণের তৈরী আর তা ছিল বেহেশতের মুক্তা খচিত। হযরত আদম (আ.) তা তওয়াফ করতেন এবং এর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হতে পায়ে হেঁটে ৪০ বার হজ্জ করেছিলেন।

হতে পারে ঐ তাঁবু ছিল বায়তুল মামুর, যা তার লাল রং হতে বুঝা যায়। কারণ বায়তুল মামুরের ছাদ লাল রংঙের ইয়াকুত পাথরে তৈরী। হযরত মুজাহিদ (র.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আদম (আ.) ভারতবর্ষে অবতরণ করেছিলেন। সেখান থেকে এত বার হজ্জ করতে কিভাবে গেলেন? তিনি জবাবে বললেন, তাঁর কোন বাহন ছিল না; কিন্তু তিনি এক একটি পদক্ষেপে তিন দিনের পথ অতিক্রম করতেন। আর তাঁর পা ছিল ৬০ গজ লম্বা। হযরত আদম (আ.) এর কাছে হজরে আসওয়াদ পাঠিয়ে দেয়া হয়। এটা প্রথমে সাদা রংয়ের চক চক করা মুক্তা ছিল, যা দেখে হযরত আদম (আ.) কিছুটা প্রশান্তি লাভ করতেন। কারো মতে হজরে আসওয়াদ আদম (আ.) বেহেশত হতে সাথেই নিয়ে এসেছিলেন। দুই অবস্থাই হাদীস দ্বারা সাবিত আছে এবং সর্বাবস্থায়ই হজরে আসওয়াদ হল বেহেশতের। যদি আল্লাহ তায়ালা এর জ্যোতি নিষ্প্রভ করে না দিতেন, তা হলে কেউ ইহার প্রতি তাকাতে পারত না।

ইমাম হালবী (র.) দু'টি বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য দিয়ে থাকেন- হজরে আসওয়াদ আদম (আ.)-এর সময়েই এসেছে। সময়ের পার্থক্য কম হওয়ায় একই সময় বলে

Scanned with CamScanner

উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, কিয়ামতের দিন হজরে আসওয়াদ আসবে। তখন তার হাত, জিহবা, কান ও চোখ থাকবে। تاريخ مكة গ্রন্থে আছে- আদম (আ.) পায়ে হেঁটে ৭০ বার হজ্জ করেছেন। আদম (আ.) এর পর হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কার তুফানে কাবা শরীফ ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, বন্যার কারণে কাবা শরীফের স্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ কারণে যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবা শরীফ পুনঃ নির্মাণ করতে চাইলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করে কাবা শরীফের ভিত্তি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যেমনিভাবে বর্ণিত আছে- জিবরাঈল (আ.) পৃথিবীতে এলেন, তাঁর ডানা দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন এবং যমীনের উপর কাবা শরীফের ভিত্তি প্রকাশ করে দিলেন। ঐ ভিত্তিকে কেন্দ্র করেই ইবরাহীম (আ.) কাবা শরীফ নির্মাণ করলেন। হাদীস শরীফে আছে, মাকাম রুকন ও যমযমের মধ্যখানে ৯৯ জন নবীর কবর রয়েছে। অন্য হাদীসে আছে কাবা শরীফের আশেপাশে ৩০০ জন নবীর কবর রয়েছে। রুকনে ইয়ামনী ও রুকনে আসওয়াদের মধ্যখানে ৭০ জন নবীর কবর রয়েছে। যে সকল নবীকে তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁরা তাদের কাছ থেকে বের হয়ে এসে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তাঁরা ইন্তিকাল করেন।

কৃষ্ণাঙ্গদের ভিত্তি

ইমাম হলবী (র.) লিখেন- যখন নূহ (আ.) এর জাহাজ কাবা শরীফ প্রদক্ষিণ করছিল, তখন তিনি জাহাজের যাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, এখন তোমরা আল্লাহর হরমে আছ এবং তাঁর ঘরের চারপাশে অবস্থান করছ। এখানে কেউ নারী স্পর্শ করতে পারবে না। এই বলে তিনি নারী পুরুষের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে দিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর পুত্র হাম তাঁর কথা অমান্য করলেন এবং তাঁর স্ত্রীর সাথে মুজামায়াত করলেন। হযরত নূহ (আ.) তার জন্য বদ দুআ করলেন, যেন তার সন্তানদেরকে আল্লাহ তায়ালা কালো বর্ণের করে দেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুআ কবুল করলেন। হাম এর সন্তানরা কালো বর্ণের হয়ে গেল। আর একারনে তাকে বলা হয় ابو السودان

হাম পরবর্তীতে ابو السودان হওয়ার বিস্তারিত প্রমাণ اعلام الطراز المنقوش في فضائل الحبوش গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কোন কোন বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, কাবা শরীফের নির্ধারিত স্থান মেঘখন্ড, প্রশান্তি ও সুরাদ নামক পাখি দ্বারা পরিচয় করা হয়েছিল। সুতরাং এ সকল বর্ণনা এবং জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক নির্ধারণের বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে করা যেতে পারে যে প্রথমে জিবরাঈল (আ.) কাবা শরীফের ভিত্তি বের করতে মেঘখন্ড, সকীনা ও সুরাদকে চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুরাদ একটি পাখির নাম, যার উল্লেখ তুলাইহা কাযযাবের লেখায় আছে। তুলাইহা কাযযাব মহানবী (সা.) এর যামানায় নবুওয়াতের দাবী করেছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাকে হত্যা করেন। তার হত্যার পর তার সাথে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদেরকে বলা হল, তার কাছে কী ওহী আসত? তখন ঐ লোকেরা বলল, তার কাছে ওহী আসত-

والحمام واليمام والصرد والصوام-يبلغن ملكنا العراق والشام

কবুতরের শপথ, ঘুঘুর শপথ, সুরাদের শপথ ও সওয়ামের শপথ। আমাদের রাজত্ব ইরাক ও সিরিয়া পর্যন্ত পৌছবে।

ইমাম হলবী (র.) লিখেন, আল্লাহ তায়ালা যেমন প্রাণীদেরকে দিয়ে অনেক বিষয়ে সাহায্য দিয়ে থাকেন, তেমনি তাদের আওয়াজের মাধ্যমেও উপকার দিয়ে থাকেন। কাশ্শাফ গ্রন্থকার এমন কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বর্ণিত আছে যে,

হযরত সুলাইমান (আ.) সুরাদ নামক পাখির আওয়াজ শুনে বললেন, ইহা বলছে- হে গুনাহগারেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কাশশাফ গ্রন্থকার বলেন, এটা হুদহুদের আওয়াজ। হযরত সুলাইমান (আ.) ময়ূরের আওয়াজ শুনে বলেন, এটা বলছে, তুমি যেভাবে কাজ করবে, সেভাবে ফল পাবে। হুদহুদের ডাক শুনে বললেন, এটা বলছে- যে অন্যের প্রতি দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না। এ দুটি বক্তব্যের সমাধান হল ময়ুর কখনো এক রকম ডাকে; আবার কখনো অন্য রকম ডাকে। সুলাইমান (আ.) খাত্তাফের (খাত্তাফ আবাবিলের মত এক প্রকার ছোট পাখি) আওয়াজ শুনে বললেন, এটা বলছে - তোমরা কল্যাণ কর্মকে অগ্রিম পাঠিয়ে দাও, আখিরাতে তা পাবে। মোরগের ডাক শুনে বললেন- এটা বলছে, হে অন্যমনস্ক লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। বুলবুলের আওয়াজ শুনে বললেন, এটা বলছে, যখন তুমি একটি খেজুরের অর্ধেক খাবে .....। ঘুঘু পাখি চিৎকার করল। তিনি বললেন, এটা বলছে, 'হায়! যদি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করা না হত।' তিনি ঈগলকে ডাকতে শুনে বললেন, 'এটা বলছে, সুমহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তাঁর আকাশ ও যমীন পরিপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, চিল বলে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত। বিড়াল বলে, যে চুপ থাকল, সে নিরাপদ থাকল। তোতা পাখি বলে, ধ্বংস ঐ লোকের জন্য, দুনিয়া যাকে চিন্তিত রাখে। শকুন বলে, হে মানব সন্তান! যত ইচ্ছা বাঁচ, তোমার শেষ কিন্তু মৃত্যুতে। ঈগল বলে- মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে। পাখিদের মধ্যে পেঁচার মত অন্য কোন পাখি নেই, যা মানুষের সাথে এত বেশী মুহব্বত রাখে এবং উপদেশ প্রদান করে। যখন এটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে, তখন বলে, ঐ লোকেরা কোথায় যারা দুনিয়ায় নিয়ামত উপভোগ করত এবং সেখানে স্বচ্ছল অবস্থায় ছিল? বনী আদমের ধ্বংস হোক। তারা কেমন করে ঘুমায়, অথচ তাদের সামনে রয়েছে অনেক কঠিন অবস্থা! হে গাফিলগণ! তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। তোমাদের সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এটা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, পাখিদের ভাষা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর কোন জ্ঞান ছিল না। বরং সকল প্রাণীর ভাষা তাঁর জানা ছিল। যেমন হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বের হলাম। দেখলাম, একটি অন্ধ পাখি তার ঠোঁট দিয়ে একটি গাছে আঘাত করছে। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি কি জান, পাখিটি কি বলছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, পাখিটি বলছে, হে আল্লাহ! তুমি তো ন্যায়বিচারক; অথচ তুমি আমার দৃষ্টিশক্তিকে আবৃত করে দিয়েছ। এদিকে আমি ক্ষুধার্ত। এমন সময় একটি ইঁদুর সেখানে এসে প্রবেশ করল। মহানবী (সা.) বললেন- তুমি কি জান, এটা কি বলছে? আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, এটা বলছে- من توكل على الله كفاه -(যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

পানীজগত তথা সমগ্র সৃষ্টিকেই আল্লাহ তায়ালা মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন, এমনকি ফেরেশতাগণকেও। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, যারা আরশ বহন করেন এবং যারা এর চারপাশে রয়েছেন, তারা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেন, তাঁর প্রতি ঈমান রাখেন এবং ঈমানদারদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন।

উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রসিদ্ধ কথা উল্লেখ করছি। যখন সুলাইমান (আ.) বললেন- مالي لا ارى الهدهد كان من الغائبين (হুদহুদকে দেখছি না কেন? এটা কি অনুপস্থিত হয়ে গেল?) এ সময় হুদহুদ পানির অনুসন্ধান করছিল। যেহেতু মাটির নীচে কতটুকু গভীরে

Scanned with CamScanner

পানি আছে, সে খবর হুদহুদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হত। সুতরাং পানির স্তর জানার জন্য হুদহুদ ছিল তাঁর দলিল, কারণ সে জানত মাটির কত নীচে পানি আছে যেমনিভাবে কাঁচের মধ্য দিয়ে পানি দেখা যায়।

ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) 'সুরাদ' পাখির পিছু পিছু গিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছলেন। তখন মেঘের আকৃতিতে একটি প্রাণী এসে বলল, হে ইবরাহীম ! আমার ছায়া ধারণ কর এবং এর উপরই কাবা তৈরী কর। এ সময় ইবরাহীম (আ.) নির্জনে আল্লাহর ইবাদত করছিলেন। সমগ্র ভূমন্ডলে আল্লাহর ইবাদতকারী আর কেউ ছিল না। আল্লাহ বলেন- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ এরপর তাঁর সাথে ইসমাঈল (আ.)ও শরীক হলেন। যখন কাবা শরীফের ভিত্তি উঁচু হল, তখন মাকামে ইবরাহীম নামক পাথর উঠিয়ে আনা হল। এর উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহিম (আ.) কাজ করতেন এবং দু'আ করতেন رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ এ পাথরের বৈশিষ্ট্য ছিল যখন উপরে কাজ করার প্রয়োজন হত, তখন তা উঁচু হয়ে যেত। আবার যখন নীচে কাজ করার প্রয়োজন হত, তখন তা নিচু হয়ে যেত। পাথরের উপব হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন এখনো বিদ্যমান রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ঐ পাথরের উপর তাঁর দু পায়েরই চিহ্ন আছে। ইবরাহীম (আ.) এর পদচিহ্ন যুক্ত আরেকটি পাথর আছে। সেই পাথরের কাহিনী নিম্নরুক যখন তিনি মক্কা শরীফ তশরীফ নিয়েছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সারা ওয়াদা নিয়েছিলেন যেন তিনি মক্কা শরীফের মাটিতে পা না রাখেন। যখন ইসমাঈল (আ.) এর স্ত্রী তাঁর পা ধুয়ে দিতে লাগলেন তখন তিনি একদিকে সামান্য ঝুঁকে ছিলেন। এ সময় এক পা একটি পাথরের উপর রেখেছিলেন। সে পাথরে তাঁর এক পায়ের চিহ্ন পড়েছিল। তিনি কাবা শরীফ ৯ হাত উঁচু এবং ৩০ হাত প্রশস্ত করে তৈরী করেন। এর ছাদ দেন নাই। তাতে চূণও লাগাননি। এর একটি দরজা মাটির সাথে মিলিত করেই তৈরী করা হয়। আর কোন দরজা ছিল না যাতে কোন তালা লাগানো যেতে পারে। তুব্বায়ে হিময়ারী এরপর একটি দরজা তৈরী করেন। দরজার ডান দিকে একটি কূপ খনন করেন। তাতে কাবা শরীফের জন্য প্রেরিত হাদিয়াগুলো রাখা হত। ঐ কূপকে خزنة الكعبه (কাবা শরীফের গচ্ছিত সম্পদ) বলা হত।

হযরত ইবনে হজর (র.) বলেন, যুলকারনাইন অর্থাৎ সম্রাট ইসকন্দর রূমী (যাঁর কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে) ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে কাবা শরীফ নির্মাণের কারণ জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন, আমরা দু'জন আদিষ্ট হয়েছি। ইসকন্দর বললেন, এর সাক্ষী কোথায়? এ সময় ৫জন কাবশা দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন-

نشهد ان ابراهيم واسماعيل عبدان مامورن بالبناء

"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) আল্লাহর বান্দা। তাঁরা দু'জনে কাবা শরীফ নির্মাণে আদিষ্ট।" বাদশাহ বললেন, আমি রাজী হয়েছি এবং মেনে নিয়েছি । আর তাদের দু'জনকে (হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন আপনারা দু'জন ঠিকই বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে- হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কা শরীফে ছিলেন। এমন সময় যুলকারনাইন এলেন, যখন তিনি আবতহ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁকে বলা হল- এ শহরে ইবরাহীম খলীলুর রহমান রয়েছেন। যুলকারনাইন বললেন, আমার জন্য মুনাসিব হবে না, যে শহরে ইবরাহীম খলীলুর রহমান রয়েছেন, বাহনের উপর আরোহণ করে সে শহরে আমি প্রবেশ করি। সুতরাং তিনি পায়ে হেঁটে চললেন। যখন দুই জনের সাক্ষাৎ হল, তখন ইবরাহিম (আ.) সালাম করলেন এবং মুয়ানাকা করলেন। ফাকিহানী বলেন, উল্লেখিত

বর্ণনায় যে কাবশার কথা বলা হয়েছে, এগুলো পাথরও হতে পারে। (অথবা ৫ জন নেতৃস্থানীয় লোকও হতে পারেন।)

واذن في الناس بالحج আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একখানা রিওয়ায়াত রয়েছে। তা নিম্নরূপ-

যখন ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাণ কাজ হতে অবসর নিলেন, তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি কাজ শেষ করেছি।' আল্লাহ বললেন, "তুমি মানুষকে হজ্জের জন্য আহবান কর।" ইবরাহীম (আ.) বললেন 'হে আল্লাহ! আমার এ আহবান কার কাছে পৌঁছবে?"

আল্লাহ বলেন, "তুমি আহবান কর। পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমার।" ইবরাহীম (আ.) বললেন, "হে আমার রব! আমি কি বলব?' আল্লাহ বলেন, তুমি বল;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إِلَى بَيْتِ الْعَتِيقِ فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ عَزَّوَجَلَّ-

'হে মানব সম্প্রদায়, তোমাদের উপর বায়তুল আতিকের হজ্জ ফরয করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও।' ইহা শুনে হযরত ইবরাহীম (আ.) মাকামে ইবরাহীমের উপর দাঁড়ালেন, সাথে সাথে পাথরও উঁচু হয়ে যেতে লাগল। এমনকি তা সর্বোচ্চ পাহাড় হতেও উঁচু হয়ে গেল। তিনি আহ্বান করলেন, তাঁর দুই আঙুল দুই কানে প্রবিষ্ট করলেন এবং পূর্ব পশ্চিম দিকে মুখ করে তিন বার তা বললেন। সেদিন সমস্ত পৃথিবীর শক্ত মাটি, নরম জলভাগ, স্থলভাগ, মানুষ-জ্বীন, সকলকেই আল্লাহ তায়ালা সে আহবান শুনিয়েছিলেন। তারা সবাই জবাবে বলেছিল- لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (হাজির, হে আল্লাহ হাজির) হযরত ইবরাহীম (আ.) ইয়ামনের দিকে প্রথম আহ্বান করেছিলেন, এ কারণে ইয়ামনের অধিবাসীরা প্রথমে জবাব দিয়েছিল। بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ আয়াতের এক তাফসীরে বলা হয়ে থাকে যে, "এ নিদর্শন হল মাকামের উপর থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর আহবান।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তিন বার আহ্বান করলেন। পুরুষের ঔরষে ও মহিলাদের গর্ভে যত লোক আছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তা শুনিয়ে দিলেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক হজ্জ আদায় করবেন, তারা ইবরাহীম (আ.) এর আহ্বানের জবাব দিয়েছিলেন।

এরপর হযরত ইবরাহীম (আ.) মাকামে ইবরাহীমকে কাবা শরীফের সাথে মিলিয়ে দরজার দিকে রেখে দিলেন। মাকামে ইবরাহীমকে বর্তমান স্থানে নিয়ে যাওয়ার দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনায় হযরত উমর (রা.) এবং এক বর্ণনায় মহানবী (সা.)-এর উল্লেখ রয়েছে। দুই বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য করা যায় এভাবে-মক্কা বিজয়ের দিন হযরত উমর (রা.) তওয়াফ করছিলেন আর মহানবী (সা.) আগে চলছিলেন। হঠাৎ করে হযরত উমর (রা.) বললেন- أَوَلَا اتَّخِذُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى মহানবী (সা.) সামান্য সময় নীরব থাকলেন। এর পরই আয়াত অবতীর্ণ হল- وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাও।" তখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তিনি তা বর্তমান স্থানে নিয়ে গেলেন। এ জন্য দু'খানা হাদীসই সঠিক।

যখন ইবরাহীম (আ.) কা'বা শরীফ নির্মাণের কাজ শেষ করলেন, তখন জিবরীল আমীন তাঁকে সাথে নিয়ে সাফা ও মারওয়া দেখালেন এবং হরম শরীফের সীমানাও দেখালেন। সে সময় তাঁর সাথে হযরত ইসমাঈল (আ.)ও ছিলেন। জিবরাইল (আ.) তাঁদের উভয়কে হজ্জের আহকাম সমূহ শিক্ষা দিলেন। কারণ ইবরাহীম (আ.) তাঁর দু'আর মধ্যে বলেছিলেন- رَبَّنَا أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- এ দু'আর জবাব

Scanned with CamScanner

ও হজ্বের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত একটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

জিবরাঈল (আ.) তাঁদের দু'জনকে নিয়ে তালবিয়ার দিন মীনার দিকে বের হলেন। সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করলেন। এরপর ফজর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। তাঁদেরকে নিয়ে সেখানে ফজরের নামায আদায় করে প্রত্যূষে আরাফার উদ্দেশে বের হলেন। যুহর পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করেন। সূর্য হেলে গেলে যুহর ও আসরের নামায এক সাথে তাঁদেরকে নিয়ে আদায় করলেন। এরপর তাঁদেরকে নিয়ে আরাফায় অবস্থানস্থলের দিকে ফিরলেন। বর্তমানে লোকেরা যেখানে অবস্থান করেন, সেখানে তাঁরা অবস্থান করলেন। সূর্য অস্ত গেলে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে মুযদালিফায় গমন করলেন এবং সেখানে মাগরিব ও ঈশার নামায এক সাথে আদায় করলেন। এরপর সেখানে রাত যাপন করলেন। ফজর উদয় হলে তাঁদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। অতপর قزح নামক স্থানে অবস্থান করলেন। ভোরের আলো প্রকাশিত হলে তাঁদেরকে নিয়ে মীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তাঁদেরকে পাথর নিক্ষেপের পদ্ধতি দেখালেন। এরপর তাঁদেরকে কুরবানীর নির্দেশ দিলেন এবং কুরবানীর স্থানও দেখিয়ে দিলেন। অতপর মাথা মুড়ানোর নির্দেশ দিলেন। এরপর তাঁদেরকে নিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ ফিরে এলেন। উপরোক্ত বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) দুই নামাযকে একত্রে আদায় করেছেন। এ বর্ণনা আমাদের ইমামগণের মতের পরিপন্থী। তাঁদের মতে لَمْ يَجْمَعِ الْحُلُوْلُ الْحِسِّ بَيْنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- সুতরাং দুই মতের সমতা বিধান এরূপে হতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর জন্য এটা ছিল স্থায়ী নির্দেশ। অপরদিকে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর জন্য এ নির্দেশ ছিল উপস্থিত সময়ের জন্য; স্থায়ী ছিল না। সুতরাং কোন বিরোধ নেই।

তায়েফের বাগান স্থানান্তর

যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) দু'আ করলেন-

رَبَّنَا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ الخ-

তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য বনী জুরহামকে কাবা শরীফ পৌঁছিয়ে দিলেন। اصحاب الصريم এর বাগান শামের ফিলিস্তীন নামক স্থান হতে মাটিসহ উঠিয়ে এনে তায়েফে রেখে দিলেন। ইবনে হিশাম লিখেন যে, তায়েফের বাগান হল 'আসহাবে সারীম' এর বাগান। কারণ সেখানকার জ্বলন্ত মাটি এখনো রয়েছে।

ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মাণ কাজের পর আমালিকা সম্প্রদায় কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় এর বিপরীত রয়েছে। আমালিক 'লাওয়ামিলাক'-এর বংশধর, যিনি সর্বপ্রথম আরবী লিখন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাঁর বংশ পরম্পরা হচ্ছে ইমলাক বিন লাউজ, বিন সাম বিন নূহ (আ.)। কেউ বলেন, তাঁর বংশধারা হল আমালিক বিন আইস বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম (আ.)।

এরপর কাবা শরীফ পুনঃ নির্মাণ করেন কুসাই। তখন রোম দেশীয় কাঠ এবং খুরমা গাছের ডাল দিয়ে ছাদ তৈরী করা হয়েছিল। এরপর কুরাইশরা কাবা শরীফ নির্মাণ করে। এরপর হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণ করেন।

হাররার ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) কর্তৃক কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণের কারণ হল- যখন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া (রা.) মক্কা শরীফ আক্রমণ করে, তখন কাবা শরীফের

অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যখন ইয়াযিদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, "মদীনাবাসীরা তোমাদের অনুসরণ পরিত্যাগ করেছে এবং তোমাদেরকে গলমন্দ করছে। তারা বলছে, ইয়াযীদের মধ্যে ধর্ম-কর্ম নেই। কারণ সে মুহররমাতকে বিয়ে লাল মনে করে। তার মদ পানের অভ্যাস রয়েছে। নামায পরিত্যাগ করার বিচ্যুতি রয়েছে। কুকুর নিয়ে খেলা করার অভ্যাস রয়েছে। কোন কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বলেন, ইয়াযিদের একটি বানর ছিল। সে তাকে তার মদের অবশিষ্ট অংশ পান করতে দিত। এটাকে কুবা ও রেশমের টুপি পরাত এবং খচ্চরের উপর আরোহণ করাত।

ইমাম গাজ্জালী (র.)-এর মতে ইয়াযিদ সাহাবী ছিলেন না। কারণ তার জন্ম হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে হয়েছিল। তবে ইয়াযিদের উপর লা'নত করা জায়িয নেই। কারণ তিনি মুসলমান ছিলেন। আল্লামা ইবনে খলদুন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বলেন, হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদত ইয়াযিদের নির্দেশে হয় নাই এবং ইয়াযিদ হযরত হুসাইন (রা.)-এর হত্যার প্রতি সন্তুষ্টও ছিলেন না। ইমাম হলবী (র.) তাঁর কিতাবে এ মর্মে বর্ণনা পেশ করেন যে, যখন মদীনাবাসীগণ ইয়াযিদের প্রতি কৃত বায়আত প্রত্যাহার করে নেন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন হানযালা (রা.)-কে গভর্নর নিযুক্ত করেন, ইয়াযীদের গভর্নর মারওয়ান বিন হাকীম এবং বনী উমাইয়াদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করে দেন, তখন ইয়াযিদ ২০ হাজার অশ্বারোহী ও ৬০ হাজার পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করে। তারা মদীনায় ব্যাপক লুটপাট ও ধ্বংসাত্মক কার্য পরিচালনা করে। এ ঘটনা হাররার ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। এ ঘটনার সময় তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান, ইকামত ও জামাত কায়িম হয়নি। বরং তিন দিনের জন্য মদীনা শহরকে যুদ্ধের জন্য হালাল ঘোষণা করে দেয়া হয়।

ইবনে দাহিয়া তাঁর 'তানবীর'-এ লিখেন, এ ঘটনায় শীর্ষস্থানীয় ১৭০০ মুহাজির ও আনসার শাহাদত বরণ করেন। রওযা শরীফ ও মিম্বরের মধ্যখানে ঘোড়ার আস্তাবল তৈরী করা হয়। মদীনার অধিবাসীরা সবাই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি মিম্বর শরীফে কুকুর প্রস্রাব করতে দেখা যাচ্ছে। ইয়াযিদের সেনাবাহিনী প্রধান মদীনাবাসীকে ইয়াযিদের আনুগত্যে বাধ্য করেন এমনভাবে, যেন তিনি ইচ্ছে করলে তাদেরকে বিক্রি করে দিতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে মুক্ত করে দিতেও পারেন। এটা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন। এমন সময় কিছু সংখ্যক লোক কুরআন সুন্নাহর উপর বায়আত গ্রহণ করতে চাইলে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর ঘরে সৈনিকগণ প্রবেশ করে তাঁর মাল-সম্পদ বের করে দিতে বলল। তিনি জবাব দিলেন- তোমাদের এক দল ইতিপূর্বে এসে সকল সম্পদ নিয়ে গেছে। এখন আমার কাছে তোমাদের দেওয়ার মত কোন সম্পদ নেই। এ কথা বলতেই তাঁর দাঁড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়।

ইমাম সুহাইলী (র.)-এর বর্ণনা মতে, নারী শিশু ছাড়া এ ঘটনার গণ্যমান্য মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের ১৭০০ সাহাবী, ৭০০ হাফিযে কুরআন এবং ১০ হাজার সাধারণ লোককে হত্যা করা হয়। হাররার ঘটনা ৬২ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এ ঘটনার তিন দিন পর সেনাবাহিনী প্রধান মুসলিম বিন কুতাবাইবার এমন এক প্রকার রোগ হল যে, সে কেবল কুকুরের ন্যায় চিৎকার করত। এভাবেই সে মারা যায়।

ইমাম হলবী (র.) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা.) হতে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন, হাররার ঘটনার সময় আমি একাকী মসজিদে নববীতে ছিলাম। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে কোন মানুষ আসেননি। আমি ৫ ওয়াক্ত নামাযের সময় রওযা শরীফ

Scanned with CamScanner

হতে আযান ও ইকামতের আওয়াজ শুনতাম।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) কর্তৃক কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণের দ্বিতীয় কারণ হল- হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) মানত করেছিলেন যে, যদি আল্লাহ তায়ালা মক্কা বিজয় করে দেন, তবে আমি কাবা শরীফের অভ্যন্তরে দুই রাকআত নামায আদায় করব। যখন আল্লাহ তায়ালা মক্কা বিজয় দান করলেন, মহানবী (সা.) তাঁকে নিয়ে বিদায় হজ্জে গেলেন। তখন হযরত আয়িশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) ! কাবা শরীফের দরজা খুলে দিন, যাতে আমি তার ভিতরে নামায আদায় করতে পারি। মহানবী (সা.) রাতেই (কাবা শরীফের চাবি রক্ষক) হযরত উসমান বিন তালহা (রা.)-কে ডাকলেন। হযরত উসমান (রা.) চাবি নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) ! কাবা শরীফ কখনো রাতে খোলা হয় না। এখন আপনার নির্দেশ। মহানবী (সা.) বললেন,তা হলে খোলার প্রয়োজন নেই। এই বলে তিনি হযরত আয়িশা (রা.)-এর হাত ধরে নিয়ে হাতিমে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, এখানেই নামায পড়ে নাও; কারণ হাতিমও কাবা শরীফের অন্তর্ভুক্ত। তোমার কওম এটাকে বাইরে রেখেছে। যদি তোমার কওমের লোকদের জাহিলী সমালোচনার আশংকা না থাকত, তা হলে আমি কাবা শরীফের ভিত্তি ভেঙে দিতাম এবং ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত্তির উপর তা নির্মাণ করতাম, হাতিমকে কাবা শরীফের অন্তর্ভুক্ত করে নিতাম, আর এর দু'টি দরজা রাখতাম। এ হাদীস শরীফ হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। এই মর্মের অন্য একখানা বর্ণনা রয়েছে। সেই বর্ণনায় কিছু অংশ বর্ধিত আছে- ولئن عشت الي قابل لا فعلن كذا যদি আমি আগামীতে বেঁচে থাকি, তা হলে অনুরূপ করব। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) এ হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণ করেন।

এরপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মিনজানিক দিয়ে কাবা শরীফ ভেঙে ফেলেন এবং আবদুল মালিক বিন মাওয়ানের নির্দেশে কুরাইশদের ভিত্তির উপর পুনরায় কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। রক্তপাত হাজ্জাজের কাছে খুবই প্রিয় ছিল। এর কারণ লিখেন, জন্মের পর হাজ্জাজ মায়ের দুধ মুখ দিয়ে পান করতেন না। তখন শয়তান আরবের বিখ্যাত ডাক্তার হারিস বিন বালদার আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হল এবং পরামর্শ দিল একটি নর ছাগল জবাই করে তার রক্ত দিয়ে উহা ভিজিয়ে দাও এবং তার স্তনে রক্ত দিয়ে মালিশ কর। যখন তার কথামত অনুরূপ করা হল তখন সে দুধ পান করতে লাগল।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের হাতে ১ লক্ষ বিশ হাজার লোক নিহত হন। সুলাইমান বিন আবদুল মালিক খলীফা হওয়ার পর ৭০ হাজার কয়েদীকে মুক্ত করেন, যাদেরকে হাজ্জাজ হত্যার জন্য বন্দী করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা এতটা দোষী ছিলেন না যে, তাদেরকে হত্যা করা জরুরী ছিল।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জেলখানার ছাদ ছিল না। রোদ বৃষ্টিতে জেলখানার লোকেরা ছাদ বিহীন জেলখানায় অবস্থান করতে হত। একটি জিঞ্জীর দিয়ে দশ জন লোককে বেঁধে রাখা হত। হাজ্জাজের হাতে সর্বশেষ নিহত লোক হলেন- اعلم التابعين (তাবেয়ীগণের মাঝে সবচে জ্ঞানী)খ্যাত হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রা.)। তাঁর পরে মাত্র একজন লোককে হত্যা করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হাজ্জাজই সর্বপ্রথম মুদ্রার উপর নকশা প্রয়োগ করে। মুদ্রার এক পিছে লেখা ছিল قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এবং অপর পিঠে লেখা থাকত اَللّٰهُ الصَّمَدُ এটা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নির্দেশে হয়েছিল। কুসাইর নির্দেশে কাবা শরীফের মাতাফের বাইরে বাড়ী-ঘর তৈরী করে নেয়া হয়।

মহানবী (সা.) -এর সময়কাল, অতপর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত অনুরূপ রাখা হয়। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে কাবা শরীফের সীমানা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মনে করলেন। তিনি আশপাশের স্থান ক্রয় করে বাড়ী-ঘরগুলো ভেঙে দিয়ে কাবা শরীফের সীমানা সম্প্রসারণ করেন এবং চারদিকে ছোট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে তাতে কয়েকটি দরজা লাগিয়ে দেন। অতঃপর হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর সময়ে এর সীমানা আরও সম্প্রসারিত করা হয়। এরপর আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সময় দেয়াল উঁচু করে তৈরী করা হয় এবং সেগুন কাঠের ছাদ তৈরী করেন। এরপর ওলীদ বিন আবদুল মালিক এসব ভেঙে মর্মর পাথরের স্তম্ভ লাগিয়ে দেন এবং সেগুন কাঠের ছাদের পরিবর্তে ঢালাই ছাদ নির্মাণ করেন। মসজিদের পার্শ্ববর্তী স্থানও মর্মর পাথরে জুড়ে দেন। এরপর খলীফা মনসুরের শাসনামলে এর পরিসীমা আরও বৃদ্ধি করা হয়। এমনকি মূল কাবা শরীফ মসজিদের মধ্যিখানে পড়ে যায়। এরপর খলীফা মু'তায বিল্লাহর সময়ে দারুন নদওয়াকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইমাম নববী (রা.) লিখেন, পৃথিবীতে এমন কোন শহর নেই, যার সুনাম মক্কা ও মদীনা শরীফের মত এত বেশী। আল্লাহ তায়ালা যমীনে সর্বপ্রথম কাবা শরীফ তৈরী করে এ নগরীর নাম রাখেন 'উম্মুল কুরা'।

ওহী অবতরণ শুরু

মহানবী (সা.)-এর জন্মের ৪০ তম বছর কারো মতে ৪৩ তম বছর ওহী অবতীর্ণ হয়। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইহুদী পাদ্রীগণ ও নাসারা রাহিবগণ শানে নবুওয়াতের প্রকাশ নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করতে লাগল। এর পূর্ব থেকেই মহানবী (সা.) একাকী গুহায় তশরীফ নিয়ে দু'চার দিন থাকতেন এবং নির্জনে ইবাদত করতেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে তিন পদ্ধতিতে ওহী আসত। ১. ফেরেশতা কোন মানুষের আকৃতি ধারণ করে আসতেন এবং তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলতেন। ২. কখনো তাঁর প্রতি الـقـاء হত অর্থাৎ ওহীর বিষয়বস্তু তাঁর অন্তরে ঢেলে দেয়া হত। ৩. কোন সময় তিনি চাদর বা গিলাফ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তেন আর ঘন্টা-ধ্বনির মত আওয়াজের মাধ্যমে ওহী অবতীর্ণ হত। ওহী অবতরণের তৃতীয় পদ্ধতিতে মহানবী (সা.)-এর খুব কষ্ট অনুভূত হত। এ পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন- وَهُوَ اَشَدُّ عَلَيَّ (আর ইহা আমার জন্য সব চেয়ে কঠিন)

আল্লামা ইবনে খলদুন (র.) এই মর্মে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের সুসংবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। হযরত আমর বিন আনবাসা বর্ণনা করেন, আমার অন্তর জাহিলী যুগের উপাস্য হতে বিমুখ হয়ে গেল। এজন্য আমি তাদের পূজা ছেড়ে দিলাম। এ সময় আহলে কিতাবের এক লোক মদীনা ও শামের নিকটবর্তী তীমা জনপদে বাস করতেন। তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, আমরা পাথরের পূজা করতাম, আমরা যখন কোথাও যেতাম এবং সে সময় আমাদের দেবতাগুলো আমাদের সাথে থাকত না, তখন আমরা ৪টি পাথর নিতাম। তন্মধ্যে তিনটি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতাম এবং সবচেয়ে সুন্দর পাথরটিকে পূজার জন্য নির্ধারিত করতাম। যখন কোথাও এর চেয়ে সুন্দর কোন পাথর পেতাম, তখন পূর্বেরটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এটির পূজা আরম্ভ করতাম। এটাই ছিল আমাদের অবস্থা। অবশেষে দেখলাম যে, এগুলো বাতিল উপাস্য। এটা কোন লাভ-ক্ষতির কিছুই করতে পারে না। এ কারণে আমি এর পূজা ছেড়ে দিলাম।

Scanned with CamScanner

আমাকে এর চেয়ে উত্তম ধর্মের কথা বলুন। তিনি জবাব দিলেন, মক্কা শরীফ একজন লোক জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে দেবতা পূজা পরিত্যাগ করে অন্য এক উপাস্যের প্রতি আহবান করছেন। তুমি তাঁর সাথে দেখা করে তাঁর অনুসরণ কর। কারণ তিনি সর্বোত্তম ধর্ম নিয়ে এসেছেন। সে সময় হতে আমি বারবার মক্কা শরীফ আসতে লাগলাম এবং তাঁর সংবাদ নিতে থাকলাম। কোথাও কোন সন্ধান পেলাম না। এক দিন আমি মক্কা শরীফ পৌছলাম। লোকেরা বলতে লাগল, একজন লোক প্রকাশ পেয়েছেন, যিনি স্বীয় বংশের মাবুদ ও মাযহাব পরিত্যাগ করে অন্য মাবুদের প্রতি লোকজনকে আহবান করছেন। এটা শুনে আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম। যেহেতু তখনও তাঁর নবুওয়াতের বিষয়টি কুরাইশদের অগোচরে ছিল এবং তাঁর উপর কঠোরতা চলছিল; এ কারণে গোপনে তাঁর সাথে দেখা করে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। জিজ্ঞাসাবাদের পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল। আমি বললাম-

نعم ما ارسلت به وقد امنت وصدقتك۔

আপনি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, তা কতই না উত্তম! আমি আপনার কথায় ঈমান আনলাম এবং আপনার কথার সত্যায়ন করলাম। ঈমান আনয়নের পর আমি আরয করলাম- আমাকে থাকার অনুমতি দেবেন নাকি আমি বাড়ীতে চলে যাব? তিনি বললেন, তুমি বাড়ীতে চলে যাও। তোমার এখানে থাকা কষ্ট হবে। কারণ লোকদের আক্রমণ দেখতেই পাচ্ছ। যখন তোমার কাছে খবর পৌছবে যে আমি কোথাও বাইরে চলে গেছি, তখন সেখানে গিয়ে আমার কাছে মিলিত হবে।

মহানবী (সা.) মদীনায় তশরীফ নিলে, আমি (বর্ণনাকারী) সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), আমাকে কি চিনতে পেরেছেন? মহানবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তো সালিম সম্প্রদায়ের ঐ লোক যে আমার কাছে মক্কা থেকে এসেছিলে।

হযরত আসিম বিন আমর বিন কাতাদাহ তাঁর কওমের লোক থেকে বর্ণনা করেন, আমরা মূর্তিপূজক ছিলাম। আমাদের কাছে আহলে কিতাবের অনেক আলিম ছিলেন। আমাদের ও তাঁদের মধ্যে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। আমরা কখনো তাদের উপর বিজয়ী হয়ে গেলে তারা আমাদেরকে বলত, অচিরেই একজন নবী আসবেন, যিনি তোমাদেরকে আদ ও ইরাম জাতির ন্যায় ধ্বংস করবেন এবং তোমাদের মূলোৎপাটন করে দেবেন। আমাদেরকে তারা সব সময়ই এ কথা বলে থাকত। অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করলেন, তখন আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। কিন্তু তারা তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল। তাদের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন-

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ۔ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۔ (بقرة-٨٩)

অর্থাৎ যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাব এসে পৌছল, যা ঐ বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং যা দিয়ে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে চাইত। অতঃপর যখন তাদের কাছে এসে পৌছলেন, যাঁকে তারা চিনত, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসল। সুতরাং কাফিরদের উপর আল্লাহর লা'নত। (বাকারাহ ঃ ৮৯)

শায়খে বনী কুরাইযা সংক্রান্ত অপর একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন ঃ

শামের এক ইহুদী আমাদের এখানে এসে অবস্থান করলেন। মুসলমানগণ ছাড়া তাঁর মত এমন নেককার ও সৎ লোক বিরল ছিল, আমাদের উপর দুর্ভিক্ষ নামলে তাঁর কাছে দুআ চাইতাম। তিনি দুআ করতেন। দুআর সাথে সাথে বৃষ্টি নামত। এমনি ভাবে সব কাজেই তাঁর দুআ গৃহীত হত। তাঁর মৃত্যু আসলে তিনি আমাদের ডেকে বললেন, তোমরা জান যে, আমি শামের অধিবাসী, যেখানকার যমীন বরকতপূর্ণ সে স্থান ত্যাগ করে মদীনায় আসার কারণ কি? আমরা জবাব দিলাম, তা আপনিই বেশী জানেন। তিনি বললেন, শেষ যামানার নবী মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করবেন আর এই শহরই হচ্ছে তাঁর হিজরতের স্থান। আমি তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম যেন তিনি অবির্ভূত হন আর আমি তাঁর অনুসরণ করি। হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা কখনো তাঁর অনুসরণ হতে পিছিয়ে থেকো না। তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সাথে জিহাদ করবেন। তাদের স্ত্রী ও শিশুদেরকে বন্দী করবেন। যখন বনু কুরাইযার অবরোধ করা হল, তখন হযরত সালাবা বিন সাঈদ ও আসাদ বিন সাঈদ বলতে লাগলেন, হে বনু কুরাইযা! ইনিই হচ্ছেন প্রতিশ্রুত সেই নবী। এই বলে তাঁরা মুসলমান হয়ে গেলেন।

হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রা.) অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ও আবূ সুফিয়ান ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়ামন গেলাম। এমন সময় হানযালা বিন আবূ সুফিয়ানের একটি চিঠি পৌছল যে, মক্কায় মুহাম্মদ (সা.) বিন আবদুল্লাহ নবুওয়াত দাবী করছেন। এ কথা ইয়ামনে প্রসিদ্ধি লাভ করল। এমন সময় আমাদের কাছে এক ইহুদী এলো এবং বললো, তোমাদের মধ্যে মক্কার নবুওয়াতের দাবীদার লোকের চাচা কে? আমি বললাম, আমি। সে আমাকে প্রশ্ন করল তোমার ভাতিজার মধ্যে কি কোন বক্রতা আছে? খোদার কসম! তুমি সত্য কথা বলবে, আমি বললাম, না। আল্লাহর কসম! তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি এবং কখনো খিয়ানত করেননি। বরং কুরাইশদের মধ্যে তাঁর নাম 'আমীন' বলে প্রসিদ্ধ। সে প্রশ্ন করল, তিনি কি হাত দিয়ে লেখেন? আমার ইচ্ছে হল যেন 'হ্যাঁ' বলে দেই। কিন্তু মিথ্যা বললে আবূ সুফিয়ান আমাকে ধরে ফেলবে, এই জন্য আমি জবাব দিলাম 'না'। এটা শুনে ঐ ইহুদী পাগলপ্রায় হয়ে তার চাদর খুলে ফেলল এবং বলল, ইহুদীরা যবেহ হয়ে গেছে, ইহুদীরা নিহত হয়ে গেছে। ফিরে আসার পথে আমি আবূ সুফিয়ানকে বললাম, তুমি কি মুসলমান হয়ে যাবে? তিনি জবাব দিলেন, যতক্ষণ মাঠে সৈন্য দেখব, ততক্ষণ মুসলমান হব না। মক্কা বিজয়ের দিন ময়দানে সৈন্যবাহিনী যখন দেখা গেল না, তখন আমি বললাম, তোমার কি সেই কথা স্মরণ আছে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

আরও একটি ঘটনা হযরত উমাইয়া বিন আবূ সল্লত হযরত আবূ সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আমাদের শহরে প্রেরিত শেষ নবীর গুণাবলী দেখলাম, আমার ধারণা হল, সে লোক আমিই হব। বরং আমি তা মানুষের মধ্যে কিছু প্রচারও করে দিলাম। অতঃপর আমার মনে হল, ঐ নবী আবদে মনাফের গোত্র হতে হবেন। আবদে মনাফের প্রতি দৃষ্টি দিলে তখন উতবা বিন রবীআ ছাড়া এমন গুণাবলীর আর কাউকে পাইনি। কিন্তু তাঁর বয়স ৪০ এর বেশী হয়ে গেলে বুঝলাম, নবী অন্য কেউ হবেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, যখন মহানবী (সা.) নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন, তখন আমি উমাইয়াকে বললাম, উনি কি সত্য নবী? সে জবাব দিল, হ্যাঁ, তিনি সত্য নবী। তাঁর অনুসরণ কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন অনুসরণ করছ না? সে বলল, আমার লজ্জা পাচ্ছে। আমি সকীফ

Scanned with CamScanner

সম্প্রদায়ের মহিলাদের সাথে আলাপ করেছি যে, সেই নবী আমি হব। এখন আমি কিভাবে অন্য একজনের অনুসরণ করব?

তালহা বিন আবদুলল্লাহ বলেন, আমি বসরার বাজারে ছিলাম। একজন পাদ্রী তাঁর গীর্জা হতে বলতে লাগলেন, ঐ লোকদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্য হতে কে হরম শরীফের অধিবাসী? আমি বললাম, আমিই হরম শরীফের অধিবাসী। তিনি বললেন, আহমদ কি প্রকাশ পেয়েছেন? আমি বললাম, কোন আহমদ ? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিবের ছেলে। এটাই সেই মাস যে মাসে তিনি প্রকাশিত হবেন এবং নবুওয়াত প্রাপ্ত হবেন। তিনি শেষ নবী হবেন। হরম শরীফ হতে তাঁর আগমন ঘটবে এবং তাঁর মতাদর্শের বিস্তৃতি নাখলা, হাররা ও সাবাখ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তালহা বলেন, আমি মক্কায় ফিরে এসে হযরত আবূবকর (রা.)-কে তা বললাম। আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তা শুনালেন। মহানবী (সা.) তা শুনে খুবই খুশী হলেন এবং তালহা (রা.) মুসলমান হয়ে গেলেন।

হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর বর্ণনা

তিনি নিজে বলেন, আমি পারস্যের লোক। আমি ইস্পাহানের হাই নামক গ্রামের অধিবাসী। এই গ্রামের আরেকটি পরিচয় দেন এভাবে- قرية من قرى الاهواز يقال لنهار انهر من এটা আহওয়াজের গ্রামসমূহের একটি গ্রাম যাকে বলা হত রাম হুরমুজ। আমি রামহুরমুজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা ইস্পাহানে বাস করতেন। তিনি ছিলেন গ্রামের নেতা। আমাকে আমার পিতা খুব বেশী ভালবাসতেন। একারণে আমাকে মেয়েদের মত ঘরে আটকে রাখতেন। আমি অগ্নিপূজায় খুবই আন্তরিক ছিলাম। এমনকি আমি قطن النار আগুন প্রজ্বলনকারী খাদিম হয়ে গেলাম। আমার পিতার বড় জমিদারী ছিল। একদিন তাঁর ব্যস্ততার কারণে বাগানে যেতে পারেননি। তদারকীর জন্য আমাকে পাঠালেন। সাথে সাথে আমাকে বলে দিলেন, দেরী না করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। রাস্তায় আমি খ্রীস্টানদের একটি গীর্জা দেখতে পেলাম। গীর্জার ভেতরে আওয়াজ শুনে তার নিকটে গিয়ে দেখলাম, লোকেরা সেখানে প্রার্থনা করছেন। তাঁদের তরীকা আমার পছন্দ হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবলাম, তাঁদের ধর্ম অবশ্যই আমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম। এদিকে আমি বাগান পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই সূর্য অস্ত গেল। আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ধর্মগুরু কোথায়? তাঁরা জবাব দিলেন, শামে। এমন সময় আমার খোঁজে আমার পিতা লোক পাঠালেন। ফিরে যাওয়ার পর আমাকে বললেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করে সে ধর্মের সৌন্দর্য উপস্থাপন করলাম। তিনি আমাকে বুঝালেন, বৎস! সে ধর্মে কোন কল্যাণ নেই। তোমার পিতৃপুরুষের ধর্মে অনেক ইহুদী রয়েছেন। আমি বললাম, কখনো না। ঐ ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম। এ কথায় আমার পিতার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হল। এ কারণে আমার পায়ে শিকল পরিয়ে আমাকে ঘরে বন্দী করে রাখলেন। আমি খ্রীস্টানদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দিলাম, শাম থেকে কোন কাফেলা এলে ফেরত যাওয়ার সময় যেন আমাকে জানানো হয়। কারণ আমি তাদের সাথে শাম যেতে চাই। শাম হতে একটি কাফেলা এসে ফেরত যেতে চাইলে, ঐ লোকেরা আমাকে সংবাদ দিল। আমি লোহার শিকল ভেঙে ফেলে তাদের সাথে শাম রওয়ানা হয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছে আমি জিজ্ঞেস করলাম,

এখানকারসবচেয়ে বড় আলিম কে? তারা আমাকে আসকফ-এর গীর্জা দেখিয়ে দিলেন। আমি তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। শেষ পর্যন্ত তার অবস্থা আমার পছন্দনীয় হল না তবুও সেখানে থাকলাম। এক সময় তিনি মারা গেলেন। তিনি আরেকজন রাহিবের কথা বলে গেলেন, যিনি খুবই পছন্দনীয় ছিলেন। আমি তাঁর খিদমত করতে থাকলাম। তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হলে আমি তাঁকে বললাম, আপনার পর আমি কার কাছে যাব? তিনি জবাব দিলেন, তুমি মাওসেল শহরে অমুকের কাছে যাবে। তিনি মারা গেলেন। আমি মাওসিল শহরের সে পাদ্রীর কাছে গেলাম এবং আমার ঘটনা বর্ণনা করে তাঁর খিদমতে রয়ে গেলাম। তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হলে আমি বললাম, এখন আমি কোথায় যাব? তিনি জবাব দিলেন, নাসবীন নামক স্থানের অমুকের কাছে যাবে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি সেখানে চলে গেলাম। সেখানকার সাধকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তাঁকে বললাম, আমি এখন কোথায় যাব? তিনি বললেন, তোমার কোথাও যাওয়ার স্থান নেই। যদি একান্ত যেতে চাও, তবে আমুরিয়া নামক স্থানের অমুক ব্যক্তি আমাদের সঠিক রাস্তার উপর আছেন। তাঁর কাছে চলে যাবে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আমুরিয়া চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমার অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে তাঁর কাছে রাখলেন। সেখানে থাকাবস্থায় আমি উপার্জন করতে লাগলাম এবং অনেক গরু-ছাগলের মালিক হয়ে গেলাম। অবশেষে তাঁরও মৃত্যু আসল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন আমি কোথায় যাব। তিনি বললেন, বৎস! এমন কোন মানুষ নেই, যার কাছে তুমি যেতে পার। তবে ইবরাহীমী মিল্লাতের উপর একজন নবী প্রেরিত হবেন। তিনি আরব তথা মক্কা শরীফে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর হিজরতের স্থান হবে কালো দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান, যেখানে খুরমা বৃক্ষ রয়েছে। তাঁর বৈশিষ্ট্য হবে- তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন; কিন্তু সদকা গ্রহণ করবেন না। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যখানে মহরে নবুওয়াত থাকবে। যদি সম্ভব হয়, তবে তাঁর সাথে মিলে যাও। এই বলে তিনি ইন্তিকাল করলেন।

কিছুদিন পরে বনূ কালিব গোত্রের এক দল ব্যবসায়ীর সাথে আমার সাক্ষাত হল। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা আমাকে তোমাদের দেশে নিয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে আমার সম্পদ, গরু, ছাগল সবই দিয়ে দেব। তারা রাজী হয়ে ফিরে আসার সময় আমাকে নিয়ে এল। আমি আমার সকল সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দিলাম। তারা আমাকে নিয়ে وادى القرى নামক স্থানে পৌঁছে, আমার উপর অনেক নির্যাতন করে এবং এক ইহুদীর কাছে বিক্রি করে দেয়। আমি সেখানে খুরমা বৃক্ষ দেখে মনে করলাম, হয়ত এটাই সেই নগরী, যার কথা ঐ সন্যাসী আমাকে বলেছিলেন। অবশেষে আমি জানলাম, এটা সেই শহর নয়। এরপর আমার মালিকের ভাই বনূ কুরাইযা মদীনা হতে এলেন। আমার মালিক আমাকে তার কাছে বিক্রি করে দিলেন। তিনি আমাকে নিয়ে মদীনা চলে এলেন। মদীনা শহর দেখে আমার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এই শহরের বর্ণনাই পাদ্রী আমাকে দিয়েছেন। তখন মহানবী (সা.) নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন; কিন্তু মক্কা শরীফ রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুসন্ধান করা আমার সামর্থের বাইরে ছিল। কারণ আমি দাস ছিলাম। একদিন আমি খেজুর গাছের উপর কাজ করছিলাম। আমার মালিকের কাছে তাঁর চাচাতো ভাই এসে বলতে লাগলেন, হে অমুক! বনী কুতাইলা শেষ হয়ে গেল। কারণ এক

Scanned with CamScanner

ব্যক্তি মক্কা হতে এসেছেন। ঐ গোত্রের সকল লোক কুবায় একত্রিত হয়েছেন। তাদের ধারণা, ঐ ব্যক্তি নবী। বনী কুতাইলা দিয়ে বুঝানো হয়েছে আউস ও খাযরাজ সম্প্রদায়। কারণ তারা কুতাইলার বংশধর। হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন, যখন আমি এই কথা শুনি, আমার শরীর কাঁপতে লাগল। এমনকি আমি গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার আশংকা হল। আমি গাছ থেকে নেমে পড়লাম এবং আমার মালিকের চাচাতো ভাইকে বললাম, তুমি কি বলছ? এটা শুনে আমার মালিক আমাকে সজোরে এক চপেটাঘাত করে বলল, তুই তা দিয়ে কি করবি? তুই তোর কাজে যা। সন্ধ্যা বেলা আমি কিছু খেজুর সংগ্রহ করে কুবায় গিয়ে মহানবী (সা.)-এর খিদমতে হাজির হলাম এবং তাঁর কাছে আরয করলাম, আমি শুনেছি, আপনি একজন সৎ লোক। আপনার সাথে অনেক দরিদ্র লোক রয়েছেন, যাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। আমার কাছে সদকার কিছু খেজুর আছে। আমি আপনাকে উপযোগী মনে করে এই খেজুর আপনার খিদমতে নিয়ে এসেছি। দয়া করে তা গ্রহণ করুন। মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন, খেয়ে নাও। তিনি কিছুই খেলেন না। হযরত হাসান (রা.) খেজুরের একটি দানা মুখে দিয়ে দিলেন, মহানবী (সা.) তা মুখ হতে বের করে দিয়ে বললেন, কাখ কাখ! তুমি কি জান না যে আমরা সদকা গ্রহণ করি না? (মুসলিম শরীফ), উল্লেখ্য, হাসান (রা.)-এর ব্যাপার অন্য কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। কারণ, হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল ২য় হিজরীতে। অর্থাৎ এই ঘটনার সময় হযরত হাসান (রা.) ছিলেন না।

তিনি মদীনায় তশরীফ নিলে আমি আরও কিছু খেজুর নিয়ে তাঁর খিদমতে পেশ করলাম এবং বললাম, আপনার জন্য হাদিয়া নিয়ে এসেছি। রাসূল (সা.) তা থেকে খেলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কেও খাওয়ালেন। আমি মনে মনে বললাম, দুটি পরীক্ষা হয়ে গেছে। অন্য এক দিন মহানবী (সা.) জান্নাতুল বাকীতে হযরত কুলসুম বিন আহমদের জানাযার জন্য তশরীফ নিলেন। এ সময় তাঁর শরীরে দু'খানা চাদর ছিল। তাঁর চার পাশে সাহাবায়ে কিরাম বসা ছিলেন। আমি তাঁর পিঠ মুবারকের দিকে লক্ষ্য করলাম মহরে নবুওয়াত দেখার জন্য। তিনি তাঁর পিঠ হতে চাদর সরিয়ে দিলেন। আমি মহরে নবুওয়াত দেখে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লাম। মহানবী (সা.) আমাকে সামনে ডেকে আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে এই ঘটনাটি শুনাতে চাইলেন। কিন্তু যেহেতু সালমান-এর ভাষা ছিল ফারসী এবং তিনি তা বুঝতে পারছিলেন না, এ কারণে ফারসী ভাষায় দক্ষ এক ইহুদী ব্যবসায়ীকে ডাকা হল। যখন সে হযরত সালমান (রা.)-এর মুখে মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা ও ইহুদীদের নিন্দা শুনতে পেল, তখন সে রাগ করে তাঁর কথার মর্মার্থ উল্টো বর্ণনা করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, সালমান আপনাকে গালি দিচ্ছে। রাসূল (সা.) বললেন, পারস্যের এ লোকটি আমাকে কষ্ট দিতে এসেছে। এমন সময় হযরত জিবরীল (আ.) অবতরণ করে সালমান (রা.)-এর কথার সঠিক মর্মার্থ বলে দিলেন। মহানবী (সা.) সেই অনুবাদটুকু ইহুদীর সামনে বর্ণনা করলেন। ইহা শুনে ইহুদী লোকটি বলল, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যদি ফারসী ভাষা জানেন, তা হলে আমাকে ডেকে এনেছেন কেন? রাসূল (সা.) বললেন, আমি আগে জানতাম না। এখন জিবরীলে আমীন

শিখিয়ে দিচ্ছেন। ইহুদী বললো, হে মুহাম্মদ (সা.)। ইতিপূর্বে আমি আপনার উপর অপবাদ আরোপ করতাম। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। এই বলে তিনি পাঠ করলেন-

اشهد ان لا اله الله واشهد انك رسول الله۔

এরপর রাসূল (সা.) জিবরীল (আ.) কে বললেন, সালমান (রা.)-কে আপনি আরবী শিখিয়ে দিন। জিবরীল (আ.) বললেন, আপনি সালমানকে নির্দেশ দিন, তিনি যেন চক্ষু মুদিত করে মুখ খুলেন। নির্দেশ অনুযায়ী সালমান (রা.) অনুরূপ করলে জিবরীল (আ.) তাঁর মুখের লালা সালমান (রা.)-এর মুখে দিলেন। এরপর থেকে হযরত সালমান (রা.) বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, হযরত সালমান (রা.) হাদিয়ার বস্তু কোথা হতে নিয়েছিলেন? আল্লামা সুহাইলী (র.)-এর বর্ণনা মতে তা তিনি তাঁর সায়্যিদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। সায়্যিদা হতে পারেন তাঁর মালিকের স্ত্রী, অথবা স্বয়ং মালিক বা তাঁর খরিদ্দার। দু'ধরনের বর্ণনাই বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, তিনি কাঠ বিক্রি করে হাদিয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, হযরত সালমান (রা.) বলেন-

جئت بمائدة عليها بط۔ وفى رواية عليها رطب۔ وفى رواية خبز ولحم۔

অর্থাৎ আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে একটি খাঞ্চা নিয়ে এসেছিলাম, যার উপরে ছিল একটি হাঁস। অন্য বর্ণনায় আছে সতেজ খেজুর। কোন কোন বর্ণনায় রুটি ও গোশতের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ সব বর্ণনার মধ্যে সমতা বিধান এভাবে করা যায় যে, হযরত সালমান (রা.) কাঠ বিক্রি করে গোশ্ত ও রুটি ক্রয় করেন এবং তাঁর মালিকের কাছ থেকে খেজুর নিয়ে যান। এটি ছিল প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন কেবল খেজুরই নিয়ে যান। এ ব্যাখ্যা দ্বারা সকল বর্ণনার মধ্যে সমতা বিধান সম্ভব।

হযরত সালমান (রা.)-এর দাসত্ব জীবনেই বদর ও উহুদ-এর সশস্ত্র জিহাদ শেষ হয়ে যায়। এক দিন মহানবী (সা.) বললেন, সালমান! তুমি তোমার মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ مكاتب হয়ে যাও। হযরত সালমান (রা.) বলেন, আমি আমার মালিকের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে সে বলে, তাকে ৪০ আওকিয়া স্বর্ণ দিতে হবে এবং তিন শত, কোন কোন বর্ণনা মতে পাঁচ শত- ছোট খেজুর গাছ রোপণ করে দিতে হবে। এসব খেজুর গাছে খেজুর ধরলে আমি আযাদ হব। আমি এটা মহানবী (সা.)-কে অবগত করলে তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মুসলমানগণ। তোমরা তোমাদের ভাই সালমানকে খেজুরের চারা দিয়ে সাহায্য কর। ইহা শুনে সাহাবীগণ দৌড়ে গিয়ে নিজ নিজ বাড়ী থেকে খেজুরের চারা নিয়ে আসেন। গণনা করে দেখা গেল, ৩০০টি হয়েছে। রাসূল (সা.) আমাকে নির্দেশ দিলেন, সালমান! তুমি এ গাছের জন্য ৩০০ গর্ত খুঁড়ে আমাকে বলবে। আমি বৃক্ষগুলো আমার হাতে গর্তে রাখব। এরপর তুমি তাতে মাটি ঢেলে দেবে। আমি গিয়ে গর্ত খনন করতে লাগলাম এবং সাহাবায়ে কিরাম আমাকে সাহায্য করতে থাকলেন। সকল গর্ত খনন করে নিলে মহানবী (সা.)-কে জানালাম। তিনি তশরীফ নিয়ে নিজ হাতে গর্তের মধ্যে গাছগুলো রাখলেন। (এ গাছগুলোর একটিও মারা যায়নি)। রাসূল (সা.) সাহাবীগণের উদ্দেশে বললেন, হে মুসলমানগণ! এবার তোমরা তোমাদের ভাই সালমানকে সোনা দিয়ে সাহায্য কর। সাহাবায়ে কিরাম

Scanned with CamScanner

দৌড়ে নিজ নিজ বাড়ী হতে ছোট ছোট অলংকার নিয়ে এসে মহানবী (সা.)-এর সামনে রাখলেন। রাসূল (সা.) তা সালমানের হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো গলিয়ে একটি গোলক তৈরী কর। গোলক করার পর তা একটি মোরগের ডিমের মত হল। অন্য এক বর্ণনা মতে কবুতরের ডিমের আকৃতির মত হল। দু'বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য হল কবুতর ও মুগরীর ডিমের মধ্যবর্তী সাইজের হয়েছিল। সালমান (রা.) তা মহানবী (সা.)-এর হাতে দিলেন। মহানবী (সা.) তা আবার সালমান (রা.)-এর হাতে দিয়ে বললেন, যাও, এটা ওযন কর। হযরত সালমান (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), এ সোনা পরিমাণ মত হবে না।

রাসূল (সা.) ঐ স্বর্ণখন্ড হাতে নিয়ে তাতে কিছু থুথু মুবারক লাগিয়ে দিলেন। এরপর তা থেকে এক খন্ড ওযন করেই ৪০ আওকিয়া হয়ে গেল। অর্ধেক স্বর্ণ সালমানের হাতে রয়ে গেল। এক বছর যেতেই সকল খেজুর বৃক্ষে ফল ধরল। হযরত সালমান (রা.) আযাদ হয়ে গেলেন। এদের মধ্যে দু'একটি গাছে ফল ধরে নাই। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কে রোপণ করেছিল? তিনি জবাব দিলেন, উমর (রা.)। মহানবী (সা.) তা উপড়ে নিয়ে পুনরায় লাগিয়ে দিলেন। এর পর কয়েক দিনের মধ্যেই তাতে ফল ধরল। কোন বর্ণনায় আছে, ঐ গাছগুলো সালমান (রা.) লাগিয়েছিলেন। হতে পারে তাঁরা দুজনই একের পর অন্যজন লাগিয়েছিলেন। এই ঘটনা সীরাতে ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী লিখিত। ইমাম হলবী (র.) বলেন, স্বর্ণ সাহাবায়ে কিরাম প্রদান করেন নি ; বরং নবী (সা.) নিজে কোন এক খনি হতে এনেছিলেন। অধিকাংশ বর্ণনা ইবনে হিশাম এর বর্ণনার অনুরূপ হতে পারে হলবীর বর্ণনাকারী স্বর্ণ জমা করার পদ্ধতি সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। এ কথার উপর ইজমা সংগঠিত হয়েছে যে, হযরত সালমান (রা.) ২৫০ বছর জীবিত ছিলেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, হযরত সালমান (রা.) বদর ও উহুদ এর সশস্ত্র জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি নিজে বলেন, তিনি প্রথমে খন্দক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। দুই বর্ণনার সামঞ্জস্যের পথ হল, তিনি মুকাতব অবস্থায় বদর ও উহুদ-এ অংশ নিয়েছিলেন এবং মুক্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর প্রথম খন্দক-এ অংশ নিয়েছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি মাতৃগর্ভে থাকা কালে আমার মাতা উম্মুল ফযল (রা.) রাসূল (সা.) এর সামন দিয়ে গেলেন। মহানবী (সা.) বললেন, তোমার গর্ভে এক ছেলে আছে। সে জন্ম নিলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। অতঃপর যখন আমার জন্ম হল, আমার মাতা আমাকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। রাসূল (সা.) আমার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিলেন, তাঁর চর্বিত বস্তু আমাকে খাওয়ালেন এবং নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, যখন ওফদে আবদুল কয়েস মদীনায় এল, তখন রাসূল (সা.) বললেন, তোমাদের মধ্য হতে কে কয়েস বিন সাঈদা আবাদীকে চেন? সবাই জবাব দিলেন, আমরা সবাই তাঁকে চিনি। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা.) জারুদকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে কে ওফদে আবদুল কায়েস এর কায়েসকে চেন? জারুদ জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমাদের সবাই কয়েসকে চিনি, তিনি আরবের বংশধর ছিলেন। মামরের উস্তাদ ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল সাত শ' বছর। কেউ বলেন, তাঁর বয়স ছিল ছয় শ' বছর। তিনি হাওয়ারীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সামআনকে পেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম আরব

যিনি পূজা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতে রত হন। তিনিই সর্বপ্রথম اما بعد শব্দ ব্যবহার করেন। তিনিই প্রথম البينة على المدعى والحلف على من انكر এর বিধান জারী করেন। রাসূল (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, তাঁর ভাষণ আমার স্মরণ ছিল; কিন্তু এখন তা ভুলে গেছি। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), তাঁর ভাষণ আমার স্মরণ আছে, তখন তিনি উকাযের বাজারে লাল রং-এর উটের উপর আরোহণ করে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এর পর তিনি সেই ভাষণটি বর্ণনা করলেন, সে ভাষণের কয়েকটি কথা ছিল নিম্নরূপ ঃ

اقسم قسما حاتم + لا خسافيه ولا اثما۔ ان الله دينا هو احب اليه من دينكم۔ الذى انتم عليه۔ ونبيا قد حان حينه۔ والكم زمانه۔ فطوبى لمن وفق به فهداه۔ وويل لمن خالفه فعصه۔ الخ

"আমি দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলছি যাতে নেই কোন অর্গল এবং নেই কোন অপরাধ। নিশ্চয়ই আল্লাহর একটি ধর্ম রয়েছে, যা তাঁর কাছে তোমাদের ধর্মের চেয়ে বেশী প্রিয়। তাঁর একজন নবী রয়েছেন, যাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তাঁর আবির্ভাবের সময় তোমরা পেয়ে গেছ। যে তাঁর ধর্মের অনুসরণ করবে, তার জন্য কতই না আনন্দের বিষয়, সে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। অপর দিকে যে তাঁর বিরোধিতা করবে, তার ধ্বংস অনিবার্য।"

এ বর্ণনা প্রসঙ্গে হাফিয ইবনে হজর ও ইবনে কাসীর (র.) বলেন, যদিও উপরুক্ত বর্ণনায় দুর্বলতা (ضعف) রয়েছে, তবুও তা বিভিন্ন বর্ণনায় আসার কারণে গ্রহণযোগ্যতার স্তরে পৌঁছে গেছে।

নাফে জুরাশী হুমায়রী বর্ণনা করেন, ইয়ামনের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জ্যোতিষী ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়লে তারা সবাই একত্রিত হয়ে পাহাড়ের পাদদেশে ঐ জ্যোতিষীর কাছে এল। অপেক্ষা করতে করতে সূর্যোদয়ের পর তিনি নির্ধারিত স্থানে এলেন এবং ধনুকের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। দীর্ঘক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন-

ايها الناس ان الله اكرم محمدا واصطفاه۔ وطهر قلبه وحشاه ومكنه فيكم ايها الناس قليل۔

হে লোকসকল! নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্মানিত ও মনোনীত করেছেন এবং তাঁর অন্তরকে পবিত্র করেছেন। তাঁকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। হে মানব সম্প্রদায়, তাঁর অবস্থান তোমাদের মধ্যে খুব কম সময়ের জন্য হবে। সাওয়াদ বিন আকারীব বলেন, এক জীন আমার অনুগত ছিল। একদিন আমি ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থায় আছি, এমন সময় ঐ জীন পা দিয়ে আমাকে আঘাত করে বলল, হে সাওয়াদ বিন আরকম! উঠো, আমার কথা শুনো এবং বুঝো। নিঃসন্দেহে লুয়াই বিন গালীবের বংশে নবী প্রেরিত হয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আহ্বান করছেন। আমি বললাম, আমাকে শুয়ে থাকতে দাও। আমি শুয়ে থাকলাম। এবং সে তিন বার অনুরূপ বলল। আমি মনে করলাম, এটা আমার আত্মিক পরীক্ষা। আমি উটনীর উপর আরোহণ করে মদীনা শরীফে- ইমাম বায়হাকী (র.)-এর বর্ণনা মতে- মক্কা শরীফ এলাম। তখন লোকজন মহানবী (সা.)-কে ঘিরে রেখেছিলেন, এক বর্ণনায় আছে তাকে কেশের ন্যায় ঢেকে রেখেছিলেন। রাসূল (সা.) আমাকে দেখে বললেন, স্বাগতম হে সাওয়াদ বিন কারীব! আমি জানি, তুমি কেন এসেছ। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), আমার ঘটনাটি আপনাকে শুনাই। তিনি

Scanned with CamScanner

বললেন, শুনাও। আমি কবিতার ভাষায় বললাম-

اتانى ربى بعد ليل وهجعة+ ولم يك فيما قد تلوت بكاذب۔
ثلث ليال قوله كل ليلة + اتاك رسول من لوى بن غالب۔

অর্থাৎ রাতে আমি নিদ্রা যাওয়ার পর আমার কাছে কে যেন আসে। আমি যা বলছি, তাতে আমি মিথ্যাবাদী নই। তিন রাত্রি অনুরূপ ঘটে। তিন রাতেই আওয়াজ হয়। লুয়াই বিন গালীবের বংশে তোমার কাছে নবী এসেছেন।

এরপর আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করলাম এবং এই কবিতা পাঠ করে ঈমান আনলাম

فاشهد ان الله لارب غيره + وانك مأمون على كل غائب۔
وانك اولى المرسلين وسيلة+الى الله يابن الاكرمين الاطائب۔
فمرنا بمايأتيك ياخير مرسل+وان كان فيما جاء شيب الذوائب۔
وكن لى شفيعا يوم لا ذوشفاعة+سواك لمغن عن سوادبن قارب۔

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন রব নেই। আপনি সকল অদৃশ্য সম্পর্কে নিরাপদ (অবগত)। আল্লাহ্‌র কাছে ওসীলা গ্রহণের জন্য সকল রাসূলগণের চেয়ে আপনিই উত্তম। হে পবিত্র ও সম্মানিত লোকের বংশধর। হে সর্বোত্তম রাসূল। আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তা সম্পর্কে আমাদেরকে নির্দেশ দিন। .....

যে দিন কোন সুপারিশকারী থাকবেন না, তখন আপনি আমার সুপারিশকারী হবেন।

মহানবী (সা.) ও সাহাবীগণ এটা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। এমনকি আনন্দের চিহ্ন মহানবী (সা.)-এর চেহারা মুবারকে ফুটে উঠল। তাঁর মৃদু হাসির ফলে তাঁর দাঁত মুবারক বের হয়েছিল। মহানবী (সা.) বললেন- افلحت ياسواد

আব্বাস বিন মুরাদিসের ঘটনা

মুরাদিসের ضمار নামক এক দেবতা ছিল। মুরাদিস মৃত্যুর সময় তার ছেলে আব্বাসকে বলে গেল; তুমি ضمار এর পূজা করবে। এটা তোমার উপকার করবে। এক দিন সে যামার এর পাশে ছিল, এমন সময় দেবতার পেট থেকে আওয়াজ এল-

قل للقبائل من قريش كلها+هلك الضمار وفاز اهل المسجد الخ -

"তুমি কুরাইশদের সকল গোত্রকে বলে দাও, যামারে ধ্বংস হয়ে গেছে। আহলে মসজিদ (মুসলমানগণ) সফল হয়েছে। যামার নিপাত গিয়েছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার পূজা করা হয়েছে নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি সালাত পেশ করার পূর্বে (অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে) এবং মরিয়ম-পুত্রের (ঈসা আ.-এর) পরে। তিনি কুরাইশ বংশ হতে এসেছেন। আর তিনি সৎপথ প্রাপ্ত।

আব্বাস বলেন, আমি আমার কওম বনী হারিসাকে সাথে নিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। রাসূল (সা.) আমাকে দেখে হেসে বললেন, আব্বাস, তুমি ইসলামের দিকে কিভাবে এলে? আমি তাঁকে ঘটনা বর্ণনা করলাম।

মাযিন বিন গাসুনা বলেন, আমি আম্মানে এক দেবতার খাদিম ছিলাম। তার নাম ছিল 'মাদির ইয়াসির'। আমি একদিন তার সামনে পূজা পেশ করলাম। তখন মূর্তির অভ্যন্তর হতে একটি আওয়াজ এল, যার বিষয়বস্তু হল, হে মাযিন, শুন তা হলে আনন্দিত হবে। কল্যাণ প্রকাশিত হয়েছে। মন্দ ঢাকা পড়েছে। মহান আল্লাহর ধর্ম নিয়ে মুদর গোত্রে নবী প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং পাথরের উপাসনা পরিত্যাগ কর,

তা হলে জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড (সাকার) হতে নিরাপদ থাকবে। এ আওয়াজ শুনে আমি খুবই চিন্তিত হলাম। এরপর আরেক বার পূজা দিলাম। তখন আওয়াজ এল

اقبل الى اقبل+تسمع ما لا تجهل۔الخ

"আমার দিকে এস, আমার কথা শুন। তুমি শুনো। এটা আর অজ্ঞতা নয় যে, ইনি হচ্ছেন আল্লাহ প্রেরিত রাসূল। সত্য অবতীর্ণ হয়েছে। ঈমান গ্রহণ কর। তা হলে উত্তপ্ত অগ্নিশিখা হতে রক্ষা পাবে, যার ইন্ধন হচ্ছে বড় বড় পাথর।" আমি তা শুনে এত সন্দেহে পতিত হলাম যে, এক লোক হিজায থেকে এলে। আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে জবাব দিল, আমাদের এখানে এক লোক আর্বিভূত হয়েছেন, যার নাম আহমদ (সা.)। তাঁর কাছে যে আসে, তাকেই তিনি বলেন। اجيبوا داعى الله (আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে তোমরা সাড়া দাও।) আমি বুঝলাম, ইনিই সেই লোক যাঁর সুসংবাদ আমাকে দেয়া হয়েছে। তখন আমি ঐ মূর্তিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলাম এবং রাসূল (সা.) এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। এ হাদীসকে হাফিযে হাদীসগণ ضعيف বলেছেন।

ইমাম হলবী (র.) হযরত উমর (রা.) হতে এক বর্ণনা উপস্থাপন করেন হযরত উমর (রা.) বলেছেন, একদিন আমি কুরাইশদের এক গোত্রের কাছে বসা ছিলাম। তাকে আলে যুরাইহ বলা হত। এমন সময় একটি গো-বৎস যবেহ করা হল। তখন আমি সেই যবেহ কৃত গরুর পেট থেকে আওয়াজ বের হতে শুনলাম।

يا ال زريح امر نجيح صائح يصبح بلسان فصيح يشهد ان لا اله الا الله

"হে আলে যুরাইহ। একটি সফল সংবাদ এসেছে। এক আহ্বানকারী বিশুদ্ধ ভাষায় আহ্বান করছেন। তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।"

যুরাইহ দ্বারা এখানে যবেহ কৃত গরুর বাচ্চাকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আওয়াজ এসেছিল এভাবে-

يا جليح۔امر نجيح رجل فصيح يقول لا اله الله এবং جليح দ্বারা চামড়া ছাড়ানো যবেহ কৃত গরুর বাচ্চাকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লামা ইবনে খালদুন ঘটনাটি এভাবে লিখেন- হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি একদিন আসাফ ও নায়েলার সামনে বসেছিলাম। তখন এক লোক কুরবানীর জন্য একটি উট নিয়ে এলেন। এমন সময় মূর্তির পেট হতে এক প্রকার আওয়াজ বের হয়েছিল, যেভাবে ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন। একবার আওয়াজ শুনে সবাই পলায়ন করলো। কিন্তু আমি সাহস করে বসে থাকলাম। আমি তিন বার এরূপ আওয়াজ শুনলাম। তিনি জলীহ বলতে 'কুরবানীদাতা লোকটি' অর্থ নিয়েছেন। দু' বর্ণনায় সামঞ্জস্য এরূপ হতে পারে। এরূপ ঘটনা দু'বার দু'স্থানে ঘটেছে। আরও একটি অদৃশ্য আওয়াজের ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), আমি আমার উট খুঁজছিলাম। শেষ রাতে এক গায়িবী আওয়াজ শুনলাম।

يا ايها الراقد فى الليل الاحم+قد بعث الله نبيا فى الحرم۔

হে নিশীথে ঘুমন্ত লোকসকল! (জেনে রাখ) আল্লাহ তায়ালা হরম শরীফে একজন নবী প্রেরণ করেছেন।

'দালাইলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে রয়েছে, হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর কন্যা উম্মুল

Scanned with CamScanner

মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়িশা! রাসূল (সা.) তোমাকে কোন দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন কি? হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) এই দুআ তাঁর অনুসারীদের শিখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যদি কোন লোকের এই পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকে, তবে এই দুআর বরকতে আল্লাহ তায়ালা তা আদায় করিয়ে দেবেন। দুআ হল-

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ۔ رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنِىْ فَارْحَمْنِىْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ۔

হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন : আমার অনেক ঋণ ছিল। আমি এই দুআ পড়তে শুরু করলাম। সামান্য দিনের মধ্যে সকল ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল।

হযরত তমীম দারী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত তমীম দারী (রা.) বলেন, আমি সিরিয়ায় ভ্রমণে ছিলাম। এমন সময় মহানবী (সা.) নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন। একদিন আমি কিছু কাজে বাইরে বের হলাম। বাইরেই রাত হয়ে গেল। আমি বললাম, "আমি এই উপত্যকার মালিকের তত্ত্বাবধানে আছি।' এই বলেই আমি শুয়ে পড়লাম।

আকস্মাৎ একটি আওয়াজ শুনলাম, "তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, কারণ জিন আল্লাহর বিপরীতে কাউকে মুক্তি দিতে পারেনা।" আমি বললাম, কি বলছ? তখন আওয়াজ হল, "উম্মীগণের রাসূল বের হয়েছেন। আমরা হুজুন নামক স্থানে তাঁর পিছনে নামায পড়েছি। আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। জিনরা উর্ধ্বে আরোহন করেছিল তাদেরকে তারকা দ্বারা তাড়ানো হয়েছে। সুতরাং তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যাও এবং ইসলাম গ্রহণ কর।" সকাল হলে আমি দায়রে আইয়ূব নামক স্থানে গেলাম এবং সেখানকার পাদ্রীর কাছে ঘটনা বললাম। পাদ্রী বললেন, সে তোমাকে ঠিকই বলেছে। আমাদের কিতাবে আমরা তাঁর উল্লেখ পেয়েছি। তিনি সর্বোত্তম নবী। এক হরম মক্কা শরীফ হতে বের হয়ে অন্য হরম মদীনা শরীফে হিজরত করবেন। ইহা শুনে আমি তাৎক্ষনিক বাহন ঠিক করে রাসূল (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে মুসলমান হয়ে গেলাম।' এ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মক্কা শরীফে ঈমান এনেছেন। কেউ কেউ বলেন, তামীম দারী (রা.) ৯ম হিজরীতে মদীনা শরীফ গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। দুই বর্ণনার সামঞ্জস্য এভাবে সম্ভব যে, তিনি মক্কায়ই মুসলমান হয়েছিলেন কিন্তু তখন ভয় থাকার কারণে রাসূল (সা.) তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মদীনা শরীফে রাসূল (সা.)-এর খিদমতে হাযির হন। এ ঘটনা আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা মহানবী (সা.) কে অবগত করেন।

وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا۔

কতিপয় মানুষ জিনের আশ্রয় নিত। ফলে তারা নিজদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (জিন-৬)

ওয়াইল বিন হজর হাদরামীর ঘটনা

তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু হিন্দাহ। তিনি হাদরামাউতের অধিবাসী ছিলেন, তাঁর পিতা সেখানকার বাদশাহ ছিলেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর সাথে দেখা করার জন্য রওয়ানা দিলেন। এদিকে তিনি এসে পৌছার তিন দিন পূর্বে রাসূল (সা.) তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিলেন। "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বতে অনেক দূর হাদরামাউত হতে

ওয়াইল বিন হজর আসছেন। তিনি রাজ পরিবারের লোক। ওয়াইল বিন হজর (রা.) বলেন, আমি মদীনায় পৌছে এমন কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ করিনি যিনি এ কথা আমাকে বলেননি, "তোমার আগমনের সংবাদ রাসূল (সা.) তিন দিন পূর্বে আমাদেরকে দিয়েছেন।" আমি দরবারে আকদ্দসে পৌছলে তিনি আমাকে মারহাবা বলে কাছে ডাকলেন। নিজের চাদর মুবারক বিছিয়ে তাতে আমাকে বসতে বললেন এবং দু'আ করলেন- "হে আল্লাহ আপনি ওয়াইল বিন হজর, তাঁর সন্তান ও সন্তানের সন্তানকে বরকত দিন।" এরপর রাসূল (সা.) মিম্বর শরীফে আরোহন করে আমাকে সামনে খাড়া করে বললেন- "হে লোক সকল! এই ওয়াইল বিন হজর অনেক দূর হাদরামাউত হতে ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়ে এসেছেন।" আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), আমার বিরাট রাজত্ব ছিল, যখন আমার কাছে রিসালতের সংবাদ পৌছল তখন, আমি দীনকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্য সব কিছু পরিত্যাগ করে এখানে এসেছি। রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন- "তুমি ঠিক বলছ। হে আল্লাহ্ আপনি ওয়াইল বিন হজর, তার সন্তান ও সন্তানের সন্তানকে বরকত দান করুন।" এরপর আমি বললাম- আপনার খিদমতে আমার আসার কারণ হল- আমার কাছে আকীকের তৈরী এক দেবতা ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরের সময় আমি শোয়া ছিলাম। আকস্মাৎ দেবতার ঘর হতে এর বিকট আওয়াজ শোনা গেল। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে দেবতার সামনে সিজদার পতিত হলাম। তখন আওয়াজ শুনলাম। "আশ্চর্য ওয়াইল বিন হজর! মনে করা হয় তিনি জানেন। আসলে তিনি জানেন না। পাথরে তৈরী মূর্তি হতে কি আশা করা যেতে পারে। এটা কোন উপকারও করতে পারে না, অপকারও না। যদি তা হত, তাহলে আমার নির্দেশের অনুসরণ করত।" আমি বললাম, হে অদৃশ্য উপদেশকারী, আমাকে কি নির্দেশ দিচ্ছ? আওয়াজ আসল- "খেজুর বৃক্ষ সমৃদ্ধ ইয়াসরিবে যাও, রোজাদার ও নামাযীদের ধর্ম অনুসরন কর। যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন সর্বোত্তম নবী মুহাম্মদ (সা.)!" এই বলে দেবতা পড়ে গেল এবং এর ঘাড় ভেঙ্গে গেল। আমি এটাকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে তাড়াতাড়ি বের হলাম এবং মদীনা শরীফ পৌছলাম।

মহানবী (সা.)-এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলাও একটি

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, এক রাখাল উপত্যকায় ছাগল চরাত। একদিন এক বাঘ এসে তার ছাগলকে আক্রমণ করল। রাখাল বাঘের আক্রমণ প্রতিহত করল। এরপর বাঘ তার নিতম্বের উপর বসে রাখালকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল হে রাখাল, তুমি কি আল্লাহকে ভয় করনা? আল্লাহ আমাকে রিযিক দিয়েছেন, আর তুমি আমাকে তা থেকে বাঁধা দিচ্ছ। রাখাল বলল, আশ্চর্যের কথা, বাঘ আমার সাথে মানুষের মত কথা বলছে। জবাবে বাঘ বলল, এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা আমি তোমাকে বলব। দুই পাহাড়ের মধ্যখানে রাসূল (সা.) এসেছেন। অন্য এক বর্ণনায় দুই পাহাড়ের পরিবর্তে ইয়াসরিব শব্দের উল্লেখ আছে। তিনি অতীত বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন। অন্য বর্ননায় আছে, তিনি অতীতের সংবাদ ও তোমাদের পরে যা ঘটবে এসব সংবাদ প্রদান করেন।" ইহা শুনে রাখাল ছাগল হাঁকিয়ে মদীনা শরীফ রাসূল (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ননা করলেন। রাসূল (সা.) বললেন, রাখাল ঠিক বলেছে। কিয়ামতের এক নিদর্শন হল চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা। মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ যার হাতে, তাঁর শপথ, কিয়ামত সংঘঠিত হবেনা যতক্ষণ না মানুষ তার জুতোর ফিতা ও লাঠির সাথে কথা বলবে। এগুলোর তার পারিবারিক বিষয়ে সংবাদ দিবে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে এরপর রাসূল (সা.) আযানের নির্দেশ দিলেন। আযান দেয়া

Scanned with CamScanner

হল। তিনি বের হয়ে বেদুইন লোকটিকে বললেন, তুমি তাদেরকে বিষয়টির সংবাদ দাও। যে সকলকে এ সংবাদ দিল। অন্য এক বর্ণনায় আছে- বাঘ রাখালকে বলেছিল, তুমি তো আমার চেয়ে আরও আশ্চর্যজনক কাজ করছ। তুমি নবীকে পরিত্যাগ করে ছাগলের কাছে অবস্থান করছ, যে নবীর চেয়ে সম্মানী কাউকে আল্লাহ প্রেরণ করেননি। তাঁর জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। তাঁর সাথীরা এর অধিবাসী হওয়ার মর্যাদা লাভ করবেন। তোমার মাঝে আর তাঁর মাঝে দুরত্ব কেবল ঐ উপত্যকা। তাহলেই তুমি আল্লাহর সৈনিক হয়ে যেতে পার। রাখাল বলল- আমার ছাগল কি করব? বাঘ বলল, তুমি ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি এগুলো দেখাশুনা করব। রাখাল ছাগলগুলো বাঘের কাছে রেখে রাসূল (সা.)-এর খিদমতে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূল (সা.) বললেন- তোমার ছাগলের কাছে যাও। এগুলো পরিপূর্ণ পাবে। তিনি ফিরে এসে তাই পেলেন এবং একটি ছাগল জবেহ করে বাঘকে দিলেন।

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর এর বর্ণনা হতে জানা যায়, এ ঘটনা হিজরতের পরে হয়েছিল। النور গ্রন্থকার বলেন, ঐ রাখালের নাম আমি জানি না। তিনি আরও বলেন, বাঘ একাধিকবার কথা বলেছে।

حياة الحيوان গ্রন্থে ইবনে আব্দুল বার হতে বর্ণিত আছে- তিনজন সাহাবীর সাথে বাঘ কথা বলেছে। (১) রাফে বিন উমায়রা (রা.), (২) সালমা বিন আকওয়া (রা.) (৩) ওহবান বিন আওস (রা.)। রাখালের এই হাদীস আল্লামা নিশাপুরী (রা.) স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।

গাছ কর্তৃক কথা বলা

হযরত আবু বকর (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নবুয়তের পূর্বে আপনি নবুয়তের কি দলীল দেখেছিলেন? আবু বকর (রা.) জবাব দিলেন, একদিন আমি একটি গাছের নিচে বসা ছিলাম। অকস্মাৎ গাছের ডাল নিচের দিকে ঝুঁকতে লাগল এবং আমার মাথা পর্যন্ত পৌছল। আমি অবাক হয়ে বলতে লাগলাম। এটা কি? গাছ জবাব দিল, এই নবী (সা.) এই সময়ে বের হবেন, আপনি তাঁর মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান লোক হয়ে যান।

তারকা পতন ও আঁড়িপেতে শোনা হতে জিনদের বিতাড়ন

ইবনে ইসহাক বলেন, মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর হতে জিনদের আঁড়িপেতে শোনা বন্ধ করে দেয়া হয়। তারা যেখানে বসে তা শুনত, সেই স্থান ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেয়া হয়। তারকা দিয়ে তাদেরকে ঢিল মারা হত। জিনগণ এর দ্বারা বুঝে নিল যে, এ ঘটনা আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার কল্যাণের জন্য হয়েছে। জিনগণ বাধ্যগ্রস্থ হয়ে যা বলেছিল আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে তা বর্ণনা করেন। وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. (الجن) আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড সম্মুখীন হয়। (জিন ঃ ৮-৯)

মুফাসসিরীনে কিরাম, বিশেষত ইমাম রাযী (রা.) বলেন, যখন জিনদের আঁড়ি পেতে শোনা বন্ধ করে দেয়া হল তখন তারা এ সংবাদ তাদের বাদশাহর কাছে দিল। বাদশাহর কাছে তাদের অভিযোগের বর্ণনা আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত আয়াতে করেছেন।

বিস্তারিত ঘটনা নিম্নরূপ : জিনগণ তাদের বাদশাহর কাছে অভিযোগ করল, আমরা প্রথম আসমানে গিয়ে চুপ করে বসে থেকে ফেরেশতাদের কথা শুনতাম এবং তা জ্যোতিষদের কাছে বলে দিতাম। এখন আমরা আকাশের নিকটবর্তী হলেই আগুন নিক্ষেপ করা হয়। আমরা বলতে পারছি না আসমানে কোন পরিবর্তন এসেছে, নাকি যমীনে? জিনের বাদশাহ বলল, আসমানে কোন পরিবর্তন আসেনা যতক্ষণ না যমীনে কোন পরিবর্তন আসে। তোমরা যাও এবং এর খোঁজ নাও। তারা বের হয়ে রাসূল (সা.) কে বতনে নাখলা নামক স্থানে পেল। তিনি তখন ফজরের নামায পড়ছিলেন। এক বর্ণনায় আছে তিনি সূরা দাহার পাঠ করছিলেন। জিনেরা কিরাত শুনে রাসূল (সা.)-এর নিকটবর্তী হল। যেমন কুরআন শরীফে আছে كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا তখন তারা তার নিকট ভিড় জমাল। (জিন ঃ ১৯)

জিনেরা কুরআন তিলাওয়াতের প্রভাবে মুসলমান হয়ে গেলেন। যেহেতু রাসূল (সা.) তখন নামাযরত ছিলেন, এ জন্য তিনি এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, পরে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানিয়ে দিলেন। "আপনি বলুন, আমার কাছে ওহী এসেছে জীনদের একটি দল মনযোগ দিয়ে (কুরআন তিলাওয়াত) শুনলেন, এরপর বললেন, আমরা আশ্চর্য তিলাওয়াত শুনেছি যা আমাদেরকে হেদায়াতের দিকে পথ দেখায়। এ জন্য আমরা ঈমান আনলাম। আমরা আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবনা। নিশ্চয় মহান আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ। তিনি কোন স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ করেননি। আমাদের মধ্যে নির্বোধরা আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব উক্তি করে। (জিন ঃ ১-৪)

ইসলাম গ্রহণকারী জিনদের সংখ্যা ছিল ১২ জন। অন্য এক বর্ণনায় আছে জিনেরা এই বলে অভিযোগ করেছিল, আমরা জানিনা যমীনবাসীর জন্য আল্লাহ কোন মন্দ ইচ্ছা করেছেন, নাকি কোন কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বর্ণনার পক্ষে দলীল পাওয়া আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী হতে وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا আমরা জানিনা জগৎবাসীর অমঙ্গল কামনা করা হয়েছে নাকি আল্লাহ তাদের মঙ্গল চান। (জিন ঃ ১০)

এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে জিনের বাদশাহ নিজ সৈন্যদেরকে এর অনুসন্ধানে পাঠাল। তারা হুজুন নামক স্থানে রাসূল (সা.) কে পেলেন। হুজুন মক্কা শরীফের এক গোরস্তানের নাম, যার নাম পরে মুআল্লা রাখা হয়। এখন দুই বর্ননার মধ্যে সমতা আনতে বলা হবে যে, হুজুন ও নাখলা পাশাপাশি দুটি স্থান। এখন যে জিন আসমানের সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে, সাথে সাথে নিক্ষিপ্ত তারকা দিয়ে তার মুখ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। যাতে এ সংবাদ জ্যোতিষ পর্যন্ত না পৌছে। কারণ এরূপ না হলে ওহী ও শয়তানের সংবাদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হত এবং দুর্বল জ্ঞানীগণ সন্দেহে পড়ে যেত। এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

"তবে যে কিছু অংশ ছুঁ মেরে নিয়ে যেত, নিক্ষিপ্ত তারকা তার অনুসরণ করত।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ঈসা (আ.)-এর আগমনের পর চতুর্থ আসমানের উপর জিনদের বিচরণ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তিনি রাসূল (সা.)-এর আগমনের সুসংবাদ দাতা ছিলন। আর মহানবী (সা.)-এর আগমনের পর সকল আসমানে তাদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়।

আবু লাহাব অথবা লুহাইব বিন মালিক হতে একটি বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার

Scanned with CamScanner

পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। استراق سمع হতে জিনরা বিতাড়িত হওয়ার সংবাদ আমিই সর্বপ্রথম অবগত হই। কারণ আমি একদিন জ্যোতিষ খতর বিন মালিক এর কাছে ছিলাম। সে তখন ২৮০ বছরের বৃদ্ধ ও সর্বাধিক জ্ঞানী জ্যোতিষ ছিল। আমি বললাম- খতর, আসমান হতে যে তারকা নিক্ষেপ করা হয় এ সম্পর্কে তোমার কি কোন জ্ঞান আছে। খতর বলল, আমরা তো এনিয়ে খুবই চিন্তিত। তুমি আগামীকাল ফজরের পূর্বে আসবে' আমি তোমাকে বলব। আমি ফিরে এসে পরের দিন নির্ধারিত সময়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সে দু পায়ে ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। আমি তাকে হে খতর, হে খতর বলে ডাকলাম, সে ইশারায় বলল, একটু থাম। আমি থামলাম, এমন সময় একটি বড় তারকা পতিত হল। সাথে সাথে জ্যোতিষ উচ্চ স্বরে চিৎকার দিতে লাগল

اصابه ـ اصابه ـ خامره عقابه عاجله عقابه احرقه شهابه زالله حوابه يارووله ماحلله بلبله بلباله عاوده حباله تقطعت حباله وغيرت احواله

"তাকে পেয়েছে, তাকে পেয়েছে, তাঁর শাস্তি তাকে বিধ্বস্থ করেছে। তাঁর আযাব তার কাছে অগ্রীম পৌচেছে। তাঁর তারকা তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার জবাব তাকে বিচ্যুত করেছে। আফসোস! তার কি অবস্থা কি হল? তার রশি ছিঁড়ে গেছে এবং তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে।"

এরপর অনেকক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল- "হে বনী কাহতান, আমি তোমাদেরকে সত্য ও স্পষ্ট বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছি। আমি কা'বা শরীফ ও এর খুঁটি সমূহের কসম করে বলছি, আরো শপথ করছি নিরাপদ এ শহরের। জিনরা আড়ি পেতে শোনা থেকে বিতাড়িত হয়েছে তারকা দ্বারা। তা হয়েছে একজন মহা মর্যাদাবান প্রেরিত রাসূলের কারণে। তিনি প্রেরিত হবেন আসমানী গ্রন্থ ফুরকান নিয়ে, হিদায়ত ও মর্যাদাপূর্ণ কুরআন নিয়ে। তাঁর মাধ্যমে মূর্তি পুজা বন্ধ হবে।"

এরপর আমি বলতে লাগলাম, হে খতর, তুমি অনেক বড় সংবাদ দিয়েছে। এখন তুমি তোমার সম্প্রদায়কে নিয়ে কি চিন্তা করেছ? তিনি জবাব দিলেন- "আমি নিজের জন্য যা চাই, আমার কাওমের জন্যও তা চাই, যদি তারা সর্বোত্তম মানুষের [নবী (সা.)]-এর অনুসরণ করে। তাঁর দলীল সমূহ সূর্যের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি মক্কায় প্রেরিত হয়েছেন কুরআনের বানী নিয়ে, যাতে কোন সন্দেহ নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে খতর, তিনি কে? তিনি জবাব দিলেন- "জীবন ও জিবীকার শপথ, তিনি কুরাইশ বংশের লোক। তার নির্দেশনায় সত্যদ্রোহীতা নেই, তাঁর চরিত্র কোন কদর্যতা নেই।"

আমি বললাম কুরাইশদের মধ্য হতে তিনি কে হবেন? জ্যোতিষ জবাব দিলেন মহিমান্বিত বায়তুল্লাহর শপথ, রুকন ও যমযমের শপথ, তিনি হাশিমী গোত্রে আসবেন। তিনি হবেন অভিজাত ও সম্মানিত বংশের লোক। এরপর বললেন- "এটাই হচ্ছে বিস্তারিত বিবরণ যা জিনের সর্দার আমাকে বলেছে। আল্লাহ্ মহান, সত্য এসেছে ও প্রকাশ লাভ করেছে। আর জিনদের খবর সংগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে। এই বলে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। তিন দিন পর তাঁর হুঁশ হলে তিনি বললেন لا الـه الا الله ইহা শুনে রাসূল (সা.) বললেন, সুবহানাল্লাহ, সে নবুয়তের বাণীর অনুকূলে কথা বলেছে। কিয়ামতের দিন সে একই উম্মতভূক্ত হয়ে উঠবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম (র.) একখানা হাদীস বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আনসারদের এক জামাত হতে বর্ণনা করেন তাঁরা বলেন, আমরা একদিন রাসূল

(সা.) এর সাথে বসা ছিলাম এ সময় একটি তারকা পতিত হয়ে চতুর্দিক আলোকিত করল। রাসূল (সা.) বললেন, জাহিলী যুগে যে তারকা নিক্ষিপ্ত হত, এ সম্পর্কে তোমরা কি বলে থাকতে? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), আমরা এটা দেখে বলতাম, একজন ফেরেশতা মারা গেছেন, একজন নবজাতক জন্ম নিয়েছেন। রাসূল (সা.) বললেন, এটা এজন্য হয় না; বরং আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি জগত সম্পর্কে যখন কোন সিদ্ধান্ত নিতেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তা অবগত হতেন। তখন তারা তাসবীহ পাঠ করতেন। তাঁদের তাসবীহ-এর আওয়াজ শুনে তাদের নিচের সকল ফেরেশতা তাসবীহ পাঠ করেন, তাদের শুনে এর নিচের ফেরেশতা, এভাবে সবশেষে প্রথম আসমানের ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। এরপর একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন কেন তাসবীহ পাঠ করলেন। তারা বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি জগত সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই সংবাদ ও ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রথম আসমানে পৌছে এবং সেখান থেকে আড়িপেতে বসে থাকা শয়তান তা সংগ্রহ করে এর সাথে অনেক কিছু সংযোজন করে জ্যোতিষদের কাছে বর্ণনা করত। এ কারণে তাদের কথা কখনো সত্য প্রমাণিত হত, আবার অনেক সময় মিথ্যা প্রমাণিত হত।

এই বর্ণনা হতে বুঝা যায়, ফাতরাতের যুগে জিনদের প্রতি তারকা নিক্ষেপ করা হত। কিন্তু হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর বর্ণনা এর বিপরীত।

মহানবী (সা.) কে জ্যোতিষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এদের কোন ভিত্তি নেই। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! তারা মাঝে মাঝে এমন সংবাদ পরিবেশন করে যা বাস্তব রূপ লাভ করে। রাসূল (সা.) বললেন, তা ঐ সমস্ত কথা যা জিনেরা ছুঁ মেরে নিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুদের কাছে বলে দেয়। তারা এর সাথে শতাধিক মিথ্যা সংযোজন করে প্রকাশ করে। এরপর আল্লাহ তায়ালা এই সকল তারকারাজি দ্বারা তাদেরকে দমন করেন। ফলে জ্যোতিষ বিদ্যা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর তা নেই।

বুখারী শরীফে আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, পৃথিবীতে ঘটবে এমন বিষয় নিয়ে ফেরেশতাগণ পারস্পরিক আলোচনা করেন। শয়তান তাদের কথাবার্তা শুনে জ্যোতিষদের কানে পৌছিয়ে দেয়। তারা এতে ১০০টি মিথ্যা সংযোজন করে।

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, ঈসা (আ.) এর আকাশে উত্তোলনের পূর্বে তারকা দিয়ে জিনদেরকে বিতাড়িত করা হত না। এরপর থেকে তাদের প্রতি তারকা নিক্ষেপ করা হয়। যখন কুরাইশরা এমন বিষয় দেখল যা তারা ইতিপূর্বে দেখেনি, তখন তারা ভীত হয়ে পড়ল। (আল হাদীস)

মুসলিম শরীফের হাদীস এ কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে যে, মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের পূর্বেও তারকা দ্বারা জিনদের বিতাড়িত করা হত।

পক্ষান্তরে হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর হাদীস হতে জানা যায় যে, রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতের পূর্বে তা হত। মুহাদ্দিসীনে কিরাম দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এভাবে যে, প্রত্যেক নবীর সময়েই জিনদেরকে বিতাড়িত করা হত। তা না হলে ওহী ও শয়তানের কথা পরস্পর মিশে যেত। তবে দুই নবীর মধ্যবর্তী যুগে জিনদেরকে আসমানের কথা শোনার অবকাশ দেয়া হত। এ বক্তব্যকে সমর্থন করে কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ـ (ملك ـ ٦)

"আর আমি দুনিয়ার আসমানকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি তারকারাজি দিয়ে এবং এগুলোকে করেছি

Scanned with CamScanner

শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ।"
অন্য আয়াতে আছে-
إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (صفات-٦)
আমি দুনিয়ার আসমানকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে।
এই তাওজীহ এর উপর মুফাসসিরীনে কিরাম একমত। এ জন্যই মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের শুরুতে যখন ওহী অবতরণ বন্ধ হয়ে যায়, এরপর আবার শুরু হয়, তখন কিছু লোকের মনে অস্বস্থি দেখা দিয়েছিল। রাসূল (সা.) এর যামানা হতে চিরকালের জন্য আঁড়িপেতে শোনা বন্ধ হয়ে যায়।
ইবনে ইসহাক মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হতে আঁড়ি পেতে শোনার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর রিওয়ায়তও ইহার সমর্থন করে। ইহাই গ্রহণযোগ্য।
একটি প্রশ্ন আসে যে, শয়তানের প্রতি তারকা ছুঁড়া হত না অন্য কিছু? এর জবাব কুরআনে রয়েছে "فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ"
شهاب 'জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে' বলা হয় আগুনের কুন্ডলীকে যা তারকা হতে বিচ্ছিন্ন হয়। এ কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, তারকারাজি ঝাড়বাতির ন্যায় আকাশে ঝোলানো যেমনিভাবে মসজিদে বাতি ঝোলানো থাকে। এগুলো নূর দিয়ে তৈরী।

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে মহানবী (সা.)-এর নাম

মহানবী (সা.)-এর নাম, সীফত ও তাঁর উম্মতগণের যে সকল বিশেষন পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে রয়েছে এগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।
ইমাম সবকউ (র.) বলেন, "সকল আসমানী কিতাবেই আপনার প্রশংসা এসেছে। এটা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন জাতির পর জাতি।"
অন্য এক কবিতায় বলেন, من قبل مبعثه جائت مبشرة + به زبور وتوراة وانجيل
"তাঁর আগমণের পূর্বেই তার সুসংবাদ নিয়ে এসেছে যাবুর, তাওরাত ও ইনজীল।"
ইমাম সবকী (র.) এ কথার উপর দলীল প্রদান করেন নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ 'এটা পূর্ববর্তী যাবুরে উল্লেখ রয়েছে।'
হাদীস শরীফে এসেছে মহানবী (সা.)-এর নাম তাওরাতে 'আহমদ' বলে উল্লেখ রয়েছে।
وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ এর শানে নুযূলে লিখিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম তাঁর দুই ভাতিজা মাসলামা ও মুহাজিরকে বললেন, তোমরা জান, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব তওরাতে বলেছেন, আমি ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করব, যাঁর নাম হবে আহমদ। যে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, সে সৎ পথ পাবে আর যে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না, সে লানতপ্রাপ্ত হবে। এটা শুনে হযরত মাসলামা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন; কিন্তু মুহাজির মুসলমান হল না। তাকে উপলক্ষ করেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।
তওরাতে মহানবী (সা.) এর নিম্নবর্ণিত নামও উল্লিখিত রয়েছে। মুহাম্মদ (সা.) হিময়াতা, অর্থাৎ হরম শরীফকে নিষিদ্ধ কাজ হতে রক্ষা করবেন। قدميا অর্থাৎ অগ্রগামী। يندايندا حيد অর্থাৎ উম্মতদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষাকারী طاب طاب অর্থাৎ পবিত্র। কাযী আয়ায (র.) তাঁর শিফা গ্রন্থে বলেন, তওরাতে তাঁর নাম হাবীবুর রহমান বলে উল্লেখ আছে এবং তাঁর গুণবাচক নাম ضحوك তথা পুণ্যাত্মা বলা

হয়েছে। এও উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ। তাঁর জন্মস্থান হল মক্কা, হিজরতের স্থান হল তাবা এবং তাঁর রাজত্ব হবে শামে। তওরাত শব্দটি যদি আরবী হয়, তা হলে অর্থ হবে 'ইঙ্গিতের মাধ্যমে রহস্য গোপন করা।' কারণ তওরাতের অধিকাংশই অস্পষ্ট ইঙ্গিত।
ইনযীলে মহানবী (সা.)-এর নাম লেখা হয়েছে- مخما -সুরইয়ানী ভাষার এ শব্দের অর্থ ও মুহাম্মদ।
দালাইলুন নবুওয়াতে উল্লেখ আছে, হযরত খায়সামা (রা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস হযরত সহল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এতীম ছিলাম। আমি আমার চাচার কাছে থাকতাম। একদিন আমি তওরাত কিতাব বের করে পড়তে আরম্ভ করলাম। তাতে একটি পাতা দেখলাম চামড়া দিয়ে মোড়ানো। আমি সেই পাতাটি খুলে দেখলাম, তাতে মহানবী (সা.)-এর গুণাবলী লিখিত আছে। যখন আমার চাচা এলেন, এই পাতাটি খোলা দেখে আমাকে প্রহার করলেন এবং বললেন, তুমি কেন এই পাতাটি খুলে পড়েছ? আমি বললাম, তাতে নবী আহমদ (সা.)-এর গুণাবলী লিখিত আছে। তিনি জবাব দিলেন, ঐ নবী এখনো আসেননি।
ইনযীলে উল্লেখ আছে তাঁর নাম হবে حسنطا (হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী)। তাঁর উপাধি বলা হয়েছে صاحب الدرع অর্থাৎ বর্মধারী। আরও বলা হয়েছে, তিনি গাধা ও খচ্চরে আরোহণ করবেন। অচিরেই প্রশ্ন আসবে, গাধায় আরোহণকারী হচ্ছেন ঈসা (আ.) এবং উটের হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা.)। তখন জবাব আসবে, ইনযীলে আছে, যদি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দাও, তা হলে আমার নির্দেশগুলোকে সংরক্ষণ করবে। আমি আমার রবের কাছে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করব। তিনি তোমাদের জন্য বারকালিতকে প্রেরণ করবেন। আমি যতক্ষণ না চলে যাব, ততক্ষণ 'বারকালিত' আসবেন না। তিনি এলে বিশ্ববাসীকে পাপাচারের কারণে তিরস্কার করবেন। তিনি নিজের পক্ষ হতে কিছু বলবেন না। তিনি (আল্লাহর পক্ষ হতে) যা শুনবেন তা নিয়েই তাদের সাথে কথা বলবেন। তাদেরকে দারিদ্রক্লিষ্টতা হতে সত্য দিয়ে সৌন্দর্য মন্ডিত করবেন। নতুন ও অদৃশ্য ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি তাদেরকে সংবাদ প্রদান করবেন। উল্লেখ্য, অভিনব ও গায়েব সম্পর্কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সংবাদ প্রদান করেছিলেন। এবং بارقليط অথবা فارقليط শব্দের অর্থ হাকীম ও রাসূল।
ইনযীল শব্দটি আরবী হলে তা نحل হতে নির্গত, যার অর্থ বের হওয়া, বা এর অর্থ মূল। যেহেতু তা দ্বীনের প্রত্যাবর্তন স্থল। অথবা نحل শব্দটি نحلة হতে নির্গত যার অর্থ প্রশস্ত হওয়া, বড় চোখ বিশিষ্ট হওয়া। কারণ ইনযীলে অনেক হারাম বস্তুকে হালাল রাখা হয়েছে।
দালাইলুন নবুওয়াতে হযরত আতা বিন ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে আরয করলাম, মহানবী (সা.)-এর যে সকল গুণ তওরাতে উল্লেখ আছে, তা আমাকে বলে দিন। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, হ্যাঁ, মহানবী (সা.)-কে কুরআন শরীফে যে গুণাবলী দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, এ রকম অনেক গুণ দিয়ে তওরাতেও ডাকা হয়েছে। যেমন-
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا-
এ আয়াতখানা তওরাতেও আছে। এ ছাড়া আরও আছে "আপনাকে প্রেরণ করেছি নিরক্ষরদের রক্ষক হিসেবে। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আপনাকে নাম দিয়েছি মুতাওয়াক্কিল অর্থাৎ আস্থাবান। আপনি অসচ্চরিত্র নন, ককর্শভাষীও নন, বাজারে

Scanned with CamScanner

চিৎকারকারী নন। তিনি (এখানে ইলতেফাত হয়েছে) মন্দের প্রতিদান মন্দ দিয়ে করবেন না। বরং তিনি ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নেবেন না, যতক্ষণ না তাঁর দ্বারা বক্র জাতিকে সংশোধন করে নেবেন। (এখানে বক্র জাতি বলতে মিল্লাতে ইবরাহীম হতে যারা বিপথগামী হয়েছে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে)। অবশেষে তারা বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। এর দ্বারা তিনি অন্ধদের চক্ষু, বধিরদের কান এবং কীলকবদ্ধ অন্তর খুলে দেবেন। হযরত আতা (রা.) বলেন, এরপর আমি কাব আহবার (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাবে হযরত আবদুল্লাহ (রা.) যা বলেছিলেন, তা থেকে একটি হরফও কম বলেন নি। বরং তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত আরও কিছু গুণের উল্লেখ ছিল। "তাঁকে এমন চাবিকাঠি প্রদান করা হবে, যার মাধ্যমে আল্লাহ অন্ধ চোখকে দৃষ্টিশক্তি দান করবেন, বধির কানকে শ্রবণশক্তি দেবেন এবং বক্র নিয়মনীতিকে সংশোধন করবেন, অত্যাচারিতকে সাহায্য করবেন, কাউকে দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে বাধা দেবেন। তওরাতে আরও উল্লেখ আছে- بانه يسبق حمله جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما۔

আহবারে ইহুদ এর মধ্য হতে এক লোক বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর সকল গুণ পর্যালোচনা করেছিলাম। তবে দুটি গুণ বাকী রয়েছিল, যার পর্যবেক্ষণের কোন সুযোগ হচ্ছিল না। একদিন তাঁর কাছে সাহায্য কামনাকারী এক লোক এল এবং সাহায্য কামনা করল। তিনি বললেন, তোমাকে সাহায্য করার মত কিছু আমার কাছে নেই। এমন সময় আমি বললাম, আমার কাছে এতোগুলো দীনার আছে, যদি আমাকে অমুক তারিখের মধ্যে এতটুকু খেজুর দিয়ে দেন, তা হলে আমি এই মিসকীনকে সবগুলো দীনার দিয়ে দেব। রাসূল (সা.) সম্মত হয়ে গেলেন। আমিও দীনারগুলো মিসকীনকে দিয়ে দিলাম। খেজুর আদায় করার নির্ধারিত দিনের দুই বা তিন দিন পূর্বে আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর জামা ও চাদর ধরে বললাম, হে মুহাম্মদ! আমার কর্জ কি আদায় করবে না? হে বনু আবদুল মুত্তালিব! তুমি তো লজ্জাহীন! আমি তাঁর প্রতি ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম। ইহুদী লোকটি বলেন, আমার এ কথা শুনে উমর (রা.) বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর শত্রু। তুমি আমার সম্মুখে রাসূল (সা.)-কে এমন কথা বলছ! এই বলে তিনি আমার উপর হাত তুলতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে উমর! আমিও ঐ লোক তোমার কাছ থেকে একেকজন একেকটি বস্তুর মুখাপেক্ষী। তুমি তাকে শালীন ভাষায় কর্জ ফেরত চাইতে বল এবং আমাকেও যথানিয়মে তা আদায় করতে বল। বরং তুমি গিয়ে তাকে তা আদায় করে দাও। এবং তাকে বিশ সা অতিরিক্ত দেবে; কারণ তুমি তাকে তিরস্কার করেছ। মহানবী (সা.)-এর এমন সুন্দর ব্যবহার দেখে অবশেষে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।"

তওরাতে উল্লেখ রয়েছে যে, রাজত্ব সব সময় ইহুদীদের হাতে থাকবে, যতক্ষণ না সেই নবী আসবেন, যাঁর অপেক্ষায় সকল উম্মত অপেক্ষমান। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা.)। কারণ তিনি সকল উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। ইনযীলে আছে, আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদেরকে লক্ষ্য করে বলেন- ان الله يقيم لكم نبيا من اخوتكم۔

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভাইদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য একজন নবী নির্ধারণ করবেন। এ বাক্য মহানবী (সা.)-এর জন্য প্রযোজ্য। কারণ তিনি ছাড়া পূর্বেকার সকল নবী বনী ইসরাঈলের মধ্য হতে এসেছিলেন। যদি উপর্যুক্ত বাক্য দ্বারা বনী ইসরাঈল হতে নবী প্রেরণ উদ্দেশ্য হত, তা হলে منكم বলতেন, من اخوانكم বলতেন না। এ জন্য যে, বনী ইসরাঈলগণ ইসহাক (আ.)-এর বংশধর আর তাঁর ভাই হলেন ইসমাঈল

(আ.)। সুতরাং উপর্যুক্ত বাক্য মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। ইনযীলে উল্লেখ আছে, রাসূল (সা.) ফারানে প্রেরিত হবেন এবং তাঁর প্রতি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হবে। ফারান মক্কা শরীফকে বলা হয়। তওরাতে উল্লেখ আছে : ان اسماعيل عليه السلام اقام فاران۔ ইসমাঈল (আ.) ফারানে অবস্থান করেন।

اَلَّذِيْنَ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ۔

এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা রয়েছে, অর্থাৎ তারা মহানবী (সা.)-এর গুণাবলী লিখিত পায় يأمرهم بالمعروف অর্থাৎ উত্তম চরিত্র, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেবেন। শিরক হতে তাদেরকে বাধা দেবেন। তাদের জন্য পবিত্র বস্তু সমূহ হালাল করবেন, যেমন চর্বি, যা বনী ইসরাঈলের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছিল, বাহিরা (যে জন্তুর দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হয়) ওসীলা, (যে উষ্ট্রী উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে, তাকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত;সায়েবা ঐ জন্তু যাকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হয়) এগুলোও জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা হারাম করে নিয়েছিল, তিনি (মহানবী) এসে অপবিত্র বস্তু সমূহ হারাম করবেন, যেগুলোকে জাহিলী যুগের লোকেরা হালাল মনে করত। যেমন মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস। তাদের উপর থেকে তিনি বোঝা নামিয়ে দেবেন। যেমন শনিবার কাজ করা তাদের জন্য হারাম ছিল হত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত গ্রহণযোগ্য ছিল না। কাপড়ের কোন অংশে প্রশ্রাব বা নাজাসাত লেগে গেলে তা কেটে ফেলা আবশ্যক ছিল।

মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার আসওয়াদ আনাসীর হত্যাকারী হযরত নুমান সাবায়ী (রা.) বলেন, আমি ইয়ামনের ইহুদী পাদ্রীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। যখন মহানবী (সা.)-এর সংবাদ শুনলাম তখন তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। এরপর আরয করলাম, রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমার পিতা তাওরাতের কয়েকটি পাতা বন্ধ করে রাখতেন এবং বলতেন, এগুলো ইহুদীদের সামনে কখনো পড়বে না। যখন ইয়াসরিবের নবীর কথা শুনবে, তখন তা খুলবে। হযরত নুমান বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! যখন আপনার সংবাদ পেলাম, তখন এই পাতাগুলো খুলে আপনার গুণাবলী তাতে লিখিত পেলাম। আমি এই কিতাব এখনই আপনার সামনে পেশ করছি। তাতে লেখা, আপনি যা হালাল করবেন, যা হারাম করবেন, আপনি হচ্ছেন সর্বোত্তম নবী। আপনার উম্মত হচ্ছেন সর্বোত্তম উম্মত। আপনার নাম হল আহমদ (সা.) আপনার উম্মত হচ্ছেন প্রশংসাকারী। অর্থাৎ তাঁরা সুখে দুখে সব সময় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করবেন। তাদের নৈকট্য লাভের উপায় হল তাদের রক্ত অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে তারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করবেন। তাঁদের ধর্মগ্রন্থসমূহ থাকবে তাদের বক্ষে অর্থাৎ তাঁরা তা মুখস্থ করে নেবেন। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই জিবরীল তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ তাঁদের রক্ষণা-বেক্ষণ করবেন, যে ভাবে পাখি তার ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে রক্ষণা-বেক্ষণ করে।

এরপর আমার পিতা আমাকে বললেন, যখন তুমি সে নবীর সংবাদ শুনবে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে গিয়ে ঈমান আনবে এবং তাঁকে সত্যায়ন করবে। মহানবী (সা.)-এর মনে হল, এ ঘটনাটি সাহাবায়ে কিরামকে শুনাবেন। একদিন নুমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। মহানবী (সা.) বললেন, নুমান। তুমি এ ঘটনাটি বর্ণনা কর। হযরত নুমান (রা.) প্রথম থেকে শুরু করলেন। তখন মহানবী (সা.)-কে মৃদু হাসতে দেখা যায়। এরপর তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল।

সাহাবায়ে কিরামের সকল সশস্ত্র জিহাদে জিবরীল (আ.)-এর উপস্থিত থাকা প্রমাণিত

Scanned with CamScanner

আছে। এমনকি সাধারণ মুমিনগণ যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তখনও ফিরিশতা উপস্থিত হওয়া প্রমাণিত আছে। তওরাতে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও আছে, তাঁরা তাদের বাহু সমূহ পবিত্র রাখবেন, দেহের মধ্যভাগে ইযার পরিধান করবেন, যুদ্ধে যে ভাবে কাতারবন্দী হন, নামাযেও সেভাবে কাতারবন্ধ হবেন। আরও আছে, তাঁরা ইযার পরিধান করবেন, যে ভাবে আপনি মিরাযের রাতে ফিরিশতাগণকে ইযার পরিধান করতে দেখেছেন। তাঁরা তাদের প্রতিপালকের কাছে নিসফে সাক পর্যন্ত ইযার পরিহিত। তিনি তোমাদের কাছে এসেছেন পাগড়ী নিয়ে। তোমরা উহাকে তোমাদের পিঠের পিছন দিকে ছেড়ে দাও কারণ তা ফিরিশতাগণের চিহ্ন। আর এতদুভয় অর্থাৎ ইযার ও পাগড়ীর শামলাকে ছেড়ে দেয়া এই উম্মতে নির্দশন। বর্ণিত আছে যে, পাগড়ী মুসলমানদের টুপি। অন্য বর্ণনায় আছে, অন্যদের থেকে মুসলমানদেরকে পৃথক করার চিহ্ন। তাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে তারা ওযূ করেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ ওযূ করতেন না। এ কথার অনুকূলে হাফিয ইবনে হজর (র.)-এর উক্তি, ওযূ হচ্ছে নবীগণের বৈশিষ্ট্য। একমাত্র এই উম্মত ছাড়া অন্য উম্মতের জন্য তা ছিল না। অনুরূপ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) মরফু হাদীস বর্ণনা করেন- আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আমি তাদের জন্য প্রত্যেক নামাযের আগে পবিত্রতা অর্জনকে ফরয করেছি, যেভাবে নবীগণের উপর ফরয করেছিলাম।" প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযূ করার বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন তা মনসুখ হয়ে যায়। এখন নামাযের জন্য কেবল পবিত্রতা শর্ত। সকল নামাযের জন্য ওযূ প্রয়োজনীয় নয়। এ বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য ওযূ ছিল না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অন্য একটি বর্ণনার বিপরীত। যেমন তাবরানী (র.) তাঁর আওসাত গ্রন্থে সনদ সহ বর্ণনা করেন, "ইবনে লাহীআ হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ওযূর পানি তলব করলেন। অতঃপর প্রত্যেক অঙ্গ একবার একবার ধৌত করে বললেন, এটাই ওযূ। ওযূ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা নামায কবুল করেন না। এরপর প্রত্যেক অঙ্গ দু'বার দু'বার ধৌত করে বললেন এটা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওযূ। অতঃপর তিনবার তিনবার ধৌত করে বললেন, এটা আমার ওযূ ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের ওযূ। আলোচ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, পূর্ববর্তী উম্মতগণেরও ওযূ ছিল; কিন্তু দু'বার করে ধোয়ার বিধান ছিল এবং তাদের নবীগণের জন্য তিন বার করে ধৌত করার বিধান ছিল, যেমন এই উম্মতের জন্য তিন তিন বার ধৌত করার বিধান রয়েছে। অতএব প্রমাণিত হল হল যে, নবীগণের ন্যায় ওযূ করা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং দুই হাদীসের মধ্যে সহজেই সামঞ্জস্য হয়ে গেল। হযরত ইবনে হজর হায়সামী (র.)-এর মত পরিপূর্ণ অবস্থার প্রতি প্রয়োগ করা হবে যেভাবে এই উম্মতের জন্য। তিনবার ধৌত করা পরিপূর্ণ সওয়াব লাভের মাধ্যম (والله اعلم)

মহানবী (সা.) এর নাম যবুরে আছে- الفلاح ও حاط حاط যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বাতিলকে মিটিয়ে দেবেন। অন্যত্র فارق ও فاروق তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করবেন। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। فارقليط অথবা بارقليط এর অর্থ বলা হয়ে থাকে, 'যিনি সকল গোপনীয় বস্তুর সংবাদ রাখেন'। بنبوع গ্রন্থে আছে, হযরত মসীহ (আ.) বলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করলাম তোমাদের জন্য অন্য একজন بارقليط প্রেরণ করতে, যিনি তোমাদের সাথে স্থায়ীভাবে থাকবেন। তিনি তোমাদের সাথে প্রত্যেক বিষয়ে কথা বলবেন। এবং তোমাদের জন্য গোপনীয় বিষয় সমূহের ব্যাখ্যা করবেন। তিনি আমাদের সাক্ষ্য দেবেন যেভাবে আমি তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি হবেন

শেষ নবী।

উল্লেখ্য, তাঁর পরে মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কেউ তাঁর নির্মলতা ও নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেননি। কিন্তু নাসারাগণ এই কথার অর্থ তাদের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করে দিয়েছে। درمنظم গ্রন্থে সনদসহ এই হাদীসখানা বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে উমর! তুমি কি জান, আমি কে? আমি সেই নবী যাঁর বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তায়ালা মূসার তওরাতে, ঈসার ইনযীলে ও দাউদের যবুরে। আমি গর্ব করছি না বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলছি। হে উমর তুমি কি জান, আমি কে? তওরাতে আমার নাম রয়েছে احمد। ইনযীলে بارقليط এবং যবূরে حمياطا আর ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা সমূহে আছে طاب طاب -এটা আমি গর্ব করে বলছি না।

শিফা নামক গ্রন্থে মুকাতিল বিন সুলাইমান (রা.) হতে বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেন, আমি যবূর কিতাবে দেখেছি, আল্লাহ বলছেন- انى انا الله لااله الاانه محمد رسولى- আমি আল্লাহ! আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। মুহাম্মদ (সা.) আমার রাসূল। মাযামীরে দাউদ (আ.)-এ লিখিত আছে, তিনি (মুহাম্মদ সা.) দুর্বলকে সবল করবেন, যাদের কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি মিসকীনদের প্রতি করুণা করবেন। সব সময় তাঁর প্রতি বরকত অবতীর্ণ হবে, তাঁর স্মরণ চিরস্থায়ী থাকবে। ومالتم عليه بحار আয়াতের মর্মার্থ যবূরে আছে- হে দাউদ, তোমার পরে একজন নবী আসবেন যাঁর নাম হবে আহমদ ও মুহাম্মদ। তিনি সত্যবাদী হবেন, আমি কখনো তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হব না, তিনিও কখনো আমার অবাধ্য হবেন না। তিনি অপরাধ করার পূর্বেই তাঁর পূর্বাপর সকল অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। তাঁর উম্মতগণ করুণাপ্রাপ্ত হবেন। কিয়ামতের দিন যখন তাঁরা উঠবেন, তখন তাদের নূর হবে নবীগণের নূরের ন্যায়। এখানে গুনাহ দ্বারা অর্থ হল যদি এ ধরনের হয় তাঁর কাছ থেকে কোন পাপ ঘটে থাকে। অন্য অর্থ হল حسنات الا برابر سيئات للمقربين-

কারণ মহানবী (সা.) হতে পাপ কাজের কল্পনাই করা যায় না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজমা এ কথার উপর যে, নবীগণ সবাই পাপমুক্ত। حسنات الا برابر سيئات للمقربين এটা ব্যাপক। ওলীআল্লাহগণের ক্ষেত্রেও তা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন মাযামীরে দাউদে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তায়ালা মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্য হতে মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রকাশ করবেন। হযরত শীশ (আ.)-এর সহীফায় মহানবী (সা.) এর নাম লিখিত আছে-اخوانساغ যার অর্থ 'ইসলামকে সংশোধনকারী'। ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফায় তাঁর নাম بوذموذ ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই নাম তওরাতে উল্লিখিত ছিল। হতে পারে এ নাম দুই কিতাবেই ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর নাম ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফায় طاب طاب উল্লেখ আছে। হতে পারে তাতে এই দুই নামই উল্লেখ আছে। হযরত শুআইব (আ.)-এর কিতাবে আছে, তিনি আমার এমন বান্দাহ যার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করব। তখন জাতি সমূহের মধ্যে আমার উপমা প্রকাশিত হবে। তিনি হাসবেন না অর্থাৎ উচ্চ স্বরে হাসবেন না। তিনি অন্ধ চক্ষুসমূহ খুলে দেবেন, বধির কানসমূহ খুলে দেবেন এবং আচ্ছাদিত অন্তর সমূহকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আমি তাকে যা দিয়েছি, অন্য কাউকে তা দেই নাই। তাতে আরও আছে ঃ তিনি হবেন নম্র, তিনি নতুন পদ্ধতিতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করবেন। তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে আসবেন। তিনি বিনয়ীদের স্তম্ভ, তিনি আল্লাহর নূর। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ তাঁর দ্বারা সৃষ্টিজগত ও জগতের অধিবাসীরা

Scanned with CamScanner

আনন্দিত হবে।

ইবনে যফর বলেন, মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা আসমানী কিতাবসমূহে এরূপ বর্ণিত আছে- আমি উম্মতদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করব। সকল প্রকার সৌন্দর্য্য দিয়ে তাঁকে সৌন্দর্যমন্ডিত করব। সকল প্রকার মহত্তম চরিত্র দান করব। তাঁর কথাকে হিকমতপূর্ণ করব। সত্য ও ওয়াদা পূরণ তাঁর অভ্যাস হবে, তাঁর চরিত্র হবে ক্ষমা ও সৎ কাজ, তাঁর শরীয়ত হবে সত্য, তাঁর জীবন হবে ন্যায়পরায়ণতা, আর ইসলাম হবে তাঁর ধর্ম। তাঁর দ্বারা ধর্মযোদ্ধাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করব, পথভ্রষ্টদের হিদায়াত করব, ভিন্ন আত্মার মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দেব, বিভিন্ন ধরনের কামনার মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দেব। তাঁর উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত করব।

মহানবী (সা.)-এর নাম 'মুহাম্মদ (সা.)' অসংখ্য পাথর গাছ ও প্রাণীর মধ্যে কুদরতের কলমে লিখিত পেয়ে যাওয়া বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত যাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হযরত সুলাইমান বিন দাউদ (আ.)-এর আংটির নকশায় লিখিত ছিল, لا اله الا الله محمد رسول الله। হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.) হতে মরফু হাদীস বর্ণিত, হযরত সুলাইমান বিন দাউদ (আ.)-এর আংটির পাথর ছিল আসমান থেকে প্রাপ্ত। এটা তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তিনি তা তাঁর আংটিতে রেখে দেন। এর মাধ্যমে তিনি সুশৃংখল ভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন। এর নকশায় লিখিত ছিল

انا الله لا اله الا انا محمد عبدى ورسولى। যখন তিনি গোসলখানায় প্রবেশ করতেন বা স্ত্রী সহবাস করতেন, তখন তা খুলে নিতেন। এটা খুলে নেয়ার পর মানুষের বিষয়গুলো তাঁর কাছে দুর্বোধ্য মনে হত। এটা খোলার পূর্বে নিজের মধ্যে যেমন (বিচার-বুদ্ধি) দেখতে পেতেন, তা খুলে নিলে অনুরূপ পেতেন না।

বিভিন্ন বর্ণনায় হযরত সুলাইমান (আ.)-এর আংটির নকশার ভাষ্য বিভিন্ন রকম উল্লেখ রয়েছে। এর সমাধানে বলা যায় কোন কোন বর্ণনাকারী ভাষ্যখানা হুবহু বর্ণনা করেছেন এবং কেউ কেউ তার মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন, এ জন্য এ ভিন্নতা দেখা দিয়েছে।

انس الجليل নামক গ্রন্থে আছে পুরনো যুগের অনেক পাথরের উপর লেখা ছিল- جامع قرطبه এর লাল খুটির উপর কুদরতী কলমে محمد تقى مصلح سيدامين লেখা হয়েছিল। হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর (র.) ও আল্লামা ইবনে জরীর (র.) তাঁদের তাফসীর গ্রন্থে-

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় كنز এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন : كنز এর দুটি তাফসীর রয়েছে। কারো মতে জ্ঞানের খনি আবার কারো মতে দেয়ালের নিচে সম্পদের খনি ছিল। হযরত অবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা রিওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভব। তিনি বলেন- দেয়ালের নিচে একটি ফলক ছিল স্বর্ণের। তাতে লেখা ছিল,

بسم الله الرحمن الرحيم۔ عجبت لمن يقن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن ايقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن ايقن بالدنيا وتقلبها باهلها كيف يطمئن عليها۔ لا اله الا الله محمد رسول الله۔

আমি অবাক হই যে তকদীরে বিশ্বাস করে সে চিন্তিত হয় কিভাবে, আমি অবাক হই যে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে সে আনন্দ প্রকাশ করে কেমনে? আবার যে দুনিয়াও তার অধিবাসীদের পরিবর্তনে বিশ্বাসী, সে তাতে শান্তিতে বাস করে কিভাবে? আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

দেয়ালের নিচে এতিমদের যে সম্পদ ছিল তা তাদের সাতপুরুষ পূর্বের দাদা পুঁতে রেখেছিলেন। এর থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-এর নাম মুবারক হতে কোন কালেই মানুষ গাফিল ছিল না। বরং তাঁর নাম মুবারক দিয়ে সকল নবী বিভিন্ন রূপে উপকৃত হয়েছেন। হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত : রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন আদম (আ.)-এর ভুল হয়ে গেল, তখন তিনি দুআ করলেন-

يارب اسئلك بحق محمد ﷺ الاغفرت لى

হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর ওসীলা নিয়ে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি মুহাম্মদকে কিভাবে চিনলে? অন্য বর্ণনায় আছে, মুহাম্মদ কে? তখন আদম (আ.) জবাব দিলেন, যখন আপনি নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করলেন এবং আমার মধ্যে রূহ ফুৎকার করলেন, তখন আমি মাথা উঠালাম এবং আরশের খুঁটিতে লেখা দেখলাম-

لا اله الا الله محمد رسول الله

তা দেখে আমার বিশ্বাস হল যে, আপনার নামের সাথে আপনার মাহবুব ছাড়া আর কারো নাম মিলাননি। আল্লাহ বলেন, তুমি সত্য বলছ, হে আদম! যদি মুহাম্মদ না হতেন, তা হলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

'শিফা' গ্রন্থে আছে, আদম (আ.) বললেন, যখন আপনি আমাকে সৃষ্টি করলেন, আমি আপনার আরশের দিকে মাথা উঠালাম, তখন সেখানে লেখা দেখলাম-

لا اله الا الله محمد رسول الله

তখন আমি বুঝলাম, যাঁর নাম আপনার নামের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে তাঁর চেয়ে বেশী সম্মানিত আর কেউ হতে পারেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি ওহী অবতরণ করলেন, 'আমার সম্মান ও মাহাত্ম্যের শপথ! তিনি হচ্ছেন শেষ নবী,তোমার বংশধর। যদি তাঁকে সৃষ্টি না করতাম, তা হলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।' ওয়াফা কিতাবে হযরত মায়সারা (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), আপনি কখন থেকে নবী ? তিনি বললেন, যখন আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন এবং আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, অতঃপর সেখানে সাত আসমান তৈরী করলেন, আরশ সৃষ্টি করলেন এবং আরশের খুঁটিতে লিখে রাখলেন-

محمد رسول الله خاتم الانبياء۔

অতপর জান্নাত সৃষ্টি করলেন, যেখানে আদম ও হাওয়া (আ.)-কে থাকতে দিয়েছিলেন। আর আমার নাম লিখে দিলেন বেহেশতের দরজা, গাছের পাতা ও সংরক্ষিত কক্ষসমূহে। তখন আদম (আ.) ছিলেন রূহ ও শরীরের মধ্যখানে। যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জীবন দান করলেন এবং তিনি আরশের দিকে তাকালেন, তখনই আমার নাম দেখতে পেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানিয়ে দিলেন, ইনি হচ্ছেন তোমার সন্তানদের সর্দার। যখন শয়তান তাঁদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিল, তখন তাঁরা তওবা করলেন এবং আমার নামের সুপারিশ তলব করলেন।

হযরত সাঈদ বিন যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আদম (আ.)-এর সন্তানগণ পারস্পরিক বিতর্কে লিপ্ত হলেন যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন সৃষ্টি সব চেয়ে বেশী সম্মানিত? কেউ বললেন, হযরত আদম (আ.) সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। কারণ আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন এবং ফিরিশতাদের দ্বারা তাঁকে সিজদা করিয়েছেন। কেউ বললেন, ফিরিশতাগণই বেশী সম্মানিত। কারণ তাঁরা আল্লাহর

Scanned with CamScanner

অবাধ্য হন না। এ কথাটি আদম (আ.)-এর কাছে পেশ করা হল। তখন আদম (আ.) বললেন, আমার দেহে রূহ ফুৎকার করা হল। রূহ তখনো পা পর্যন্ত পৌঁছেনি, আমি উঠে বসলাম। এমন সময় আমার সামনে আরশ উদ্ভাসিত হল। আমি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম, সেখানে লেখা আছে- لااله الاالله محمدرسول الله এ জন্য তিনিই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত সৃষ্টি। কা'ব 'আহবার (রা.)-কে হযরত উমর (রা.) বললেন মহানবী (সা.)-এর জন্মের পূর্বেকার কিছু ফযীলত বর্ণনা করার জন্য। তিনি বলতে লাগলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কিতাবে পড়েছি, হযরত ইবরাহীম (আ.) একটি পাথর পেলেন, যার উপর চারটি পংক্তি লেখা ছিল। প্রথম পংক্তিতে-

انااللہ لاالہ الاانافاعبدنی۔

পংক্তিতে লেখা ছিল

انااللہ لاالہ الا انامحمد رسولی طوبی لمن امن بہ واتبعہ

অর্থাৎ আমি আল্লাহ আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আশীর্বাদ তার জন্য, যে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে।

তৃতীয় লাইনে আছে, আমি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। হরম শরীফ আমার কাবা আমার ঘর। যে আমার ঘরে প্রবেশ করল, সে আমার শাস্তি হতে মুক্ত হল।

হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত আদম (আ.) বলেন, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম তোবা গাছের পাতায় লিখিত দেখেছি, আরও দেখেছি সিদরাতুল মুনতাহায় অবস্থিত গাছের পাতায়। এ কারণেই সুয়ূতী (র.) তাঁর خصائص الكبرى গ্রন্থে তাঁর বৈশিষ্ট্য আলোচনায় বলেন, মহানবী (সা.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, আরশ এবং সেখানে যা আছে, তাতে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নামও লিখিত আছে। আরশকে পানির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর তা নড়তে আরম্ভ করল। তখন তাতে লিখে দেয়া হল لااله الاالله محمد رسول الله। তখনই তা স্থির হলে গেল। তাঁর আরও বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর নাম বিশ্বজগত তথা আকাশ বেহেশত ও তাতে যা রয়েছে, সর্বত্র লিখিত রয়েছে।

شفاء গ্রন্থে আছে, হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.) হতে ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার ইযযত ও মহত্ত্বের শপথ। আপনি না হলে আমি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করতাম না। এ সবুজ ফসলাদি উৎপন্ন করতাম না। এই গাছ-গাছালিপূর্ণ যমীন সৃষ্টি করতাম না। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যদিও তা কুরআন হাদীস দিয়ে প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু সুন্নাতে রাসূলে এই মর্মের বর্ণনা রয়েছে (আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)। গাছ ও পাথর কর্তৃক মহানবী (সা.)-কে সালাম করার বর্ণনা হতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই সন্দেহ দেখা দেয় যে, পাথর ও গাছের কথা বলা কিভাবে সম্ভব! তাদের মধ্যে তো কথা বলার ক্ষমতা নেই। এর জবাবে আমি বলব-

১ম জবাব ঃ প্রত্যেক বস্তু তার মত করে কথা বলে থাকে। তা না হলে আল্লাহ তায়ালার বাণী يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ এই আয়াতের কি অর্থ হবে ?

২য় জবাব ঃ প্রত্যেক বস্তুর, তাতে প্রাণ থাকুক আর নাই থাকুক, কথা বলার যোগ্যতা রয়েছে। যেমন বর্ণনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আছে যে, মুমিন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার সিজদার স্থান ৪০ দিন পর্যন্ত তার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করে।

৩য় জবাব ঃ জড় পদার্থের কথা বলা যদি মেনে নেয়া না যায়, তা হলে কুরআন শরীফের আয়াত وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔ (আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদ (আ.) এর অনুগত করে দিলাম। তারা তাসবীহ পাঠ করত)। এই আয়াতের কি অর্থ

গ্রহণ করা হবে? কারণ এই আয়াত দ্বারা পাহাড় ও পাখির কথা বলা প্রমাণিত হয়।

৪র্থ জবাব ঃ সূরা নমলের আয়াত يٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ۔ দ্বারা পিপড়ার কথা বলা প্রমাণিত হয়।

৫ম জবাব ঃ সূরা নমলের নিম্নবর্ণিত আয়াত

فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَقِيْنٍ۔

হতে فهم لايهتدون পর্যন্ত আয়াত দ্বারা হুদহুদ পাখীর কথা বলা সাব্যস্ত হয়।

৬ষ্ঠ জবাব ঃ غاية الاوطار على مشارق الانوار গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে গিয়ে যখন সমুদ্রের গভীরে চলে গেলেন, তখন শুনতে পেলেন সেখানকার পাথর তিলাওয়াত করছে لااله الاانت سبحانك انى كنت من الظالمين۔ এটা দ্বারাও পাথরের কথা বলার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৭ম জবাব ঃ হযরত আদম (আ.) যখন তিন শ বছর পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করছিলেন, তখন একমাত্র আগর নামক গাছ ছাড়া সকল কিছু ক্রন্দন করেছিল। এ ছাড়াও অনেক ঘটনা রয়েছে, যার দ্বারা সকল বস্তুর কথা বলার সামর্থের প্রমাণ মিলে। জড় পদার্থের কথা বলার শক্তি প্রমাণের জন্য হযরত উমর (রা.)-এর বর্ণনাই যথেষ্ট, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আসাফ ও নায়েলা নামক মূর্তির সামনে বসে এই আওয়াজ শুনেছিলেন। ياجليح امرنجيح رجل فصيح يصيح بلااله الاالله

এই হাদীসের সনদে কোন অসম্পূর্ণতা নেই।

বুখারী শরীফে বর্ণিত উসতুনে হান্নানার ক্রন্দন আমাদের দাবীর সপক্ষে একটি দলীল। আসল কথা হল, রূহানী শক্তিসম্পন্ন কোন মানুষের প্রভাব যার উপর পড়ে, সেই বস্তুর মধ্যে রূহানিয়ত তৈরী হয়ে যায়। যেমন রঙীন আয়না আলোর মধ্যে রাখলে সেই আয়নার ছায়া যে বস্তুর উপর পড়ে, সে বস্তুতে আয়নার রঙ পরিলক্ষিত হয়।

মানুষ বাতিনী সম্পর্কের মাধ্যমে কতটুকু উন্নত হতে পারে, একটি উপমার সাহায্যে তা প্রকাশ করছি। এক টুকরা লোহা আগুনে কিছুক্ষণ রাখলে তা আগুনের মত হয়ে যায় এবং তার মধ্যে আগুনের বৈশিষ্ট্য (জ্বালিয়ে দেয়া) সৃষ্টি হয়ে যায়। তা হলে একজন মানুষ দীর্ঘ দিন যাবত একক আল্লাহর তাজাল্লীর সাথে সম্পর্ক রক্ষার কারণে তার মধ্যে কি কোন বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে না ?

মহানবী (সা.)-এর সাথে পাথর ও গাছের কথা বলা মোটেই বুদ্ধির বহির্ভূত নয়। এখানে পাথর ও গাছের সালাম করার কিছু বর্ণনা পেশ করছি। হযরত সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি মক্কা শরীফের এমন একটি পাথরকে চিনি যা আমার নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমাকে সালাম দিত। আমি এখনো তা চিনি। এই পাথর সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে। কারো কতে তা হজরে আসওয়াদ। কিন্তু ইমাম হলবী (র.) বলেন, তা হজরে আসওয়াদ নয়, বরং মক্কা শরীফে তা زقاق الحجر নামে পরিচিত। ঐ পাথরের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেন, لعله غير الحجر الذى به الرمرفق সম্ভবতঃ তা সেই পাথর নয়, যাতে তাঁর কনুই মুবারকের চিহ্ন নিহিত আছে। উল্লেখ্য, মহানবী (সা.) তাঁর কনুই মুবারক দিয়ে একটি পাথরে ভর দিতেন। সেই পাথরকে বলা হত زقاق الرمرفق। এটা সেই পাথরও নয়, যাতে মহানবী (সা.)-এর আঙুলের চিহ্ন বিরাজমান ছিল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব হতেই মহানবী (সা.)-এর অভ্যাস ছিল প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে অনেক দূরে যেতেন। এমনকি তিনি মানুষ ও ঘরবাড়ী হতে আলাদা হয়ে যেতেন। ঐ সময় তিনি যে গাছ অথবা পাথরের পাশ দিয়ে যেতেন, তা ই

Scanned with CamScanner

বলত السلام عليك يارسول الله। তা শুনে ডানে বামে পেছনে তাকাতেন; কিন্তু কিছুই দেখতেন না। এরই দিকে ইংগিত করে اصل গ্রন্থকার বলেন- لم يبق من حجر صلب ولاشجر+ الاوسلم بل هناماوهبا।

গ্রন্থকার বলেন- معزية

والجمادات افصحت الذى+ اخرس عنه لاحمد الفصحاء।

অর্থাৎ জড় বস্তুগুলোও আহমদ (সা.)-এর রিসালতের সাক্ষ্য এমন ফসীহ ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, কুরাইশ ও অন্যান্য ফসাহতপূর্ণ কাফির লোকদেরকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় মহানবী (সা.) -এর সাথে ছিলাম। একবার মক্কার কোন এক প্রান্তে আমরা বের হলাম। তিনি যে পাহাড় বা গাছের মুখোমুখি হতেন, তাই তাকে বলত- السلام عليك يارسول الله।

নবুওয়াতের পূর্বে মহানবী (সা.)-কে পাথর কর্তৃক সালাম পেশ করার প্রতি ইশারা করে ইমাম সবকী তাঁর গ্রন্থে বলেন-

وماجرت بالاحجارالاوسلمت+عليك بنطق شاهدقبل بعثة।

নবুওয়াতের পূর্বে আপনি যে পাথরের পাশ দিয়েই যেতেন, তা প্রত্যক্ষ সাক্ষীদাতার মত আপনাকে সালাম জানাত। خصائص صغرى গ্রন্থে আছে, তাঁর বৈশিষ্ট হল পাথর কর্তৃক সালাম করা, গাছের কথা বলা, নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান এবং তাঁর ডাকে গাছ ও পাথর কর্তৃক জবাব প্রদান। মহানবী (সা.)-এর রিসালতের প্রতি সকল বস্তুর সাক্ষ্য প্রদান বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি সাধারণ মুসলমানের জন্যও বিভিন্ন বস্তু কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদানের বহু প্রমাণ আছে। যেমন মুয়াজ্জিনের জন্য আযান শ্রবণকারী সকল বস্তু কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদান হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস শরীফে আছে-

ان كل شيئ سمع صوت المؤذن طب ويابس يشهدله।

এই হাদীস শরীফ মুহদ্দিসীনে কিরামের নিকট সহীহ। মহানবী (সা.)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় তার ৪০ বছর বয়সের সময়, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মধ্যখানে دلائل النبوة সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে আবার আমি সেই বর্ণনায় চলে যাচ্ছি। মহানবী (সা.)-এর প্রতি ৪০ বছর বয়সে ওহী এসেছে, এটাই সহীহ কথা। তবে যে সকল বর্ণনায় আছে, ৪০ বছর বয়সের পূর্বে কোন নবীকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়নি, মুহদ্দিসীনে কেরাম সে হাদীসকে موضوع বলেছেন। কারণ হযরত ঈসা (আ.)-কে ৩০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রদান করা হয়। কারো মতে তাঁকে বাল্যকাল হতেই নবুওয়াত দেয়া হয়। এমনকি ৩৩ বছর বয়সে তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। হযরত ঈসা (আ.) তিন বছর আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচার করেন। এ সময় কালে তাঁর মুজিযাসমূহ প্রকাশিত হয়। মৃতকে জীবিত করা তাঁর অন্যতম মুজিযা। তিনি চার জন লোককে জীবিত করেছিলেন। ১ম লোক আযরা, তাকে মৃত্যুর তিন দিন পর জীবিত করেছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন। ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, ঈসা (আ.) কর্তৃক জীবন দান কৃত চার জন লোক হলেন (১) আযির, (২) এক বৃদ্ধের ছেলে, (৩) আশির এর মেয়ে ও (৪) নূহ আ.এর ছেলে সাম। ইমাম বগবী (র.) প্রত্যেকের আলাদা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কাযী বায়যাবী (র.) লিখেন, হযরত নূহ (আ.)-কে ৫০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রদান করা হয়। কারো মতে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রদান করা হয়। নবুওয়াতের জন্য ৪০ বছর বয়স হওয়া কোন শর্ত নয়। কারণ হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে দুই বা তিন বছর বয়সে নবুওয়াত ও তাওরাতের জ্ঞান প্রদান করা হয়।

যেমন والنباه الحكم صبيا। আয়াতে الحكم দ্বারা নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে।

যত নবী প্রেরিত হয়েছিলেন, সকলেই এক একটি গোত্র বা সমসাময়িক কালের সকল লোকের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে নূহ (আ.) তৎকালীন সময়ের সকল লোকের প্রতি নবী ছিলেন। তা না হলে তাঁর বদদুআয় চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন নারী ছাড়া আর সকল লোক ধ্বংস হয়ে যেত না। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا।

আমি তাদেরকে শাস্তি দেব না যতক্ষণ না তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করব। عوارف المعارف গ্রন্থে নূহ (আ.)-এর কিশতীতে আরোহী লোকের সংখ্যা বলা হয়েছে চার শ'। দুই বর্ণনার সমাধান এভাবে সম্ভব যে, মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণী মিলে সংখ্যা ছিল চার শ'।

মহানবী (সা.) নবুওয়াতের বছর নামায হতে অবসর হয়ে সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ রাতে আমাকে ৫টি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেয়া হয়নি।

১ম, আমাকে সকল যুগের মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। যারা আমার যুগের লোক এবং যারা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে, সকলের প্রতি আমি প্রেরিত হয়েছি। এবং যারা আমার পরে আসবেন, গাছপালা পাথর যা পূর্বে ছিল এবং আমার পরে হবে, সবার প্রতি আমি প্রেরিত হয়েছি।

২য়, আমার শত্রুর অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। যদিও আমার ও আমার শত্রুর মধ্যখানে এক মাসের দূরত্ব হয়। হযরত সুলাইমান (আ.) তাঁর বাহিনী তথা জীন ও মানুষ ইত্যাদি নিয়ে মক্কা শরীফ পৌছলেন। সেখানে প্রতি দিন ৫ হাজার উট, পাঁচ হাজার গরু ও বিশ হাজার ছাগল যবেহ করতেন। একদিন তাঁর বাহিনীর উচ্চ স্তরের লোকদেরকে বললেন, এই স্থান অর্থাৎ হরম শরীফ হতে আরবী নবী বের হবেন। যারা তাকে সহযোগিতা করবেন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তাঁর ভীতি এক মাসের রাস্তা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অধিকার প্রদানে নিকটাত্মীয় ও দূরবর্তী লোক সবাই তাঁর কাছে সমান হবে। আল্লাহর পথে কোন সমালোচকের সমালোচনা তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। তারা বললেন, হে আল্লাহর নবী, তিনি কোন দ্বীনের উপর থাকবেন? সুলাইমান (আ.) বললেন, একনিষ্ঠ আল্লাহর দ্বীন। যে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তার জন্য সুসংবাদ। তারা বললেন, আমাদের সময়কাল ও তাঁর আগমনের মধ্যে ব্যবধান কত হবে? তিনি জবাব দিলেন, এক হাজার বছর পরিমাণ।

৩য় বিষয় হল, আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন নবীর জন্য হালাল ছিল না।

৪র্থ বিষয় হল, সমগ্র পৃথিবী আমার জন্য নামাযের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে, সেখানেই নামায পড়া যাবে। যেখানে পানি পাওয়া যাবে না, সেখানে আমরা তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারব। অন্যান্য উম্মতের জন্য এ বিধান ছিল না। আমার পূর্ববর্তী সকল উম্মতকে তাদের ইবাদতখানায় নামায পড়তে হত এবং তাদের কেউই তায়াম্মুম করতো না। কারণ তায়াম্মুম আমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৫ম বিষয় হল, আমাকে বলা হল আপনি আল্লাহর কাছে কোন কিছু পাওয়ার জন্য দুআ করুন, কারণ সকল নবী অনুরূপ করেছেন। আমি আমার দুআকে পরকালের জন্য মুলতবী রেখে দিলাম। এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য সুপারিশ। যে ব্যক্তি لا اله الا الله এর

Scanned with CamScanner

সাক্ষ্য দেবে এবং যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে দুযখ হতে বের করে নিয়ে আসার জন্য আমার এ সুপারিশ হবে। এর চেয়ে বেশি ঈমান যার মধ্যে আছে, তাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর শাফাআত সাবিত তো আছেই। এই মত পোষণ করেন কাযী আয়ায (র.)।

কাযী আয়ায (র.) শাফাআতকে ৯টি স্তরে ভাগ করেন। ইবনুল গাইম শাফাআতকে শাফাআতের ২০টি পর্যায়ে বলে থাকেন। হাদীস শরীফে আছে- لى عند ربى ثلاث شفعات الخ-

এই হাদীসে শাফাআত দ্বারা অর্থ হল ১. শাফাআতে কুবরা ২. সীরাতের সময়কার শাফাআত এবং ৩. জাহান্নামীদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনার শাফাআত। শাফাআতে কুবরা সৃষ্টিজগতকে অপেক্ষমান অবস্থা হতে হিসাব গ্রহণের অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার সুপারিশকে বলে। এই শাফাআত জ্বীন, ইনসান ও ফেরেশতা সকলের জন্য হবে। এই অবস্থার কথা আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا-

অর্থাৎ যে দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াবে, দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিয়েছেন, সে ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্য কথা বলবে। (সূরা নাবা)

সীরাতে অবস্থান কালে শাফাআত কেবল তাঁর উম্মতের জন্য হবে। যেমন আয়াতে উল্লিখিত আছে-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি; যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হবে আর রাসূল হবেন তোমাদের জন্য সাক্ষী। (সূরা বাকারা)

তৃতীয় শাফাআত জাহান্নামীদের জন্য শাফাআত।

ইমাম মুসলিম (র.) অন্য একজন লোকের জন্য শাফাআত সাবিত করে থাকেন, যে জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশ করবে। ঐ লোকটির মুখে আল্লাহর নামের দুআ শুনে রাসূল (সা.) দুযখের দরজার পাশে যাবেন এবং তাকে বের করে নিজ হাত মুবারক দিয়ে হাউজে কাওসার দিয়ে ধৌত করে বেহেশতের এক পাশে রাখবেন। সে বেহেশতের নিয়ামত সমূহ দেখে তার জন্য আবেদন করতেই থাকবে। অবশেষে তাকে পৃথিবীর দ্বিগুণ পরিমাণ বেহেশত প্রদান করা হবে।

দ্বিতীয় প্রকার শাফাআতে রাসূল (সা.) নিজ উম্মতকে তাঁদের চিহ্ন দেখে পরিচয় করে সাক্ষ্য দেবেন। এ চিহ্ন সম্পর্কে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন- يأتون امتى يوم القيامة غرامحجلين من اثرالوضوء-اومن اثرالسجود

অর্থাৎ আমার উম্মতগণ কিয়ামতের দিন এমন ভাবে আসবে যে তাদের চেহারা সমূহ উজ্জ্বল থাকবে ওযূর বা সিজদার চিহ্নের কারণে।

তৃতীয় প্রকার শাফাআত প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর (র.) চারখানা হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন।

আল্লাহ তায়ালার বাণী- رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আনাস (রা.) বলেন, সেদিন আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের সাথে অপরাধী মুসলমানদেরকেও দুযখে আটকে রাখবেন। তখন মুশরিকরা তাদেরকে বলবে, দুনিয়াতে থাকতে তোমরা যার ইবাদত করতে, তিনি

তো তোমাদের কোন কাজে আসলেন না। রাসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হবেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের মধ্যে কিছু লোক তাদের গুনাহর কারণে দুযখে প্রবিষ্ট হবে। তখন লাত উযযার উপাসকরা বলবে, তোমাদের الله বলা অর্থাৎ তোমাদের ঈমান তোমাদের কোন কাজে আসেনি। তোমরা তো আমাদের সাথেই দুযখে রয়েছ। তখন আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরকে দুযখ হতে বের করে নহরে হায়াতে নিক্ষেপ করবেন। এতে তারা প্রজ্জ্বলন হতে মুক্ত হয়ে আসবে, যেভাবে চন্দ্র গ্রহণমুক্ত হয়। অতঃপর তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আনাস। আপনি কি তা রাসূল (সা.) হতে শুনেছেন? হযরত আনাস (রা.) বললেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা দুযখে তালাশ করে। হ্যাঁ, আমি রাসূল (সা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি।

হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন দোযখের অধিবাসীগণ দুযখে একত্রিত হবে, এবং তাদের সাথে আহলে কিবলার কিছু লোকও থাকবেন, তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলবে, তোমরা কি মুসলমান ছিলে না? তারা বলবেন, হ্যাঁ, তখন তারা বলবে, তোমাদের ইসলাম তোমাদের কোন কাজে আসেনি। তোমরা আমাদের সাথেই দুযখে প্রবিষ্ট হলে! তারা বলবেন, আমাদের পাপ ছিল, সে পাপের কারণেই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ধরেছেন । আল্লাহ তায়ালা তাদের অনুরূপ কথা শুনে আহলে কিবলার সবাইকে দুযখ হতে বের করে আনার নির্দেশ দেবেন। যখন কাফিররা তা দেখবে, তখন তারা বলবে, হায়, যদি আমরা মুসলমান হতাম, তা হলে তাদের মত আমরাও দোযখ হতে বের হয়ে আসতাম! এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন-

الٓرٰ- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ- رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ (سورة حجر)

এই হাদীস শরীফ আবুল হাতিম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় اعوذبالله- এর সাথে বিসমিল্লাহরও উল্লেখ রয়েছে।

তৃতীয় হাদীস হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তা উপরোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। তবে সেই হাদীসে কিছু অংশ বর্ধিত আছে। যখন আল্লাহ তায়ালা ইহা শুনবেন, তখন তাদের জন্য শাফাআতের অনুমতি দেবেন, রাসূল (সা.) তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। তবে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা হতে জানা যায়, জান্নাতে প্রবেশের পর তাদের লকব জাহান্নামী থাকে না, যেমন বর্ণিত আছে, জান্নাতে তাদের নাম জাহান্নামী হবে, তাদের চেহারার কালো চিহ্নের কারণে। আল্লাহ তায়ালার কাছে তারা দুআ করবেন, হে আল্লাহ! আমাদের এই নাম দূর করে দেন। তখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তারা জান্নাতের নহরে গোসল করবেন। এতে তাদের ঐ চিহ্ন দূর হয়ে যাবে।

চতুর্থ হাদীস ঃ হযরত মুহাম্মদ বিন আলী তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তাদের পাপের পরিমাণ অনুযায়ী দুযখের আগুন কারো হাঁটু পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে, কারো কোমর পর্যন্ত, আবার কারো ঘাড় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে। কেউ সেখানে এক মাস থাকবে, এর পর দুযখ হতে বের হয়ে আসবে। কেউ এক বছর অবস্থান করে বের হয়ে আসবে। সবচেয়ে দীর্ঘ দিন যে দুযখে

Scanned with CamScanner

অবস্থান করবে, তার মেয়াদ হবে পৃথিবী সৃষ্টির পর হতে তা ধ্বংস হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত মধ্যখানের সময়। যখন আল্লাহ তাদেরকে বের করতে চাইবেন, তখন ইহুদী, নাসারা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও মুশরিকরা তাদের সাথে অবস্থানরত তওহীদপন্থী লোকদেরকে বলবে, তোমরা আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছিলে, কিন্তু এখন আমরা ও তোমরা জাহান্নামে সমানভাবে অবস্থান করছি। তখন আল্লাহ তায়ালা এত ক্রুদ্ধ হবেন যে ইতিপূর্বে আর কখনো এমন হননি। এরপর তাঁদেরকে বের করে জান্নাতের একটি ঝর্ণায় নিয়ে যাবেন। তখন কাফিরগণ বলবে : আল্লাহ তায়ালার বাণী-

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ۔

কাফিরগণ আফসোস করবে, যদি তারা মুসলমান হয়ে যেত।

রাসূল (সা.) এর শাফাআতের পক্ষে অসংখ্য দলীল নিহিত রয়েছে। যখন কুরাইশগণ ইহুদী আলিমগণকে বলল, মুহাম্মদ (সা.) সত্য নবী কি না তা কিভাবে পরীক্ষা করব? তারা বললেন, তোমরা তাঁকে বলবে, যদি আপনি সত্য নবী হন, তা হলে আল্লাহর শাস্তি কামনা করেন, আমরা আল্লাহর আযাব দেখে ঈমান আনব, যেমনি ভাবে ইউনুস (আ.) দুআ করেছিলেন। তাদের অনুরূপ প্রশ্নের জবাবে মহানবী (সা.) বললেন, হে কুরাইশগণ! সকল নবীকে আল্লাহ তায়ালা এক একটি গ্রহণযোগ্য দুআ দান করেছিলেন। সবাই নিজ নিজ দুআ করে চলে গেছেন। আমাকে আল্লাহ তায়ালা যা দিয়েছিলেন, আমি তা বাকী রেখেছি। তা কিয়ামতের দিন আমি আমার গুনাহগার উম্মতের শাফআতের জন্য পেশ করব। এই জবাবে পরিপূরক আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ۔ আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকাবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ইস্তিগফার রত থাকলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। রাসূল (সা.)-এর উপস্থিতিতে শাস্তি প্রদান নিয়মানুযায়ী বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কাজী আয়ায (র.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল (সা.)-এর শরীর মুবারক অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর এ বিধান বলবৎথাকবে।

হলবী (র.) বলেন, রাসূল (সা.) রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন এমনকি কাফিরদের জন্যও এ কারণে তাদের শাস্তি বিলম্বিত হয়। তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করা হয় না। যেভাবে অনান্য উম্মতের নবী অস্বীকারকারীদের শাস্তি প্রদান করা হত। এমনকি তিনি ফেরেশতাগণের জন্যও রহমত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔

শিফা কিতাবে আছে, রাসূল (সা.) জিবরীল (আ.)-কে বলেছিলেন, এ রহমত হতে কি আপনিও কিছু করুণা প্রাপ্ত হয়েছেন। জিবরীল (আ.) জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি শাস্তির ভয় করতাম। যখন আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে আমার প্রশংসা করলেন-

ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ۔

যিনি শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশীল, তখন আমি নিরাপদ হয়ে গেলাম।

মহানবী (সা.)- এর বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর বাণী, আমি মুহাম্মদ আমি আহমদ, আমি মোচনকারী, আমার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কুফরকে মুছে দেবেন: আমি একত্রকারী, লোকেরা আমার পদতলে একত্রিত হবে, আমি সর্বশেষ নবী, যার পরে আর কোন নবী আসবেন না। আর আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত করা হয়েছে।

কাযী বায়যাবী (র.) التسمية بالاسماء العربية تنويه الى تعظيم المسمى- গ্রন্থে বলেন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন আমাকে আকাশে উত্থিত করা হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর নিকটবর্তী করেন। এমনকি তাঁর মধ্যেও আমার মধ্যে মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল। তখন আমাকে বলা হল, আপনার উম্মতকে সর্বোত্তম: উম্মত করা হয়েছে। অনান্য উম্মতের সংবাদ সম্পর্কে তারা অবহিত হওয়ার কারণে অথচ অন্যান্য উম্মত তাদের সম্পর্কে অবহিত নয়। আয়াতে (ـــه:) শব্দটির সর্বনাম রাসূল (সা.)-কে বুঝিয়েছে। কেউ কেউ বলেন, دنا فتدلى- অর্থ আল্লাহ তায়ালা নবী (সা.) এর নিকটবর্তী হলেন তখন ـه:-এর ضمير আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে। এটা সূক্ষ্ম অর্থ।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমরা ইহকালে সবার শেষে এসেছি, কিন্তু পরকালে সবার আগে আমাদের বিচার হবে। অন্য বর্ণনায় আছে, আমরা সর্বশেষ উম্মত তবে সর্বাগ্রে আমাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আমাদের বাম্বা হতে সকল উম্মত, দূরে সরে যাবেন। তখন এই উম্মত পথ চলবেন। তাদের ওযুর চিহ্ন সমূহ উজ্জ্বল থাকবে। তা দেখে অন্যান্য উম্মতগণ বলবেন, এই উম্মত নবীগণের প্রায় সমপর্যায়ের হয়ে গিয়েছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে- عرض الى السجود لمحمد من الوضوء

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা.) বলেন, আমাকে ছয়টি বিষয় নিয়ে অন্যান্য নবীগণের উপর মর্যাদাবান করা হয়েছে। আমাকে জামেউল কালিম প্রদান করা হয়েছে। শত্রুর অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য গণীমত হালাল করা হয়েছে। সমগ্র যমীন আমার জন্য পবিত্রতার মাধ্যমে নামাযের স্থান করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে সমগ্র সৃষ্টির জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আর এখানে সৃষ্টি বলতে বুঝানো হয়েছে মানুষ, জ্বীন, ফেরেশতা, প্রাণী জগত ইত্যাদি ও পাথর।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর ফেরেশতাগণের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার ব্যাপারে তার বৈশিষ্ট্য সমূহ অগ্রাধিকার দিয়েছি। আমার পূর্বে শায়খ তকীউদ্দীন সবকী (র.) একপ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি আরও বাড়িয়ে বলেন, নবী (সা.) পূর্ববর্তী সকল নবী ও তাদের উম্মতের প্রতি আদম (আ.)-এর সময় হতে কিয়ামত পর্যন্ত সবার প্রতি তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। বায়হাকী (র.)ও অনুরূপ বলেছেন। তিনি আরও বাড়িয়ে বলেন, রাসূল (সা.) প্রেরিত হয়েছেন সকল প্রাণী, জড়বস্তুর প্রতি। তিনি ফেরেশতাগণের প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে দলীল গ্রহণ করেন নিম্নের আয়াত দ্বারা-

(سورة سبا ...)

তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত অবশ্যই মাবুদ, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করব। এখানে ـــه: দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তা হলে এখানে কুরআন শরীফের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর তাবায় ফেরেশতাগণের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কুফর থেকে তিনি ফেরেশতাগণের প্রতিও প্রেরিত। যেহেতু তিনি সকল নবী ও সকল উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, এ কারণে আল্লাহ তায়ালা সবার কাছ থেকে প্রথমেই তাঁর প্রতি ঈমান ও তাঁকে সাহায্য করার অঙ্গীকার আদায় করেন। এ কারণে মহানবী (সা.)-এর হাতে ঈসা (আ.) সহ অন্যান্য নবী রাসূলগণ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁদের এ বায়আত ফেরেশতাদের মাধ্যমে হয়েছে।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, রাসূল (সা.) সর্বশেষ রাসূল (সা.)। সকল ফেরেশতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তবে এর ব্যতিক্রম আছে- রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ছয়টি কারণে অন্যান্য নবীগণের চেয়ে আমাকে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তা হল কোন নবীকে

Scanned with CamScanner

প্রদান করা হয়নি। আমার পূর্বাপর সকল অপরাধ মার্জনা করে দেয়া হয়েছে। আমার জন্য গনীমত হালাল করে দেয়া হয়েছে। আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত করা হয়েছে। আমার জন্য সমগ্র যমীনকে নামাযের স্থান ও পবিত্রতার মাধ্যম করা হয়েছে। আমাকে কাওসার দান করা হয়েছে। কাফিরদের অন্তরে ভয় সৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ সা.) لواء حمد -এর মালিক যার নীচে আদম (আ.) হতে সবাই থাকবেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, কিয়ামতের দিন সবাই আমার পতাকাতলে অবস্থান করবেন। আমার কাছে لواء احمد থাকবে। আমি হাঁটব; লোকেরা আমার সাথে হাঁটবে। এ ভাবে আমি জান্নাতের দরজায় আসব। রাসূল (সা.)-কে عباد বলা হয়েছে যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

কাযী আয়ায (র.) বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, হে মুহাম্মদ (সা.), আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তা হলে عباد এর সম্পর্ক মহানবী (সা.)-এর প্রতি করা হল। দ্বিতীয়ত রাসূল (সা.) এর অনুসরণকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের অনুসরণ বলে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

রাসূল (সা.) এর সত্তাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ সত্তার স্থলবর্তী ঘোষণা দেন। যেমন- اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে যার দ্বারা মহানবী (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য সকল নবী ও সকল উম্মতের উপর প্রমাণিত হয়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আমার প্রশংসনীয় পতাকা থাকবে। আমি হব সকল রাসূলের ইমাম, তাঁদের শাফাআতের মালিক। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জেন রাখ, আমি আল্লাহর হাবীব। এটা আমি অহংকার বশত বলছি না। কিয়ামতের দিন আমি لواء حمد বহন করব। আমি অহংকার করছি না। আমি সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবার মধ্যে সব চেয়ে বেশী সম্মানীয়। এতে আমার কোন গর্ব নেই। কিয়ামতের দিন আমি সর্ব প্রথম সুপারিশকারী হব এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে। আমি গর্ব করছি না। আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজার কড়া নাড়বো, আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য তা খুলে দেবেন। অতঃপর আমি দরিদ্র মুমিনদেরকে নিয়ে তাতে প্রবেশ করব। আমি অহংকার বশত তা বলছি না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি বেহেশতের দরজায় আসব এবং তার কড়া নাড়ার মাধ্যমে তা খুলে দেয়ার জন্য বলব। কোন কথা বলব না। তখন দ্বার রক্ষক বলবেন, আপনি কে? আমি বলব, মুহাম্মদ (সা.)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি বলব আমি মুহাম্মদ (সা.)। তখন ফেরেশতা বলবেন, আপনার জন্য দরজা খুলে দিতে আমাকে বলা হয়েছে। আপনার পূর্বে আর কারো জন্য এ দরজা খুলিনি। আপনার পর আর কারো জন্য দরজা খুলে দিতে উঠব না।

قطب الخضرى এ বর্ণনা সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং দুই বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন এ ভাবে যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে দ্বার রক্ষক কর্তৃক দরজা খুলে দেয়া স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক দ্বার খুলে দেয়ারই নামান্তর। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা.) বলেন, আমি বেহেশতে প্রবেশের সময় আল্লাহ তায়ালার জালালিয়ত প্রকাশ পাবে। আমি সিজদায় পতিত হব।

হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করার অর্থ কিয়ামতের পূর্বে তিনি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবেন। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী বেলাল (রা.) কর্তৃক সর্বপ্রথম বেহেশতের কড়া নাড়ার অর্থ উম্মতের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম তা করবেন। এ ভাবে হযরত ফাতিমা (রা.) সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবেন, এর অর্থ হল মহিলাদের মধ্যে

তিনি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

الاوسط গ্রন্থে আল্লামা তাবরানী (র.) সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি যতক্ষণ প্রবেশ করছি না ততক্ষণ নবীগণ জান্নাতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। অনুরূপ আমার উম্মতের পূর্বে অন্য কোন উম্মতের জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর এটা হচ্ছে মিরাজের রাতে আল্লাহ তায়ালা তাকে যা জানিয়েছিলেন, তার সারসংক্ষেপ। আল্লাহ বলেন فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى আর সম্ভবতঃ এটাই হচ্ছে সেই হাদীসের ভাবার্থ যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। যতক্ষণ না আমি ও আমার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করব, ততক্ষণ অন্যান্য সকল উম্মতের জন্য বেহেশতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এ কথার অর্থ এই নয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর পূর্বে অন্য কোন নবীও বেহেশতে যেতে পারবেন না। বরং তারা অন্যান্য নবীর পরে বেহেশতে যাবেন, কিন্তু অন্যান্য সকল উম্মতের পূর্বে বেহেশতে যাবেন। কারণ অন্যান্য উম্মতের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদীর বিচারকার্য সংঘটিত হবে বলে সহীহ বর্ণনা রয়েছে।

خصائص الصغرى গ্রন্থে আছে, রাসূল (সা.) হচ্ছেন বিশ্বের সর্বাধিক বুদ্ধিসম্পন্ন, বনী আদমের মধ্যে সর্বাধিক দাতা, যেভাবে তিনি সুন্দর চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর দিক থেকে সর্বাধিক মর্যাদাবান, সাহসী, বিজ্ঞ, পরিপূর্ণ।

রাসূল (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে আছে, তাঁর পূর্বাপর সকল ত্রুটি মার্জনা করে দেয়া হয়েছে। আমাদের কাতারকে ফেরেশতাগণের কাতারের মত করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মাতগণ নামায আদায় করতেন আলাদা আলাদা রূপে। তার উম্মতের উপর থেকে ভুলক্রমে কৃত অপরাধ মিটিয়ে দেয়া হয়। তাদেরকে সামর্থের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া হয় না। যে ভাবে সূরা বাকারার শেষ আয়াত হতে প্রমাণিত হয়। তাঁর সাথের শয়তানটি তার অনুগত হয়ে গিয়েছিল। خصائص الصغرى গ্রন্থে আছে তার সঙ্গী শয়তানটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর মধ্যে সতেরটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হাফিয ইবনে হজর (র.) বলেন, সবচেয়ে বেশী বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে পাওয়া যাবে। আবূ সাঈদ নিশাপুরী (র.) এর তাঁর লিখিত شرف المصطفى গ্রন্থে অন্যান্য নবী হতে রাসূল (সা.)-এর ৬০টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন।

তন্মধ্যে একটি হল ইসলাম নাম দ্বারা বিশেষিত করা কেবলমাত্র এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য উম্মতগণকে এরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা হত না। এই উম্মতই কেবলমাত্র ইসলাম বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, যা লাভ করেছিলেন কেবল মাত্র পূর্ববর্তী নবীগণ যা দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) অনুরূপ বলেছেন।

ওহী আগমনের পূর্বে মহানবী (সা.) ছয় মাস পর্যন্ত সত্য স্বপ্ন দেখতেন। এ কারণেই উত্তম স্বপ্নকে নবুওয়াতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ বলা হয়। কারণ ছয় মাস ২৩ বছরের ৪৬ ভাগের এক ভাগ আর নবীগণের স্বপ্ন ওহীর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মানুষের স্বপ্নের তাবীর নির্ধারণ করা হয় নিম্নরূপ ঃ যদি স্বপ্নদ্রষ্টা সৎ হয়ে থাকেন, তা হলে স্বপ্ন সত্য হয় যদি মিথ্যাবাদী হয়, তা হলে তার স্বপ্ন কল্পনাপ্রসূত চিন্তার মধ্যে গণ্য হবে। তাফসীরের কিতাব সমূহে আছে, স্বপ্নের তাবীর পঞ্চাশ বছর পরও প্রকাশ হতে পারে। ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন ও তাবীর একথার ওপর দলীল। তাঁর স্বপ্নের উল্লেখ সূরা ইউসুফে আছে।

ওহীর প্রকারভেদ

আল্লামা কাসতালানী (র.) লিখেন, ওহীর অনেক পদ্ধতি রয়েছে। ১ম পদ্ধতি হল সত্য স্বপ্ন। ২য় পদ্ধতি, ফেরেশতা নবীর (সা.) অন্তরে ওহীর বিষয়বস্তু ঢেলে দিতেন। নবী

Scanned with CamScanner

তাঁকে দেখেন না। ৩য় পদ্ধতি হল, ফেরেশতা কোন মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী বর্ণনা করেন আর নবী (সা.) তা পাঠ করেন। ৪র্থ পদ্ধতি, ওহী ঘন্টার আওয়াজের মত আসত আর এই পদ্ধতি হল সবচেয়ে কঠিন পদ্ধতি। এমনকি এই পদ্ধতিতে ওহী অবতীর্ণ হলে কঠিন শীতের দিনেও তাঁর কপাল মুবারক দিয়ে ঘাম নির্গত হত, তাঁর বাহন মাটিতে বসে যেতো। এভাবে একদিন মহানবী (সা.)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন তাঁর উরু মুবারক ছিল হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা.)-এর উরুর উপরে। তিনি এত ভার অনুভব করেছিলেন যেন তাঁর উরু বিদীর্ণ হয়ে যাবে! ৫ম পদ্ধতি হল, তিনি ফেরেশতাকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেন, যে আকৃতিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর প্রতি ওহী নাযিল করতেন, আল্লাহ যা ওহীর নির্দেশ দিতেন। এ ভাবে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে দু'বার, যেমন সূরা নজমে আছে। ৬ষ্ঠ পদ্ধতি হল, আল্লাহ তায়ালা সরাসরি সাত আসমানের উপর থেকে ওহী হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। যেমন নামায ও অন্যান্য বিধান। সপ্তম পদ্ধতি, আল্লাহ তায়ালা কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি কথা বলেছেন। যেমন মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর কথা বলা। কেউ কেউ ৮ম আরেকটি পদ্ধতি বর্ণনা করে থাকেন। তা হল আল্লাহ তায়ালা কোন পর্দা ছাড়াই সামনাসামনি কথা বলেন। এ পদ্ধতি তাঁরাই বলে থাকেন, যাঁরা বলেন রাসূল (সা.) তাঁর রবকে সরাসরি দেখেছেন।

আল্লামা হলবী (র.) বলেন, রাসূল (সা.) এর কাছে ওহী আসত ৪৬টি পদ্ধতিতে। তিনি এসব উল্লেখ করেন এবং অগ্রাধিকার দেন। যেমন فتح الباری এর গ্রন্থকার ওহী নাযিলকারী ফেরেশতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। আল্লামা হলবী (র.) হযরত উবাইদ বিন উমাইয়া (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি বছর একমাস হেরা গুহায় নির্জন বাস করতেন। কুরাইশরাও জাহিলী যুগে অনুরূপ নির্জন বাস করত।

রাসূল (সা.)-এর প্রতি ওহী অবতরনের পূর্বে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। কেউ বলেন, মূসা (আ.)-এর শরীয়তের যা মনসুখ হয়নি, কেবল তারই অনুসরণ করতেন। হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী লিখেন, রাসূল (সা.)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়া ও রিসালতের বাণী আসার পূর্বে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর শরীয়তের অনুসরণ করতেন। সুতরাং ওলীয়ে কামিলের জন্য কোন বিধানের স্পষ্ট জ্ঞান না আসার পূর্বে সেই পবিত্র শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। যতক্ষণনা আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অন্তরে কুরআন শরীফের বিধান ইলহাম করে দেবেন এবং তিনি হাদীস বিশারদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

নির্জনে ইবাদত করা নবী ও ওলীগণের বৈশিষ্টা। গুহার মধ্যে বসে ইবাদত করা কেবল রাসূল (সা.) হতে সাবিত নয়; বরং বেশীরভাগ নবীই বায়তুল্লাহ্-এ নির্জন বাস করছেন, যা বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী স্থান। সেখানে নামায পড়ার বিধান এখনো রয়েছে। এ কারণে সকল মানুষেরই স্বীয় নফসের সংশোধনের জন্য এক নির্ধারিত সময় নির্জন বাস জরুরী। এই বিষয়বস্তু মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী উল্লেখ করেন।

ওহী অবতরণ শুরু

কোন মাসে কোন তারিখে ওহী অবতরণ শুরু হয়, এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় রমযান শরীফে, সূরা انا انزلنا এর মধ্যে এর দলীল রয়েছে। তা ছাড়া লওহে মাহফুয হতে দুনিয়ার আসমানে সমগ্র কুরআন শরীফ লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে সবাই একমত। হেরা গুহায় সূরা আলাক এর علم بالقلم পর্যন্ত আয়াত মুহদ্দিসীনে কিরামের মতে রবীউল আউয়াল মাসে আট বা তিন তারিখ অবতীর্ণ হয়। এই মতই ইমামুল মুহাদ্দিসীন ফিল হিন্দ শাহ আবদুল হক মুহাদ্দীসে দেহলভী

(র.) তাঁর লিখিত مدارج النبوة গ্রন্থে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সে দিনটি ছিল সোমবার। এর উপর বিশুদ্ধ হাদীস দলীল প্রদান করে। হযরত মুহাদ্দীসে দেহলভী (র.) উপরোক্ত গ্রন্থে বলেন, হেরা গুহা হতে কাবা শরীফ দেখা যায় এবং এটা বাস্তব। কারণ আমি আমার নিজ চোখে তা দেখেছি। তিনি সেখানে বসে কলবী ও লিসানী যিক্‌র সমূহ করতেন এবং পূর্ববর্তী শরীয়তের যে সেকল বিধান আমাদের শরীয়তে মনসুখ হয়নি, সে সকল ইবাদত করতেন। কাবা শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন।

হলবী (র.) লিখেন, তিনি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ইবাদত করতেন। প্রথম ওহী রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে তিনি সাবিত করেন। কারণ প্রাতঃকালকে রাতের অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক। সোমবার সাবিত করার জন্য তিনি একখানা হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) হযরত বিলাল (রা.)-কে বলেন, সোমবারের রোযা যেন তোমার বাদ না যায়। কারণ ঐ দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐ দিনই আমার প্রতি প্রথম ওহী এসেছে। সোমবার দিন প্রত্যূষে হযরত জিবরীল (আ.) রাসূল (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.), আমি জিবরীল; আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি এই উম্মতের রাসূল। اقرأ باسم ربك الذى خلق এই বাণীর প্রতি জীন ও ইনসানকে দাওয়াত করুন এবং পড়ুন। রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, আমি পড়তে জানি না। তখন জিবরীল (আ.) তাঁকে বাহু বন্ধনে জড়িয়ে ধরলেন। এতে তাঁর সকল শক্তি চলে গেল। জিবরীল (আ.) দ্বিতীয় বার অনুরূপ করলে তাঁর শক্তি ফিরে এল। তিনি নিজে নিজে পড়তে লাগলেন-

اقرأ باسم ربك الذى خلق হতে علم الانسان مالم يعلم পর্যন্ত রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথে পড়তে লাগলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জিবরীল (আ.) প্রথমে রাসূল (সা.)-কে বললেন استعذ بالله يا محمد হে মুহাম্মদ (সা.), আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। রাসূল (সা.) বললেন, استعذ بالله من الشيطان الرجيم এরপর জিবরীল (আ.) বললেন, আপনি বলুন, بسم الله الرحمن الرحيم রাসূল (সা.) তা বললেন। এর পর জিবরীল (আ.) বললেন, পড়ুন। اقرأ باسم ربك الذى خلق

জিবরীল (আ.)-এর আলিঙ্গনে রাসূল (সা.) এর শক্তি বিলুপ্ত হওয়ার মধ্যে একটি রহস্য নিহিত রয়েছে। তা হল, সাধনার মাধ্যমে শারীরিক শক্তি বিলুপ্ত হলে আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এরপর জিবরীল (আ.) যমীনের উপর পা দ্বারা আঘাত করলেন। সেখানে একটি ঝর্ণা সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি সেই পানিতে ওযূ করলেন। ওযূতে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার করে ধৌত করলেন। মাথা একবার মাসেহ করলেন। রাসূল (সা.)ও সেই পানি দ্বারা ওযূ করলেন। এরপর জিবরীল (আ.) সামনে গিয়ে খাড়া হলেন। রাসূল (সা.) তাঁর পেছনে মুক্তাদী হয়ে দাঁড়ালেন এবং দু' রাকাত নামায আদায় করে জিবরীল (আ.) বলতে লাগলেন, এ ভাবে ওযূ ও নামায আদায় করতে হয়। হযরত জিবরীল (আ.) শারীরিক ও ভাষাগত শিক্ষা দিয়ে ফিরে গেলেন। রাসূল (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-এর ঘরে তশরীফ নিয়ে আসলেন। তখন তাঁর শরীর মুবারক কাঁপছিল। তিনি খাদীজা (রা.)-এর কাছে পৌঁছে বলতে লাগলেন زملونى-زملونى অর্থাৎ আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে কম্বল দ্বারা আবৃত করলেন। এরপর রাসূল (সা.) তাঁর পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং নিজের প্রাণের আশংকা প্রকাশ করলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে হযরত খাদীজা (রা.) বলতে লাগলেন, আপনার কোন আশংকা নেই। আল্লাহ আপনার পক্ষে ভাল ছাড়া মন্দ কোন কিছু ঘটাবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন,

Scanned with CamScanner

মেহমানদারী করেন, অপরের ফরিয়াদ শ্রবণ করেন, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, এতীমের দেখাশুনা করেন। ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, সাহায্য দান, কল্যাণ কাজ ছাড়া আপনি কিছুই করেন না। এমন মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করেন না। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত খাদীজা (রা.) আনন্দের আতিশয্যে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি নবুওয়াতের সুসংবাদ পূর্ব হতেই অবগত ছিলেন। যখন খাদীজা (রা.)-এর হুঁশ ফিরে এল, তিনি রাসূল (সা.)-কে নিয়ে ওরাকা বিন নওফলের কাছে গেলেন। ওরাকা বিন নওফল এই অবস্থার কথা শুনে বললেন, হে মুহাম্মদ! তিনি ঐ ফিরিশতা যিনি মূসা (আ.)-এর কাছে আসতেন। আপনি সেই নবী, যাঁর সুসংবাদ হযরত ঈসা (আ.) দিয়েছিলেন এই বলে, "আমার পরে এক নবী প্রেরিত হবেন, যাঁর নাম হবে আহমদ। হে মুহাম্মদ (সা.), আপনার উপর জিহাদ ফরয করে দেয়া হবে।"

আফসোস। আমি যদি সেই সময় যুবক ও সুস্থ থাকতাম, যখন আপনার গোত্রের লোক আপনাকে দেশ হতে বের করে দেবে। তখন রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে কি বের করে দেয়া হবে? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, আপনার মত নবীগণকে কাফিররা বের করে না দিয়ে ছাড়েনি। যদি আমি সেই সময় থাকতাম, তা হলে আপনাকে সাহায্য করতাম। ওরাকা বিন নওফল মুক্তিপ্রাপ্ত। কারণ তিনি মহানবী (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছেন। যদিও তিনি আহলে ফিতরাত ছিলেন তবুও ইবনে হিন্দাহ তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। (মাদারিজুন নবুওয়াত)

তারীখে ইবনে খালদুন-এর হাশিয়ায় আছে, জিবরীল (আ.) রাসূল (সা.)-কে উপত্যকার দিকে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে মাটিতে আঘাত করে পানি বের করলেন। এরপর ওযূ করে নামায আদায় করলেন। মহানবী (সা.) জিবরীল (আ.)-এর ইক্তেদা করে নামায আদায় করলেন। নামায ও ওযূর প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি মক্কা শরীফ তশরীফ নিলেন এবং হযরত খাদীজা (রা.) কে ওযূ ও নামাযের তালীম দিলেন। ওয়াকীদী বললেন, সকল ঐতিহাসিক ও সীরাত লেখক এ কথার ওপর একমত যে, হযরত খাদীজা (রা.) হচ্ছেন সর্বপ্রথম আহলে কিবলা, যিনি রাসূল (সা.)-এর দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করলেন।

ইমাম হলবী (র.) ইবনে দাহিয়া হতে বর্ণনা করেন ঃ উদাস যখন বালক ছিলেন, তখন নীনবী-এর অধিবাসী ইবনে রবীয়ার সাথে তাঁর দেখা হল। তাঁর কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল। হযরত খাদীজা তাঁর কাছে জিবরীল (আ.) সম্পর্কে জানতে চেয়ে লোক পাঠালেন। উদাস জবাব দিলেন, তিনি হচ্ছেন قدوس-قدوس (পবিত্র পবিত্র)....।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, উদাস হযরত খাদীজা (রা.)-কে বললেন, হে খাদীজা, শয়তানকে অনেক সময় মানুষের কাছে পাঠানো হয়। তখন সে অনেক বিষয় দেখাতে পারে। সুতরাং তুমি আমার এই কিতাব ধর এবং তা নিয়ে তোমার সাথীর কাছে চলে যাও। যদি তিনি পাগল হন, তা হলে তা সেরে যাবে। আর যদি তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে হয়, তা হলে কিছুই তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এরপর খাদীজা (রা.) চিঠিখানা সাথে নিয়ে চলে গেলেন। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করে, দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরীল (আ.)-এর সাথে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করছেন-

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ۔ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ۔ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ۔ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ۔ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ۔

খাদীজাও তা শুনে তা তিলাওয়াত করলেন এবং আনন্দে কেঁপে উঠলেন। এরপর তিনি রাসূল (সা.)-কে বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবানী হোন। আপনি

আমার সাথে উদাসের কাছে চলুন। যখন উদাস তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পিঠ মুবারক হতে কাপড় উত্তোলন করলেন। তিনি দেখলেন, নবুওয়তের মোহর তাঁর দুই কাঁধ মুবারকের মধ্যখানে চমকাচ্ছে। উদাস মোহরে নবুওয়াতের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই সিজদায় পতিত হলেন। তিনি বললেন, পবিত্র আল্লাহর কসম!! আপনি সেই নবী যাঁর সুসংবাদ মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) দুজনই দিয়েছিলেন।

যদি এই ঘটনা ওরাকার কাছে যাওয়ার পূর্বে হয়ে থাকে, তা হলে প্রমাণিত হবে যে, সূরা নূন, সূরা আলাকের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ তা মশহুর বর্ণনার বিপরীত। সূরা নূন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণিত আছে- যখন মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে পাগল (নাউযুবিল্লাহ) বলতে শুরু করল, তখনই সূরা নূন অবতীর্ণ হয়। এর জবাব ইমাম হলবী (র.) এ ভাবে দেন; প্রথমত উদাস নিয়ে বক্তব্য রয়েছে। উদাস নামের দু'জন লোক একই স্থানে ছিলেন, একই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, এমনকি একই লোক উতবা বিন রবীআর গোলাম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সম্পর্কে অধিক বিজ্ঞ ছিলেন। মহানবী (সা.) এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য হযরত খাদীজা (রা.) বিভিন্ন সময় তাঁর কাছে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

যেমন ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আওয়াজ শ্রবণ করে যখন রাসূল (সা.) ঘরে ফিরেছিলেন, তখন এ সম্পর্কে জানার জন্য খাদীজা (রা.) উদাসের কাছে গিয়েছিলেন। আর সূরা নূন অবতীর্ণ হল যখন ইসলামের প্রাথমিক সময়ে মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে পাগল বলে মন্তব্য করেছিল। এই সময় উদাস এই চিঠি লিখে খাদীজা (র.)-এর হাতে দিলেন। খাদীজা ফেরত যাওয়ার পর এই দুটি বিষয়ের জবাবে আল্লাহ তায়ালা সূরা নূন অবতীর্ণ করেন। আর হতে পারে উক্ত সূরা দু'বার অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম শাবী (র.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) এর বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন তাঁর কাছে ওহী আসে। প্রথম তিন বছর পর্যন্ত তাঁর নবুওয়াতের সাথে ইসরাফিল (আ.) সম্পৃক্ত ছিলেন। এরপর হযরত জিবরীল (আ.) সম্পৃক্ত হলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, এই তিন বছর তিনি ইসরাফিল (আ.)-এর অনুভূতি শুনতে পেতেন; তাঁর সত্তাকে দেখেননি। তিনি একটির পর একটি বিষয় তাঁকে শিক্ষা দিতে থাকেন।

রাসূল (সা.)-এর কাছে ওহী আসার পূর্বে তিনি আওয়াজ শুনতে পেতেন, কে যেন তাঁকে ডাকছে! তিনি পেছন ফিরে কিছুই দেখতে পেতেন না। এক পর্যায়ে তিনি আহ্বানকারীকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সাথে অন্য কেউ থাকলে তিনি কিছুই দেখতেন না। একদিন তিনি খাদীজা (রা.)-এর কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, খাদীজা! আমার আশংকা হয় হয়ত কোন জীন আমার উপর ভর করেছে যা আমার ধ্বংসের কারণ হতে পারে। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে ওরাকার কাছে নিয়ে গেলেন। ওরাকা তাঁর সংবাদ শুনে তাঁকে সুসংবাদ দিলেন; আমি মনে করি তিনি এই উম্মতের নবী হবেন, যিনি তাঁর কাছে আসেন, তিনি ঐ ফেরেশতা, যিনি মূসা ও ঈসা (আ)-এর কাছে আসতেন। হে খাদীজা, আমি এখনি তাঁকে পরীক্ষা করে নেব। যখন তিনি আহ্বানকারীকে দেখবেন, তখন তুমি তাঁকে তোমার কোলে বসিয়ে নেবে এবং জিজ্ঞেস করবে, এখন দেখছ কি না? যদি বলেন, দেখছেন, তা হলে তুমি তোমার মাথার কাপড় ফেলে দেবে এবং আবার প্রশ্ন করবে। যদি এবারও বলেন, দেখছেন, তা হলে এটা জীন হবে আর যদি না দেখেন, তা হলে ফেরেশতা। কারণ ফেরেশতা কোন খোলা মাথার মহিলার কাছে অবস্থান করেন না। ইলমে ইয়াকীন লাভের জন্য ওরাকা এই পরীক্ষার কথা বলেছিলেন। কারণ আহ্বানকারী ফেরেশতা হওয়ার মধ্যে কারো

Scanned with CamScanner

সন্দেহ ছিল না। খাদীজা (রা.)-এর পরীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে হাময়িয়া গ্রন্থকার তাঁর কবিতায় বলেন-

واتاه فى بيتها جبريل+والذى للب فى الامورارتياء
فاما صلت عنها الخمار اتدرى + هو الوحى ام هوالانماء
فاختفى عند كشفها الرأس جبرئيل + فعاعادا واعيد الغطاء
فاستبانت خديجة انه كنز+الذى حاولته والكيماء-

তাঁর ঘরে জিবরীল এলেন, তাঁর সকল কাজেই গবেষণামূলক বিচার-বুদ্ধি ছিল। তিনি (খাদীজা) তাঁর উড়না সরিয়ে দিলেন এ কথা জানার জন্য যে, এটা কি ওহী না কি তাঁর উপর (জীনের) প্রভাব পড়েছে ? তাঁর উড়না সরানোর সাথে সাথে জিবরীল অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি আর ফিরে আসেননি যতক্ষণ না পুনরায় মাথা ঢাকা হয়। তখন খাদীজার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি এক ওস্তখনি যে খনি তিনি পাওয়ার আকাঙ্খায় ছিলেন।

হযরত খাদীজা বলেন, আমি মাথার উড়না সরিয়ে দিলাম; তখন জিবরীল (আ.) অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, রাসূল (সা.)-এর কাছে যা পেশ করা হচ্ছে, তা ওহী; জীনের প্রতিক্রিয়া নয়। কারণ ফেরেশতা মহিলাদের অনাবৃত মাথা দেখেন না। জীনেরা তার বিপরীত : এই পরীক্ষার পর হযরত খাদীজা (রা.) ওরাকাকে সংবাদ জানালেন। ওরাকা বললেন, আগন্তুক অবশ্যই ফেরেশতা। এই বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে সমতা বিধান এভাবে সম্ভব যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল ওহী সাময়িক বন্ধ হওয়ার পর সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণ হওয়ার পর।এখানে প্রথম বলতে اضافى প্রথম বুঝানো হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم- সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। কারো মতে তা সূরা নমলের একখানা আয়াত। প্রত্যেক সূরার শুরুতে বরকতের জন্য আনা হয়েছে। সুহাইলী (র.) এই মত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা বলব, ইহা কুরআন শরীফের একখানা আয়াত, সূরার সাথে সম্পৃক্ত। হাফিয দিমইয়াতী বলেন, সূরা اقرأ- বিসমিল্লাহ ছাড়া অবতীর্ণ হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, বিসমিল্লাহ সকল সূরার একখানা আয়াত। ইমাম নববী (র.) বলেন, বিসমিল্লাহ কোন সূরার প্রথম আয়াত নয় বরং ইহা দুই সূরার মধ্যে পার্থক্য করতে এবং বরকত লাভের জন্য সকল সূরার শুরুতে লেখা হয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার একখানা আয়াত। তাঁর অন্য এক বর্ণনামতে বিসমিল্লাহ সকল সূরার এক আয়াত, যদিও প্রত্যেক সূরা অবতীর্ণের সময় বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হয়নি; পরে আলাদাভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। সকল মতের পক্ষে দলীল রয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর কাছে হযরত জিবরীল (আ.) তিন সূরতে আসতেন। ১. তাঁর আসল সূরতে। ২. হযরত দাহিয়া কলবী (র.)-এর আকৃতিতে, ৩. অন্য কোন মানুষের আকৃতিতে। বুখারী শরীফে আছে, হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূল (সা.)-এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় আমাদের কাছে একজন লোক এলেন ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত, চকচকে কাল চুল বিশিষ্ট। তাঁর চেহারায় সফরের কোন চিহ্ন নেই, অথচ আমাদের কেউই তাঁকে চিনে না (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে। যখন ফেরেশতা কোন মানুষের আকৃতি ধারণ করেন, তখন তাঁর আসল শরীরটা রূহ ছাড়া জীবিত থাকে না মরে যায়? এর জবাবে বলা যায়, রূহ

শরীর হতে আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না বরং শরীরের রূপই পরিবর্তিত হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণের মধ্যে শূন্যে উড়া ও ইচ্ছা মত যে কোন কিছুর আকৃতি ধারণের ক্ষমতা দিয়েছেন। যেমন জীনরা অনুরূপ করতে পারে। এ কারণেই হাফিয ইবনে হজর (র.) বলেন, ফেরেশতা কর্তৃক কোন মানুষের আকৃতি ধারণ করার অর্থ এই নয় যে, তাঁর সত্তাই মানুষে পরিণত হয়ে যায় বরং এর অর্থ হল তিনি এই আকৃতিতে প্রকাশিত হন। আসল কথা হল, এই অতিরিক্ত ক্ষমতা তাঁর নিজের সত্তাকে বিলুপ্ত ও ধ্বংস করে না; বরং তা কেবল দর্শকের দৃষ্টির বাইরে থাকে।

কোন কোন শিয়া ইহা হতে বস্তুর বিভিন্ন রূপ ধারণের দলীল গ্রহণ করতঃ আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন বস্তুর রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করার দাবী করে থাকে। তারা হযরত বায়জীদ বুস্তামী (র.)-এর উক্তি سبحانى ماعظم شانى- হতে ও حلول এর দলীল গ্রহণ করে থাকে। ইমাম হলবী (র.) বায়জীদ বুস্তামী (র.)-এর উক্তির জবাব এভাবে দিয়ে থাকেন, "বায়জীদ তা এজন্য বলেছেন, যেহেতু তিনি আমলের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার খুবই নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহর তওহীদ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন, যার ফলে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সব কিছু হতে বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি তিনি নিজের অস্তিত্বের মধ্যে কেবল আল্লাহর অস্তিত্ব দেখতে পেতেন। এটা হচ্ছে 'ফানা' এর স্তর- নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে সকল বিষয়কে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়ার স্তর। এটা নিজের পক্ষ হতে যাবতীয় ইচ্ছা ও ইখতিয়ার পরিত্যাগ করার স্তর।" এমনকি সূফিয়ায়ে কিরাম, যাঁরা কেবল আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাঁদের পক্ষ হতেও حلول সাব্যস্ত নেই।

বিষয়টি অনুধাবনের জন্য একটি উপমাই যথেষ্ট, যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। এক টুকরা লোহা আগুনে পুড়ানোর ফলে তাতে আগুনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়ে যায়। তা হলে কোন বান্দা দীর্ঘদিন আল্লাহর একত্বের তজল্লীর সাথে ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত থাকলে তার মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়া যুক্তি বহির্ভূত কেন হবে? ইমাম হলবী (র.) ফেরেশতাগণের বিভিন্ন রূপ ধারণকে এর উপর উপমা পেশ করে থাকেন। তিনি বলেন,"যেমন ফেরেশতাগণের রূপ পরিবর্তন। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে গমন করেন, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি পরিগ্রহ করে থাকেন। ইবনুম সবকী তাঁর طبقات- গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ওলীগণের কারামতের এক প্রকার হল তাঁদের বিভিন্ন ধরনের দেহাবয়ব থাকবে। মূলত আকৃতি চার ধরনের ১. صورت حقيقى ২. صورت ظلى ৩. صورت عكسى ৪. صورت مثالى ওলীগণের বিভিন্ন আকৃতি ধারণ 'সূরতে মিসালী'র দিক থেকে হয়ে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী لولا ان رأى برهان ربه এর মধ্যে برهان- বলতে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর আকৃতি তাঁর সামনে পেশ করে দেয়া হয়েছিল, অথচ তখন তিনি ছিলেন মিসরে আর ইয়াকুব (আ.) ছিলেন শাম দেশে।" এটা সূরতে মিসালীর উপমা। যখন মানুষ তার রূহের সাথে অন্য সব সম্পর্ক দূর করে দেবে, তখন যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারে। এটা হতে ওলীগণের আকাশে উড্ডয়নের কারামত অনুধাবন করা যেতে পারে।

ওহী অবতরণের পদ্ধতি

ওহীর প্রকারভেদ আলোচনা করা হল। এখন ওহী অবতীর্ণের পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন, যখন রাসূল (সা.)-এর কাছে ওহী অবতীর্ণ হত, তখন ইহা তাঁর কাছে খুব ভারী মনে হত। একবার তাঁর উরু মুবারক আমার উরুতে রাখলেন। আল্লাহর কসম! তখন তাঁর উরু মুবারকের চেয়ে ভারী

Scanned with CamScanner

কোন বস্তু আছে বলে আমার,মনে হল না। কোন কোন সময় তিনি বাহনের উপর আরোহী অবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হত। তখন তা চীৎকার করত। মনে হত যেন এর পা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যখন রাসূল (সা.)-এর প্রতি সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হল, তখন তিনি তাঁর উটনীর উপর ছিলেন। উটনী তাঁকে বহন করতে পারল না। তিনি তা থেকে নেমে গেলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সূরার ভারে তাঁর বাহন 'আসবার' কাঁধ সংকুচিত হয়ে গেল। অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) বলেন, যখনই আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তখনই মনে হয় যেন আমার প্রাণ উঠিয়ে নেয়া হবে। হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) বর্ণনা করেন, যখন রাসূল (সা.) -এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হত, তখন তিনি প্রায় বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

ওফা গ্রন্থকার একটি প্রশ্ন আনেন, ওহী অবতরণের সময় যখন রাসূল (সা.)-এর প্রায় বেহুঁশ অবস্থা হত, তখন তাঁর ওযূ ভঙ্গ হত কি না ? তিনি আবার জবাব দেন-

تنام عيناه ولا ينام قلبه-

তাঁর চোখ নিদ্রা গেলেও কলব নিদ্রা যেত না।

কোন কোন সময় ওহী কোন মাধ্যম ছাড়াই স্বপ্নযোগে আসত। হযরত মুআয (রা.)-এর বর্ণনা- মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, "আমি আমার রবকে সর্বোত্তম সূরতে দেখলাম। আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মদ! উর্ধ্বজগতের ফেরশতাগণ কোন বিষয় নিয়ে বাক-বিতন্ডা করছেন? আমি বললাম, হে রব, আপনি তা ভাল জানেন। তখন তিনি আমার দু' কাঁধের মধ্যিখানে তাঁর হাত রাখলেন। আমি তার শীতলতা আমার বুকের মধ্যে অনুভব করলাম। এরপর আমি আকাশ ও যমীনের মধ্যভাগের সব কিছু জেনে নিলাম।" অন্য বর্ণনায় আছে-فعلمت علم الاولين والاخرين-

কুরআন অবতীর্ণের সময় তা সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণও সাথে অবতরণ করতেন। তাঁরা শয়তানকে তাড়িয়ে দিতেন, যাতে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় সে আড়ি পেতে তা শুনে নিয়ে তার বন্ধু তথা জ্যোতিষদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারে। (ইতকান)

নামায ফরয হওয়া

যখন মহানবী (সা.) হেরা গুহা হতে ফিরতেন, তখন পথিমধ্যে যত গাছ বা পাথর পাওয়া যেত, সবাই বলত- الصلوة والسلام عليك يارسول الله

এমতাবস্থায় তিনি হযরত খাদীজা (রা.)-এর কাছে তশরীফ আনলেন এবং তাঁর অবস্থা বর্ণনা করলেন। ইহা শুনে হযরত খাদীজা (রা.) আনন্দের আতিশয্যে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তাঁর হুঁশ ফিরে এলে রাসূল (সা.) তাঁকে নিয়ে দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। ইহা ছিল প্রথম নামায। প্রথম নামায দু' রাকআত করে ফরয করা হয়েছিল। এরপর সফর অবস্থায় দু' রাকআত থাকল এবং মুকীম অবস্থায় আরও দু' রাকআত বাড়িয়ে দেয়া হল। মুকাতিল (র.) বলেন, প্রথমতঃ ফজরের দু' রাকআত ও আসরের দু' রাকআত নামায ফরয ছিল।

আল্লাহর বাণী-وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا-

ইমাম নববী (র.) বলেন, সর্বপ্রথম আল্লাহর শাস্তির ভয় ও তওহীদের প্রতি আহ্বান ওয়াজিব করা হয়। এরপর রাতের নামায ফরয করা হয়। যেমন সূরা মুয্যাম্মিলের শুরুতে উল্লেখ রয়েছে। এরপর মিরাযের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পর قيام الليل-এর নামায রহিত হয়ে যায়। এ বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, মিরাযের পূর্বেই ওযূ ফরয করা হয়। আল্লামা কাসতালানী (র.) বলেন, প্রথমে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর তিন

বছর পর্যন্ত হযরত ইসরাফীল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতেন এবং তাঁকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী শিক্ষা দিতেন। তিন বছর পূর্ণ হলে জিবরীল আমীন তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসতে লাগলেন। ইবনে ইসহাক এটা জোর দিয়ে বলেন। তারীখে ইমাম আহমদে এই মর্মের বর্ণনা রয়েছে। ইয়াকুব বিন সুফিয়ান শাবী, ইবনে সাদ, বায়হাকী (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাফিয জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর উপর দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন। ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও হাকীম (র.) তা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সা.) বসা ছিলেন। তাঁর পাশে ছিলেন জিবরীল (আ.)। এমন সময় উপরের দিকে আকাশে কিসের আওয়াজ শুনলেন। জিবরীল (আ.) আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করলেন। এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! এই একজন ফেরেশতা অবতরণ করেছেন। তিনি পৃথিবীতে আর কখনো অবতরণ করেননি। তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে এলেন। তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন, আপনি দুটি আলোকের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে প্রদান করা হয়েছে। আপনার পূর্বে আর কাউকে তা প্রদান করা হয়নি। এ দুটি হচ্ছে, ফাতিহা শরীফ ও সূরা বাকারার শেষাংশ।

আরো অনেক হাদীস দ্বারা হযরত ইসরাফীল (আ.) মহানবী (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার প্রমাণ মিলে। তিনি আমাদের রাসূল (সা.) ছাড়া আর কোন নবীর কাছে আসেননি। কেউ বলেন, ইসরাফীল (আ.) কেবল ওহী অবতরণ বন্ধ থাকাকালে এসেছিলেন। কিন্তু এ কথা কোন অবস্থায়ই মেনে নেয়া যায় না। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, তিনি রাসূল (সা.)-এর কছে তিন বছর পর্যন্ত এসেছিলেন। আর ওহী বন্ধ ছিল সর্বোচ্চ ৪০ দিন বা ৩০ দিন। এক বর্ণনায় ১৫ দিনের কথাও এসেছে। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীতে উল্লেখ আছে, তিন বছর পর্যন্ত ইসরাফীল (আ.) রাসূল (সা.)-এর খিদমতে আসেন। এ সময় জিবরীল (আ.)ও রাসূল (সা.)-এর সম্মানার্থে এসেছিলেন।

সূরা اقرأ সূরা مدثر- এর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত আছে। কারণ আবূ উমর বিন আবদুল বার বলেন, রিসালতের পূর্বে নবুওয়াত এসেছে। আবূ উমামা বিন ফিকাশ বলেন, সূরা اقرأ অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে নবুওয়াত রয়েছে এবং সূরা مدثر এর মধ্যে ভীতি প্রদর্শন, সুসংবাদ দান ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়। এ কারণে سورة مدثر পরে অবতীর্ণ হয়। আর যেহেতু اقرأ সূরার মধ্যে মানুষের সৃষ্টি, মর্যাদা ও বুদ্ধির কথার উল্লেখ রয়েছে, এ কারণে তা পূর্বে অবতীর্ণ হওয়াই যুক্তিসংগত। কারণ প্রথমতঃ মানুষের আদি থেকে উৎকর্ষের চরম সীমার আলোচনা করা হল, অতঃপর তার উপর শরীয়তের বিধান সমূহ নাযিল করা হল। এই ধারাবাহিকতা এতে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম যিনি ঈমান গ্রহণ করেন

মাওয়াহিব গ্রন্থকার লিখেন, সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণকারী হলেন হযরত খাদীজা (রা.)। এর পর হযরত আবূ বকর (রা.), এরপর হযরত আলী (রা.)। ইমাম হলবী (র.) লিখেন, হাদীস বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকগণ এ কথার ওপর একমত যে, সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণকারী হচ্ছেন হযরত খাদীজা (রা.)। তাফসীরকারক সালাবী (র.) এ কথার উপর ঐকমত্য হয়েছে বলে বর্ণনা করেন। ইমাম নববী (র.) বলেন, এটাই মুহাক্কীকগণের নিকট সঠিক মত। ইবনে আসীর লিখেন, খাদীজা (রা.) হলেন ইজমায়ে উম্মত অনুসারে আল্লাহর সৃষ্টির প্রথম মুসলমান (চূড়ান্ত পর্যায়ে)। তাঁর পূর্বে কোন পুরুষ বা নারী কেউই ইসলাম গ্রহণ করেননি। ইবনে ইসহাকও এই মত গ্রহণ

Scanned with CamScanner

করেন। তিনি বলেন, এর পর হযরত আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত সালমান (রা.) হতে মরফু হাদীস বর্ণিত ঃ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, এই উম্মতের সর্বপ্রথম হাওযে অবতরণ করবেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি আর তিনি হচ্ছেন আলী বিন আবূ তালিব (রা.)।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, যখন রাসূল (সা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-কে আলী (রা.)-এর সাথে বিয়ে দিলেন, তখন তাঁকে বলেছিলেন, তোমার স্বামী ইহকাল ও পরকালের সর্দার। আর তিনি হচ্ছেন আমার সাহাবীদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ও সর্বাধিক ধৈর্যশীল।' ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। কারণ এ কথার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল আট বছর। ওহী অবতরণের পূর্ব হতেই হযরত আলী (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে থাকতেন। তখন কুরাইশগণ দুর্ভিক্ষে নিপতিত ছিল বলে পরিবারের ব্যয়ভার লাঘবের জন্য হযরত আব্বাস (রা.) হযরত যাফর (রা.)-এর এবং রাসূল (সা.) হযরত আলী-এর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় হযরত আলী (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে থাকতেন। হযরত আলী (রা.)-এর মাতা হযরত ফাতিমা বিনতে উম্মে আসাদ বর্ণনা করেন, আলী (রা.)-এর জন্ম হলে রাসূল (সা.) তাঁর নাম রাখলেন আলী এবং তাঁর মুখে রাসূল (সা.)-এর মুখের লালা মুবারক দিলেন। এরপর রাসূল (সা.)-এর জিহ্বা মুবারক তাঁর মুখের ভিতর রাখলেন। আলী (রা.) তা চুষে চুষে ঘুমিয়ে গেলেন। পরদিন যখন ধাত্রী ডাকা হল, আলী (রা.) কোন মহিলার স্তনে মুখ দিলেন না। এ জন্য আমি আবার মুহাম্মদ (সা.)-কে ডাকলাম। রাসূল (সা.) তাঁর জিহ্বা মুবারক তাঁর মুখে দিলে তিনি আবার ঘুমিয়ে গেলেন। এভাবে যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা, ততদিন চলল। ফাতিমা বিনতে আসাদ বলেন, আলী আমার গর্ভে থাকাকালে একদিন আমি হুবলকে সিজদা করতে চাইলাম। সাথে সাথে আমার পেটের ভেতর আলী ধনুকের মত হয়ে গেলেন এবং আমাকে সিজদা করতে দিলেন না। হযরত আলী (রা.) তাঁর ভাইদের মধ্যে ছোট ছিলেন। তাঁর আরও তিন ভাই ছিলেন। তাঁরা হলেন তালিব, আকীল ও যাফর। একজন অপর জনের চেয়ে দশ বছরের ছোট-বড় ছিলেন। তালিবকে জীন প্রভাবিত করেছিল। এ জন্য তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। বাকী সবাই মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ নিম্নরূপ ঃ তিনি একদিন রাসূল (সা.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। এমন সময় রাসূল (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-কে নিয়ে চুপে চুপে নামায পড়ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? রাসূল (সা.) তাঁকে নামায ও ইসলামের প্রকৃতি বুঝিয়ে দিলেন এবং তাঁকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করলেন। আলী (রা.) তাঁর পিতার সাথে পরামর্শ করে জবাব দেয়ার কথা বললেন। রাসূল (সা.) এই গোপনীয় রহস্য প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। পরদিন প্রত্যূষে পিতার সাথে পরামর্শ ছাড়াই তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

ইমাম হলবী লিখেন, এ ঘটনা ছিল মঙ্গল বার দিন সকালে। কারণ, তিনি খাদীজাকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন সোমবার সন্ধ্যা বেলা। اسدالغابة ـ سيرة الدمياطى ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আবূ তালিব দেখলেন, রাসূল (সা.) আলী (রা.)-কে ডান দিকে রেখে নামায আদায় করছেন। তিনি হযরত যাফরকে বললেন, তুমি গিয়ে বাম দিকে দাঁড়িয়ে নামাযে শরীক হয়ে যাও। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, আলী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সামান্য পরেই যাফর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় আলী (রা.)-এর বয়স ছিল আট বছর। তখন তাঁকে বুদ্ধিমান ছেলেদের মধ্যে গণ্য করা হত।

খয়বরের যুদ্ধের বছর অপ্রাপ্তবয়স্কদের শরীয়তের বিধানের বহির্ভূত হওয়ার নির্দেশ জারী হয়। বায়হাকী (র.) বলেন, বালিগ হওয়ার সাথে শরীয়তের আহকাম সম্পৃক্ত হয় খন্দকের যুদ্ধের বছর। কোন বর্ণনামতে, হুদাইবিয়ার বছর। এর পূর্বে বিচার-বুদ্ধির উপর তা বিবেচনা করা হত। বাল্য বয়সে ইসলাম গ্রহণের পক্ষে আলী (রা.) নিজে তাঁর একটি কবিতায় ইঙ্গিত প্রদান করেন নিম্নরূপ-

محمد النبى اخى وصهرى + وحمزة سيد الشهداء عمى
وجعفرالذى يضحى ويمسى + يطير مع الملائكة ابن امى
وبنت محمد سكنى وعرسى + مشوب لحمها بدمى ولحمى
وسبطااحمد ابناى منها + فمن منكم له سهم كسهمى
وسبقتر الى الاسلام طرا + صغيرامابلغت وان حلمى۔

"নবী মুহাম্মদ (সা.) আমার ভাই ও শ্বশুর। শহীদগণের সর্দার হামযা (রা.) আমার চাচা। যাফর, যিনি দুপুর সন্ধ্যা ফেরেশতাদের সাথে শূন্যে উড়ছেন, তিনি আমার ভাই। মুহাম্মদ (সা.)-এর মেয়ে আমার আবাসস্থল ও বাসর। তাঁর দেহ আমার রক্তে মাংসে সম্পর্কিত। আহমদ (সা.)-এর দুই দৌহিত্র নবী-দুহিতার পক্ষ হতে আমার ছেলে। তা হলে তোমাদের মাঝে আমার মত এমন বিরাট অংশ আর কার রয়েছে ? আমি বাল্যকালে ইসলাম গ্রহণ করে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছি। আমার ইসলাম গ্রহণের সময় আমি বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হইনি।"

ইমাম কাসতালানী (র.) ইমাম তাবারী (র.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণের সময় দশ বছর বয়সের ছিলেন। আর খাদীজা (রা.)-এর পর প্রথম মুসলমান হলেন তিনি। এ মত পোষণ করেন ইবনে আবদুল বার, সুলাইমান, আবূ যর, খাব্বাব, জাবির, আবূ সাঈদ খুদরী, যায়িদ বিন আরকম, ইবনে শিহাব ও কাতাদাহ রিদ্বওয়ানুল্লাহি আজমাঈন। এর সপক্ষে খুজাইমার কবিতা-

اليس اول من صلى لقبلتكم+ واعلم الناس بالقرآن والسنن۔

তিনি কি তোমাদের কিবলাকে অনুসরণকরে প্রথম নামায আদায় কারীনন? আর তিনি কি কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাতনন?

আল্লামা যুরকানী (র.) বলেন, হযরত খাদীজা (রা.) প্রথম মুসলমান হওয়ার ক্ষেত্রে সকল উলামায়ে কিরাম একমত। বিতর্ক হল, তাঁর পর আবূ বকর (রা.), আলী (রা.), ওরাকা (রা.)-এর মধ্যে কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর নবুওয়াতের সত্যায়ন ওরাকা করেছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আবার কারো মতে, যায়িদ বিন হারিসা বা বিলাল (রা.) প্রথমে ঈমান আনেন। কিন্তু مواهب গ্রন্থকার বলেন, সকল বর্ণনার মধ্যে এ ভাবে সামঞ্জস্য প্রদান করা উচিত যে, সর্বপ্রথম সাধারণ ভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদীজা (রা.), অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আলী (রা.)। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দাসদের মধ্যে প্রথম মুসলমান হযরত বিলাল (রা.)। হযরত ময়মুন বিন মেহরান (রা.)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে হযরত আবূবকর (রা.) আঠার বছর বয়সে সিরিয়া সফরে বুহায়রার কাছ থেকে মহানবী (সা.)-এর গুণাবলী শুনে ঈমান এনেছিলেন। এর দ্বারা تصديق অর্থ গ্রহণ করা হবে। এরপর হযরত উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর যথাক্রমে যুবাইর বিন আওয়াম, আবদুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন

Scanned with CamScanner

ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবূবকর (রা.) তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁদের পরে হযরত আবূ উবায়দা আমীরবিন আল জাররাহ ও আবূ সালমা আবদুল্লাহ বিন আবদুল আসাদ ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর হযরত আরকম বিন আবুল আরকম মাখযূমী ও উসমান বিন মাযউন জুমহী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর কুদামা (রা.) উবায়দুল্লাহ বিন হারিস বিন মুত্তালিব বিন আবদে মনাফ, আবদুল্লাহ, সাদ বিন যায়িদ বিন আমর বিন নুফায়ল ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল্লামা কাসতালানী (র.) এই ধারাবাহিকতায় ইসলাম গ্রহণ সাবিত করেন। ইবনে সাদ এর বর্ণনা মতে হযরত খাদীজা (রা.)-এর পর মহিলাদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন হযরত আব্বাস (রা.)-এর স্ত্রী উম্মুল ফজল লুবাবা আল বাকারী বিনতে হারিস (রা.)। তারপর হযরত আসমা বিনতে আবূবকর (রা.)। আল্লামা যুরকানী (র.) বলেন, এখানে রাসূল (সা.)-এর মেয়েগণের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে তাঁদের মাতা খাদীজা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে হযরত রুকিয়া ও উম্মে কুলসুম (রা.) মুসলমান হয়ে যান। হযরত ফাতিমা (রা.) তখন জন্মগ্রহণ করেন নি। কোন কোন বর্ণনামতে তখন তাঁর বয়স ছিল ৫ বছর। যয়নব (রা.)ও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তবে রাসূল (সা.) তাঁকে তাঁর স্বামী আবুল আস হতে পৃথক করেননি। কারণ তখন বিবাহ বিচ্ছেদ আবশ্যক ছিল না। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর। وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا। এবং وَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ। আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হওয়ার পর বিচ্ছেদ আবশ্যক হয়। বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে আবুল আসও ছিলেন। তাঁকে মুক্ত করার জন্য হযরত যয়নব (রা.) খাদীজা (রা.)-এর হার পাঠিয়েছিলেন।

মোটকথা, এভাবে ক্রমান্বয়ে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين।

(অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।)

অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূল (সা.) সাহাবীগণের সাথে গোপনে ইবাদত করতে থাকেন। ইমাম কাসতালানী (র.)-এর বর্ণনানুসারে নবুওয়াতের ৪র্থ বছরে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত ও মুশরিকদের দেবতাদের বিরোধিতা শুরু করলেন। তখন তাঁর কওমের লোকেরা কেবল আবূ তালিব ছাড়া তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবূ তালিব সব সময় তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কুরাইশদের নেতৃবর্গের মধ্যে হতে ৫ জন লোককে নির্ধারণ করা হয়েছিল রাসূল (সা.)-কে নিয়ে বিদ্রূপ করার জন্য। এরা পাঁচ জন হল- ওলীদ বিন মুগীরা, আস বিন ওয়াইল, হারিস বিন কয়েস, আসওদ বিন আবদে আসওদ বিন মুত্তালিবও অন্য একজন যখন ঐ লোকেরা বিদ্রূপ করতে লাগল, তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন-

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔

-আপনি মুশরিকদের উপক্ষো করে চলুন। বিদ্রূপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ হতে যথেষ্ট। (সূরা হিজর ঃ ৯৫)

মহানবী (সা.) লোকদের বাড়ীতে গিয়ে বলতেন, হে আল্লাহর বান্দাহগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। সে সময় আবূ লাহাব তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে বলত, ঐ লোকটি তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃধর্ম

পরিত্যাগ করতে বলছে। ওলীদ বিন মুগীরা রাসূল (সা.)-কে যাদু করেছিল। তাঁর নিজের সম্প্রদায় তাঁর পিছু নিয়েছিল। তাঁকে কবি, যাদুকর ও পাগল বলতে লাগল। এমন কি হজ্জের মৌসুমে যখন বহিরাগত লোক আসতেন তখন প্রত্যেক রাস্তায় এক এক গ্রুপ দাঁড়িয়ে লোকদেরকে বুঝাতে লাগল, দেখো, মুহাম্মদ যেন তোমাদেরকে ফিতনার মধ্যে না ফেলে। এর পর হাজীদের মধ্য হতে ১০ জন লোক রাসূল (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হলেন। আবূ জেহেল তাঁদেরকে অনেক গালিগালাজ করল। কিন্তু তাঁরা জবাব দিলেন-

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করলেন-

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔

-তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথা-বার্তা শুনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। (সূরা কাসাস ঃ ৫৫)

তারা রাসূল (সা.)-কে বিভিন্ন রূপে কষ্ট দিতে লাগল। কেউ তাঁর মাথা মুবারকে মাটি ঢেলে দিত। কেউ তাঁর ঘরের দরজায় নাজাসত বা গোবর রেখে দিত। উকবা বিন আবূ মুআইত একবার রাসূল (সা.)-এর ঘাড় মুবারকে পা দিয়ে এমন ভাবে নত জানু করেছিল যে তাঁর চোখ মুবারক বের হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন রাসূল (সা.) কাবা শরীফের সংশ্লিষ্ট এক স্থানে সিজদারত ছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, উকবা তার চাদর দিয়ে রাসূল (সা.)-এর ঘাড়ে আঁকড়ে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়েছিল। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) দৌড়ে এসে উকবার হাত ধরলেন এবং বললেন- "তোমরা কি একজন লোককে এ কারণে হত্যা করে ফেলবে যে তিনি বলেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ।"

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে ঃ একদিন রাসূল (সা.) কাবা শরীফের আঙিনায় নামায পড়ছিলেন। পাশে কুরাইশদের এক দল লোক বৈঠক করছিল। এক ব্যক্তি বলল, তোমরা কি লোক দেখানো কর্ম সম্পাদনকারীকে দেখছো না? তোমাদের মধ্যে কে আছ, অমুকের ঘর হতে উটের নাড়ি-ভূড়ি নিয়ে আসবে এবং যখন তিনি সিজদায় যাবেন, তখন নাড়ি-ভূড়ি তার ঘাড়ের উপর দিয়ে দেবে? তখন এই সর্বনিকৃষ্ট উকবা বিন আবূ মুআইত তা করেছিল। রাসূল (সা.) সিজদায় গেলে সে ঐ নাড়ি নিয়ে তাঁর দুই কাঁধের মধ্যিখানে রেখে দিল। এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে হযরত ফাতিমা (রা.)-কে সে সংবাদ দিলেন। হযরত ফাতিমা তাড়াতাড়ি এসে তা সরালেন। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে ঃ ফাতিমা (রা.) ঐ সকল কাফিরকে গালি দিলেন। রাসূল (সা.) নামায শেষ করলে বদদুআ দিলেন- اللهم عليك بقريش ইমাম বুখারী (র.) বলেন, রাসূল (সা.) বাক্যটি বারবার বললেন। ইমাম মুসলিম (র.)-এর বর্ণনায় আছে, যখন ঐ লোকেরা বদদুআ শুনল, তখন হাসি ত্যাগ করে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ল। কারণ তারা জানত যে, রাসূল (সা.) এর বদদুআ অনর্থক হবে না। এরপর রাসূল কতক কাফিরের নাম উল্লেখ করে এই বদদুআ করলেন-

اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبه وامية بن خلف

Scanned with CamScanner

وعطية بن ابى معيطا وعمارةبن الوليد۔

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বদরের যুদ্ধে তাদের সবাইকে নিহত হতে দেখেছি। এখানে সকল বলতে বেশীরভাগ বুঝানো হয়েছে কারণ এদের মধ্যে দু'জন বদর যুদ্ধে নিহত হয়নি। উকবা বিন আবু মুআইতকে আসিম বিন সাবিত বা হযরত আলী (রা.) হত্যা করেন। তাদের দ্বিতীয় জন আম্মার বিন ওলীদের ঘটনা নিম্নরূপ-

আল্লামা যুরকানী (র.) বলেন, যখন মুসলমানগণ দ্বিতীয় বার হাবশায় হিজরত করেন, তখন কুরাইশরা কিছু উপঢৌকন সহ আমর ও আম্মারকে নাজ্জাশীর কাছে পাঠালেন। পথিমধ্যে দু'জনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল। বিরোধের কারণ ছিল, আমর তার স্ত্রীকে সাথে নিয়েছিল আর সে ছিল দুর্বল। পক্ষান্তরে আম্মার ছিল শক্তিশালী ও সুন্দর। রাস্তায় আম্মার আমরের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। আমরের স্ত্রীও আম্মারের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। তারা দু'জনে পরামর্শক্রমে আমরকে নদীতে ফেলে দেয়। আমর উচ্চস্বরে চিৎকার দিতে থাকল। তখন এক নাবিক তাকে পানি হতে উদ্ধার করে দলের কাছে পৌঁছিয়ে দিল। আমর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে কোন প্রকার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল না। বরং তার স্ত্রীকে বলল, আম্মারকে চুমু খেতে দাও এবং তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত কর। হাবশায় পৌঁছার পর যখন নাজ্জাশী তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ফিরিয়ে দিলেন, তখন আমর আম্মারকে বলল, মহিলারা সুদর্শনকে পছন্দ করে। তুমি গিয়ে নাজ্জাশীর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাকে দিয়ে একটু সুপারিশ করলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। আম্মারের এ কথাটি পছন্দ হল। সে নাজ্জাশীর স্ত্রীর কাছে যেতে শুরু করল। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হল। একদিন সে নাজ্জাশীর স্ত্রীর ব্যবহার্য সুগন্ধি হতে কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে এল। তখনই আমর সুযোগ পেয়ে নাজ্জাশীকে সেই সম্পর্কের কথা অবহিত করল। নাজ্জাশী তা শুনে খুবই ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন, সে যদি আমার প্রতিবেশী না হত, তা হলে আমি তাকে হত্যা করতাম। তবে আমি তার সাথে এমন ব্যবহার করব যা হত্যার চেয়ে গুরুতর। নাজ্জাশী যাদুকর মহিলাদের দ্বারা ফুঁক দেওয়ার ফলে তার অনুভূতি চলে গেল। সে মাতাল হয়ে বন্য পশুদের সাথে চলে গেল। এদের সাথে থাকত ও পানাহার করত। মানুষের থেকে দূরে থাকত। উমর (রা.)-এর খিলাফত কালে আম্মারের চাচাত ভাই হযরত আবদুল্লাহ বিন আবূ রবীআ (রা.) উমর (রা.)-এর অনুমতি নিয়ে হাবশা গেলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর তাকে পেলেন। দেখলেন, তার মাথার চুল সমগ্র শরীর ঢেকে গেছে। নখগুলো অনেক লম্বা হয়ে গেছে। তাকে শয়তানের মত মনে হল। আবদুল্লাহ তাকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে এলেন এবং কথা বলানোর অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও বলে তাঁর সামনেই মরে গেল।

আল্লামা হাফিয ইবনে কাসীর (র.) বলেন, একথা স্পষ্ট যে, আহলে বায়তের লোকেরাই সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করেন,তাঁদের মধ্যে প্রথমেই হযরত খাদীজা (রা.), এরপর যায়িদ (রা.) ও তার স্ত্রী উম্মে আয়মন (রা.)। ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে রাসূল (সা.)-এর সকল মেয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইমাম হলবী প্রমাণ করেন যে, হযরত আলী (রা.)-এর পর হযরত যায়িদ বিন হারিসা বিন শুরাহবিল (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত যায়িদ বিন হারিসা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত অবস্থা

ইমাম হলবী (র.) লিখেন, যখন যায়িদ (রা.)-এর মাতা সা'দা তাঁর পিত্রালয়ের লোকজনকে দেখার জন্য 'তয়' নামক স্থানে গেলেন, তখন তাঁর সাথে যায়িদও ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল আট বছর। সেখান থেকে ডাকাতরা তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যায়। হযরত

হাকীম ইবনে হিযাম তাঁর ফুফু খাদীজা (রা.)-এর জন্য উকাযের বাজার হতে তাঁকে ক্রয় করে নিয়ে আসেন। (ইবনে হিশাম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে- 'তয়' যাওয়ার পথে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল। হাকিম বিন হিযাম তাঁকে হাবশার বাজার হতে ক্রয় করেন। তাঁর মূল্য ছিল ৪০০ অথবা ৬০০ দিরহাম। রাসূল (সা.) তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন। এ জন্য হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে রাসূল (সা.)-এর জন্য হেবা করে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁকে আযাদ করে দিলেন।

অন্য দুটি দুর্বল বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা.) তাঁকে বাতহা বা সিরিয়া হতে ফেরার পথে ক্রয় করেছিলেন। তবে সেক্ষেত্রেও মূল্য হযরত খাদীজা (রা.) দিয়েছিলেন বলে প্রমাণিত আছে। একবার হযরত যায়িদ (রা.) আবূ তালিবের মাল নিয়ে শাম গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কওমের লোকদের পাশ দিয়ে গেলে তারা তাঁকে চিনে ফেলে এবং তথ্য অনুসন্ধান আরম্ভ করে। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ তাঁর কওমের কিছু লোক হজ্জ করতে এসে তাঁকে দেখে ও চিনে নেয়। তারা ফিরে গিয়ে এই তথ্য প্রদান করে। দুই বর্ণনার মধ্যে সমতা এরূপ হতে পারে যে, হাজীগণ ফিরে যাওয়ার পর যায়িদ শাম গিয়েছিলেন। এরপর তাঁর পিতা, চাচা ও ভাই মূল্য সহ রাসূল (সা.)-এর সাথে একান্তে দেখা করে তাঁকে বলতে লাগলেন, হে মুত্তালিবের ছেলে। হে হাশিমের বংশধর। হে সম্প্রদায়ের নেতার ছেলে! আপনারা হরম শরীফের অধিবাসী, হরমের প্রতিবেশী! মিসকীন কয়েদীদেরকে আপনারা উদ্ধারকারী। আপনারা ক্ষুধার্তদের অন্নদানকারী। আমাদের একটি সন্তান মুক্ত করার জন্য আমরা এসেছি, যে আপনার কাছে রয়েছে। যদি আপনি মেহেরবানী করেন, তা হলে তার মুক্তিপণ স্বরূপ আমরা তার মূল্য পরিশোধ করব। রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা কার কথা বলছ? তারা জবাব দিলেন, যায়িদ বিন হারিসার কথা। তখন রাসূল (সা.) বললেন, তার ব্যাপারে আমি উত্তম কথা বলে দিচ্ছি। বিষয়টি তার কাছে ছেড়ে দাও। সে ইচ্ছা করলে তোমাদের সাথে যেতে পারবে বা ইচ্ছে করলে আমার সাথে থাকবে। এ কথা শুনে তারা বলল, আপনি খুব ভাল কথা বলেছেন। এরপর যায়িদ (রা.)-কে ডাকা হল। রাসূল, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যায়িদ, এরা কারা? তিনি উত্তর দিলেন, ইনি হারিসা বিন শুরাহবিল আমার চাচাত ভাই-এর কথা তিনি কিছুই বলেননি। রাসূল (সা.) বললেন, যায়িদ, তুমি আমাকে জান, তুমি আমার কাছে থাকার ইচ্ছে পোষণ কর, নয় তো তাদের কাছে চলে যাবার ইচ্ছে পোষণ কর। যায়িদ বিন হারিসা (রা) জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমি আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে এখতিয়ার করব না। ইহা শুনে তাঁর পিতা ও চাচা বললেন, যায়িদ! তুমি কিভাবে স্বাধীনতার উপর দাসত্বকে বেছে নিলে? আর তোমার বাপ-চাচা ও পরিবারকে বাদ দিয়ে এখানে থাকাকে অগ্রাধিকার দিলে? যায়িদ (রা.) জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর উপর কাউকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী নই। ইহা শুনে রাসূল (সা.) বললেন- ان زيدا ابنى ارثه ويرثنى-

যায়িদ আমার ছেলে। আমি তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হব। সেও আমার উত্তরাধিকারী হবে। এতে তাঁর পিতা ও চাচা আনন্দিত হয়ে ফিরে গেলেন।

ইমাম সুহায়লী বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালার বাণী ادعوهم لآبائهم অবতীর্ণ হল তখন زيدبن محمد ﷺ বলে তাঁকে আহ্বান করা বন্ধ হয়ে গেল। এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাম কুরআন পাকে উল্লেখ করে তাঁকে মর্যাদাবান করলেন। কুরআন শরীফে

Scanned with CamScanner

হযরত যায়িদ (রা.) ছাড়া কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ নেই। আর মরিয়ম (আ.) ছাড়া আর কোন মহিলার নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ

একটি কারণ এই যে, যখন রাসূল (সা.) খাদীজা (রা.)-কে সাথে নিয়ে ওরাকার কাছে গিয়েছিলেন তখন বা অন্য এক সময় তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে ওরাকার কাছে গিয়েছিলেন। ওরাকা তাঁর অবস্থা শুনে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় কারণ হল হযরত হাকিম বিন হিযামের দাসী সংবাদ দিল, আপনার ফুফু দাবী করেন যে, তাঁর স্বামী হলেন মূসা (আ.)-এর মত আল্লাহরই প্রেরিত রাসূল। এই সময় হযরত আবূ বকর (রা.) সামনে ছিলেন। ইহা শুনেই তিনি তাৎক্ষণিক বের হয়ে পড়েন। দুই বর্ণনার সমাধান হল, তিনি হাকিম বিন হিযামের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার পর আবূ বরক (রা.) রাসূল (সা.)-কে নিয়ে ওরাকার কাছে গিয়েছিলেন। ওরাকার কাছে তাঁর অবস্থা শুনে বলতে লাগলেন, আমার পিতা মাতার শপথ! আপনি সত্য বলছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আর আপনি আল্লাহর রাসূল।" ঐ দিন তাঁর উপাধি দেয়া হয় সিদ্দীক। মিরাজের দিন সকালে সিদ্দীক উপাধি পাওয়ার বর্ণনা এর অন্তরায় নয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ এর তাফসীরে উল্লেখ আছে, جاء بالصدق দ্বারা রাসূল (সা.) ও صدق به দ্বারা আবূ বকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি যখন প্রথমে এই কথা শুনলেন, তখন লাল রঙের চাদর জড়িয়ে বের হলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ

الحمد لله الذى هداك يابن ابى قحافة۔

রাসূল (সা.) তাঁর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ! প্রথমে তাঁর নাম ছিল আবদুল কাবা। তাঁর উপাধি দিলেন আতীক। আতীক উপাধির কারণ তিনি দূষ ও মন্দ আচরণ হতে মুক্ত বা দুযখ হতে মুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামে সর্বপ্রথম তাঁর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন। কেউ বলেন আতীক নাম তাঁর মাতা রেখেছিলেন। তবে তাঁকে উদ্দেশ্য করে انت عتيق من النار۔ সর্বপ্রথম রাসূল (সা.) বলেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কুরাইশদের মধ্যে সম্পদশালী, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সম্প্রদায়ের নেতা, পরামর্শ গ্রহণের কেন্দ্র, সর্বাধিক ক্ষমাশীল, সম্পদ খরচকারী, সম্প্রদায়ের প্রিয়, সুন্দর সঙ্গদানকারী মুসলমান ছিলেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর পর স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও কুরাইশদের নসবনামা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভাল-মন্দের সর্বাধিক জ্ঞান রাখতেন।

আল্লামা যমখশরী লিখেন, আবূ বকরের কুনিয়ত আবূবকর রাখার কারণ সম্ভবতঃ প্রশংসনীয় গুণাবলীতে তাঁর প্রথম হওয়ার কারণ হয়েছিল। তাঁর আংটির নকশায় লিখিত ছিল نعم القادرالله আর হযরত উমর (রা.)-এর আংটির নকশায় লিখিত ছিল كفى بالموت واعظاياعمر হযরত উসমান (রা.)-এর আংটির নকশায় লিখিত ছিল امنت بالله مخلصا হযরত আলী (রা.)-এর আংটিতে লিখিত ছিল الملك لله হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর আংটির নকশা ছিল الحمدلله۔ হযরত আবূবকর, আলী ও উমর (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর পরামর্শক। হযরত আবূ বকর (রা.) প্রথম থেকেই নবুয়তের প্রমাণাদি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন চাঁদ মক্কা শরীফ অবতরণ করেছে এবং প্রতিটি ঘরে তার আলো প্রবেশ করছে। এরপর সমস্ত আলো তাঁর কোলে এসে একত্রিত হল। এই স্বপ্নের তাবীর অনেকে এভাবে করেছেন যে, আপনি আগত নবীর অনুসরণ করবেন এবং তাঁর ওসীলায় আপনি সর্বাধিক

সৌভাগ্যবানলোকে পরিণত হবেন।

আর তাঁর আগমনের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু বুহায়রা স্বপ্নের তাবীর এভাবে করেছিলেন ঃ 'হে আবূ বকর! যদি তুমি সত্যি এরূপ স্বপ্ন দেখে থাক, তা হলে অচিরেই তোমাদের সম্প্রদায়ে একজন নবী প্রেরিত হবেন। তাঁর জীবনকালে তুমি তাঁর মন্ত্রী হবে আর তাঁর ইন্তিকালের পর তুমি তাঁর খলীফা নিযুক্ত হবে। হযরত আবূ নাঈম কিছু সাহাবী হতে বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর (রা.) নবুওয়াতের পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। কারণ তিনি বুহায়রার মাধ্যমে তা জেনেছিলেন। শায়খে ইয়ামন, যিনি আযদ নামক স্থানের এক বিশেষজ্ঞ ছিলেন, আবূ বকর (রা.)-কে দেখে বলেছিলেন, আপনি কি হরমের অধিবাসী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। শায়খ বললেন, তমীম গোত্রের লোক? আবূ বকর বললেন, হ্যাঁ। শায়খ বললেন, তা হলে আপনার পেট হতে একটু কাপড় অপসারণ করুন। তিনি তার কারণ জিজ্ঞেস করলে শায়খ বললেন, মক্কা শরীফে এক নবী প্রেরিত হবেন। তাঁকে সহায়তা প্রদানকারী একজন যুবক ও একজন বৃদ্ধ লোক হবেন। যুবকের বৈশিষ্ট্য হবে غمرات دفاع مفصلات۔ আর বৃদ্ধ লোকের বৈশিষ্ট্য হবে, তাঁর পেটের উপর একটি সাদা হালকা তিল থাকবে এবং তাঁর বাম উরুতে একটি চিহ্ন থাকবে। অতঃপর যখন আবূবকর (রা.) কাপড় উত্তোলন করলেন, তখন অনুরূপ চিহ্ন দেখা গেল। শায়খ বললেন, কা'বা শরীফের রবের কসম, আপনিই সেই লোক। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, আমি ইয়ামনের কাজ শেষ করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে এলে তিনি বললেন, আপনি আমার কয়েকটি কবিতা স্মরণ রাখবেন, যা আমি সেই নবীর শানে লিখে রেখেছি। আমি বললাম, ঠিক আছে। তখন তিনি কবিতাগুলো আবৃত্তি করলেন। আবূবকর (রা.) বলেন, আমি মক্কা পৌছলে মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আমার কাছে অভিযোগ করল, আবূ তালিবের এতিম ছেলে দাবী করছেন, তিনি নাকি নবী! যদি আমরা আপনার অপেক্ষা না করতাম, তা হলে তাঁকে দেখে নিতাম। আমি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে বিদায় দিলাম এবং রাসূল (সা.)-এর দরজায় কড়া নাড়লাম। তিনি বাইরে এসে বললেন, আবূ বকর, আমি তোমার ও অন্যান্য সকল লোকের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তুমি ঈমান আনয়ন কর। আমি বললাম, এ কথার প্রমাণ কি? রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, ইয়ামনের শায়খ তোমাকে যে কবিতা দিয়েছেন, তাই প্রমাণ। আমি বললাম, আপনি সেই কবিতার সংবাদ কিরূপে পেলেন? রাসূল (সা.) বলেন, সেই ফিরিশতা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, যিনি নবীগণের কাছে আসেন। আমি আরয করলাম, আপনার হাত মুবারক বাড়িয়ে দিন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। আবূ বকর (রা.) বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণে আল্লাহর রাসূল (সা.) খুব খুশী হলেন।

উপর্যুক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে সমতাবিধান এভাবে হতে পারে, সূরা اقرأ অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রথম হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূল (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর ইয়ামন হতে সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়ে দ্বিতীয় বার ঈমানের বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর রাসূল (সা.) হতে দলীল চাওয়া অন্তরের প্রশান্তির জন্য ছিল। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেছিলেন- ليطمئن قلبى۔

অথবা হতে পারে যেদিন সূরা اقرأ অবতীর্ণ হয়, সেদিন আবূবকর (রা.) ইয়ামন হতে ফিরে এসেছিলেন। এরপর হাকিম বিন হিযাম (রা.)-এর ঘরে সংবাদ পেয়ে রাস্তায় বের হয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে রাসূল (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর সাথে ওরাকার কাছে গেলেন।

Scanned with CamScanner

কারণ হযরত হাসসান (রা.) রাসূল (সা.)-এর সামনে কবিতা আবৃত্তি করলেন

اول الناس منهم صدق الرسول۔

আবূ বকর হচ্ছেন সর্বপ্রথম রাসূলকে সত্যানয়কারী লোক। অথচ রাসূল (সা.) তা অস্বীকার করেননি।

শেষ কথা হচ্ছে, হযরত আবূবকর (রা.) হচ্ছেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের বেশীর ভাগ উলামায়ে কিরামের মত। আর হযরত আলী (রা.) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হওয়ার বর্ণনা এর অন্তরায় নয়। কারণ এর অর্থ হল প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন হযরত আবূবকর (রা.), অপ্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে হযরত আলী (রা.) মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা.) ও দাসদের মধ্যে হযরত যায়িদ বিন হারিসা (রা.)। হযরত আবূবকর (রা.), হযরত আলী (রা.)-এর পূর্বে ইসলাম প্রকাশ করেন। কারণ আলী (রা.) প্রথমে তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখতেন।

মহিলাদের ইসলাম গ্রহণের ধারাবাহিকতা ছিল নিম্নরূপ-

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.), এরপর উম্মুল ফদ্বল হযরত আব্বাস (রা.)-এর স্ত্রী, এরপর হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.), এরপর উম্মে জামিল ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা.), উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর বোন। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দাওয়াত পেয়ে হযরত উসমান (রা.), ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর চাচা মারওয়ানের পিতা হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া তাঁকে শক্ত করে বেঁধে রাখল ও বলল, যতক্ষণ না তুমি এই ধর্ম পরিত্যাগ করবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ছাড়ব না। কিন্তু কঠিন শাস্তি দিয়েও যখন উসমান (রা.)-এর দৃঢ়তা দেখতে পেল, তখন তাঁকে ছেড়ে দিল। তা ছাড়াও আবূ বকর (রা.)-এর দাওয়াত পেয়ে হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা.) মুসলমান হলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮ বছর।

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফের ইসলাম গ্রহণ

আবূ বকর (রা.)-এর দাওয়াত পেয়ে আরো ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)। জাহিলিয়াতের যুগে তাঁর নাম ছিল আবদে উমর বা আবদুল কাবা বা আবদুল হারিস। রাসূল (সা.) তাঁর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। উমাইয়া বিন খলফ একদিন তাঁকে বলল, তুমি তোমার পিতার রাখা নাম ছেড়ে দিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তখন সে বলল, আমি রহমান চিনি না। আমি তোমার নাম রাখলাম আবদুল ইলাহ। সে তাঁকে এই নামেই ডাকত।

তিনি বলেন, আমি ইয়ামন গিয়ে বেশীর ভাগ সময় পাদ্রী আসকালান বিন আওয়াকিফ আল হুমায়রীর বাড়ীতে থাকতাম। তিনি সব সময় আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের ওখানে যে নবী আসার কথা, তিনি কি এসে গেছেন? আমি জবাব দিতাম, না। যে বছর রাসূল (সা.) নবুওয়াত পেলেন, সেই বছর আমি সেখানে গেলাম। আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করে ঈমান আনার পরামর্শ দিলেন। আমি ফিরে এসে মুসলমান হলাম।

রাসূল (সা.) তাঁকে লক্ষ্য করে বলতেন, انت امين الله فى اهل الارض امين فى اهل السماء তুমি যমীনবাসী ও আসমানবাসীর জন্য আমীন তা ছাড়াও তাঁকে সত্যবাদী, সৎকর্মশীল ও পুণ্যবান বলে আখ্যায়িত করেন।

হযরত আবূবকর (রা.)-এর দাওয়াত পেয়ে হযরত সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর। তিনি বনূ যুহরার লোক ছিলেন

এবং উম্মে রাসূল (সা.) হযরত আমীনা বিনতে ওহাব-এর চাচা ছিলেন। সাদ তাঁর মাতার অনুগত সন্তান ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণে তাঁর মাতা ক্রুদ্ধ হলেন। একদিন তিনি বললেন, সা'দ, তুমি তো জান আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার কত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদের ধর্ম পরিত্যাগ করবে, ততক্ষণ আমি পানাহার করব না। তিনি তাঁর মায়ের মুখ খুলে পানাহার করানোর অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর মা কিছুই খেলেন না। এরপর আল্লাহ তায়ালার আয়াত অবতীর্ণ হল-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَاتُطِعْهُمَا

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তবে তারা যদি তোমাকে আমার সাথে শরীক করার নির্দেশ দেয়, যা সম্পর্কে তোমরা অবগত নও, তা হলে তাদের আনুগত্য কর না।"

এভাবে দু'দিন অতিবাহিত হল। তখন সা'দ (রা.) বললেন, আমার মা, আপনি জানেন যে, আপনার মত এক শ' প্রাণ মারা গেলেও আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম পরিত্যাগ করব না। আপনি খান বা না-ই খান, আমি তার পরওয়া করি না। ইহা শুনে তাঁর মাতা খেতে লাগলেন এবং সাদ (রা.)-কে ঘর থেকে বের করে দিলেন। এরপর তাঁর ভাই আমরও ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনও তাঁর মা অনুরূপ আচরণ করেন। বিদায় হজ্জের বছর হযরত সাদ (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূল (সা.) তবীবুল আরব হারীস বিন কালদার কাছে তাঁকে যেতে বললেন। অসুস্থতা আশংকার স্তরে পৌঁছে গেল। একদিন রাসূল (সা.) তাঁকে দেখতে গেলেন। অবস্থা মারাত্মক দেখে তিনি ইরশাদ করলেন, সাদ! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। কারণ তোমার দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা একটি দলকে ধ্বংস করবেন এবং এক দলকে উপকৃত করবেন। হারিস বিন কালদাহকে রাসূল (সা.) ঔষধ বলে দিলেন, তাকে দুধ ও ঘি এর সাথে মিলিয়ে আজওয়া খাইয়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা তাকে শিফা দান করবেন। (এ সময় হারিস বিন কালদাহ মুসলমান ছিলেন। কারণ বিদায় হজ্জে কোন কাফির হজ্জ করতে যায়নি।)

হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা.)-এর দাওয়াত পেয়ে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবূবকর ও তালহা দু'জনই ইসলাম প্রকাশ করলেন। তখন আসাদুল কুরাইশ نوفل بن عدوية۔ তাঁদের দু'জনকে এক রশিতে বেঁধে রেখেছিল। এ জন্য তাঁদেরকে قرينين বলা হয়ে থাকে। রাসূল (সা.) দুআ করতেন-

اللهم اكفناشرابن عدوية۔

হযরত তালহা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ

হযরত তালহা (রা.) বলেন, আমি বসরার বাজারে গেলাম। সেখানকার গীর্জার পাদ্রী বলতে লাগলেন, ঐ লোকদের জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে হরম শরীফের অধিবাসী কেউ আছেন কি না। আমি জবাব দিলাম হ্যাঁ, আমি আছি। তিনি বললেন, আহমদ কি আবির্ভূত হয়ে গেছেন? আমি বললাম, কোন আহমদ ? পাদ্রী বললেন, আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব। তিনি এই মাসেই আবির্ভূত হবেন। কারণ এটা তাঁর প্রকাশ হওয়ার মাস। তিনি হবেন শেষ নবী। তাঁর আবির্ভাব হরম শরীফে হবে। তাঁর হিজরতের স্থান হবে খেজুর ও পাথরওয়ালা ভূমি। তোমরা আগে তাঁর অনুসরণ কর। আমি তাড়াতাড়ি মক্কা শরীফ পৌঁছে লোকদের জিজ্ঞেস করলাম। লোকেরা বলল, মুহাম্মদ (সা.) বিন আবদুল্লাহ লোকজনকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছেন। আমি আবূ বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে পাদ্রীর কথা বললাম এবং তাঁকে সাথে নিয়ে রাসূল

Scanned with CamScanner

(সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। রাসূল (সা.)-কে পাদ্রীর ঘটনা বর্ণনা করলাম। রাসূল (সা.) ঘটনা শুনে খুবই খুশী হলেন। হযরত তালহা (রা.) আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আরেকজন ছিলেন তালহা বিন উবায়দুল্লাহ আত তাইমী। দু'জনই নাম, পিতার নাম ও বংশের দিক থেকে একই। তবে তিনি সেই তালহা নন, যিনি বলেছিলেন, যদি রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করেন, তা হলে আমি আয়িশা (রা.)-কে বিয়ে করব। এরপর আয়াত অবতীর্ণ হয়-

مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ

এ জন্য এ দু'জনের পার্থক্য বর্ণনা করা জরুরী। কারণ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর মত মুফাসসির তাঁদেরকে নিয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন। এরপর অনেক তথ্য অনুসন্ধানের পর তা অবগত হন। তিনি নিজে তা বর্ণনা করেন। মোট কথা, হযরত আবূবকর (রা.)-এর দাওয়াত পেয়ে আশারায়ে মুবাশ্শারার পাঁচ জন সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা হচ্ছেন হযরত উসমান (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবাইর (রা.), হযরত সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) ও হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)। কেউ কেউ তাঁরা ছাড়াও হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) এর নামও উল্লেখ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবূবকর, উসমান, তালহা ও আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত যুবাইর (রা.) গুশতের ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত সাদ (রা.) ছিলেন তবলা তৈরীকারী।

এরপর পর্যায়ক্রমে নারী পুরুষ ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলেন। كتاب الاصل গ্রন্থে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর নাম উল্লিখিত আছে। তিনি বলেন, আমি উকবা বিন আবূ মুআইত-এর পরিবারের বকরী চরাতাম। একদিন হযরত আবূবকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে রাসূল (সা.) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কছে দুধ আছে? আমি বললাম, আছে, তবে আমি এগুলোর আমানতদার। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি এমন কম বয়সের কোন ছাগল আছে, যা এখনো বাচ্চা দেয়নি? আমি বললাম, আছে। এই বলে আমি তাঁকে একটি ছাগল দেখিয়ে দিলাম, যার স্তন তখনও প্রস্ফুটিত হয়নি। রাসূল (সা.) উহার স্তনের স্থানে হাত বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে তাতে স্তন প্রকাশ পেল এবং তা দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি পাথরের একটি পাত্র এনে দিলাম। তিনি নিজে পান করলেন এবং আমাকেও পান করতে দিলেন। ইমাম সবকী (র.) طبقات গ্রন্থে লিখেন -

ورب عناق ماترى الفحل فوقها + مسحت عليها باليمين فدرت۔

এমন অনেক ছাগলের বাচ্চাকে দেখেছি, যার কোন স্তন জাগেনি। আপনার মুবারক হাত দিয়ে তা মুছে দিয়েছেন আর অমনি তা দুগ্ধবতী হয়ে গেছে!

এরপর রাসূল (সা.) ছাগলের স্তনের উদ্দেশে বলেন, মিলিয়ে যাও, অমনি তা পূর্বরূপ হয়ে গেল। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যখন আমি তা দেখলাম, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। তুমি জ্ঞানী ছেলে। আরবের প্রথা ছিল যে, রাখাল প্রয়োজন অনুপাতে দুধ খরচ করার অনুমতি থাকত। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) তাঁর মায়ের সাথে থাকতেন। তাঁর নাম ছিল উম্মে আবদ। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) কৃশকায় ও ছোট ছিলেন। তাঁর ছোট ছোট পা দেখে সাহাবায়ে কিরাম হাসতে লাগলেন। রাসূল (সা.) বললেন-

لرجل عبد الله فى الميزان اثقل من احد۔

(মীযানে আবদুল্লাহর পায়ের ওযন উহুদ পাহাড়ের চেয়েও ভারী হবে)

তাঁর শানে রাসূল (সা.) আরও বলেন, আমার উম্মতের জন্য আমি তাতেই সন্তুষ্ট, যাতে সন্তুষ্ট ইবনে উম্মে আবূদ। আর আমার উম্মতের জন্য সেই বিষয়ে আমি অসন্তুষ্ট, যাতে অসন্তুষ্ট ইবনে উম্মে আবদ। রাসূল (সা.) তাঁকে স্নেহ করতেন, কাছে রাখতেন, তাঁর কাছে কোন কিছু গোপন রাখতেন না। এ জন্য তিনি ছিলেন রাসূল(সা.)-এর ঘরে সবচেয়ে বেশী প্রবেশকারী। তিনি তাঁর সাথে সাথে হাঁটতেন। রাসূল (সা.) গোসল করলে তিনি পর্দা করতেন। রাসূল (সা.) আরাম করলে কখনো তাঁকে জাগাতেন। এ জন্য তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর কাছে صاحب سررسول ﷺ (রাসূল (সা.) এর গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত) নামে বিখ্যাত ছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দেন। ইবনে হাজর হায়সমী (র.) লিখেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বকরীর ঘটনা দেখে মক্কা শরীফে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-কেও প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর নাম ছিল যুনদুব বিন জানাদাহ। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ নিম্নরূপ ঃ

তিনি বলেন, রাসূল (সা.)-এর সাথে দেখা হওয়ার তিন বছর পূর্ব হতে আমি নামায পড়তাম। যে দিকে আল্লাহ আমার মুখ ফিরাতেন, সে দিকে মুখ করেই নামায পড়তাম। একদিন সংবাদ পেলাম মক্কা শরীফে এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজে নবুওয়াতের দাবী করেন। বিষয়টি অবগত হওয়ার জন্য আমি আমার ভাই উনাইসকে সেখানে পাঠালাম। সে ফিরে এসে বললো, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখলাম, তিনি ভাল কাজের নির্দেশ দেন, মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে- তিনি সৎ চরিত্র অবলম্বনের নির্দেশ দেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা তাঁকে কি বলে! সে বললো, তারা তাঁকে কবি, জ্যোতিষী ও যাদুকর বলে। আল্লাহর কসম! এ বিষয়ে তিনি সত্যবাদী আর লোকেরা মিথ্যাবাদী। আমি বললাম, আমি নিজে গিয়ে দেখব। আমার ভাই উনাইস বললেন, যাও, তবে মক্কাবাসীর আক্রমণ হতে বেঁচে থাকবে। আমি আমার থলে ও লাঠি নিয়ে মক্কা শরীফ পৌছলাম। রাসূল (সা.)-এর সাথে আমার পরিচয় ছিল না এবং কাউকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাও সংগত মনে করলাম না। এ ভাবে পূর্ণ এক মাস মসজিদে পড়ে রইলাম। আমার কাছে খাবারের কিছুই ছিল না। আমি যমযমের পানি পান করতাম। আল্লাহর অনুগ্রহে যমযম পান করেই আমি স্বাস্থ্যবান হয়ে গেলাম। আমি কখনো ক্ষুধা অনুভব করতাম না। এক রাতে তওয়াফে কোন লোক ছিলেন না। হঠাৎ রাসূল (সা.) তশরীফ আনলেন। প্রথমে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে তওয়াফ করলেন। এরপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ হলে আমি তাঁর সামনে গিয়ে আরয করলাম ঃ

السلام عليكم يارسول الله۔اشهد ان لا اله الاالله وان محمدارسول الله۔

ইহা শুনে রাসূল (সা.) এর চেহারা মুবারকে আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি বললেন, তুমি কোথেকে এসেছ? আমি বললাম, গিফার হতে। তিনি বললেন, কখন এসেছ, কে তোমাকে খাওয়াচ্ছেন? আমি বললাম, যমযমের পানি ছাড়া আমি আর কিছুই খাইনি। যমযম পান করেই আমার শরীর মোটা হয়ে গেছে। আমি কখনো ক্ষুধা অনুভব করিনি। রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, বরকতময় হোক; এটা হচ্ছে খাবার, রোগের শিফা। যমযম এমন পানি, যদি তুমি পানীয়ের জন্য পান কর, তা হলে তা তৃষ্ণা নিবারণকারী, যদি রোগমুক্তির জন্য পান কর, তা হলে তা ঔষধ স্বরূপ, যদি ক্ষুধা নিবারণের জন্য

Scanned with CamScanner

পান কর, তা হলে তা খাবার। এটা জিবরীল (আ.)-এর খনন করা কূপ। আল্লাহ ইসমাঈল (আ.)-কে এর পানি পান করিয়েছেন। আমাদের মধ্যে ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্যের চিহ্ন হল যমযমের পানি। কারণ মুনাফিকরা যমযমের পানি পান করে না।

হযরত আবূ যর (রা.) প্রথম লোক; যিনি ইসলামের সালাম পদ্ধতি অনুযায়ী السلام عليك يارسول الله উচ্চারণ করেন। তিনিই প্রথম লোক যিনি রাসূল (সা.)-এর হাতে হাত রেখে এ কথার বায়আত গ্রহণ করেন যে, তিনি আল্লাহর পথে কোন দোষারোপকারীর দোষারোপকে গ্রহণ করবেন না। আর তিক্ত হলেও সব সময় সত্য বলবেন। এ কারণেই রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আবূযরের চেয়ে বেশী সত্যবাদী কোন লোকের উপর যমীন ছায়া প্রদান করেনি এবং আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করেনি। তিনি আরও বলেন, আবূ যর দুনিয়ায় ঈসা (আ.)-এর মত ত্যাগী হয়ে জীবন কাটাবেন।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ত্যাগী ও সত্যবাদী হলেন আবূ যর। তিনি হযরত আবূবকর (রা.)-এর ইন্তিকালের পর হিজরত করে শাম চলে গিয়েছিলেন। সেখানে হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বিতর্ক বাঁধে। এই অভিযোগে হযরত উসমান (রা.) তাঁকে আবার মদীনায় ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী রাবযায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবূ যর (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে সাথে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। দুই বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য এ ভাবে সম্ভব- হযরত আবূ যর (রা.) আলী (রা.)কে সাথে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ীতে গেলেন। পরপরই বিপদ আশংকায় আলী (রা.)-এর ঘরে চলে গেলেন। রাসূল (সা.) এর সাথে আবূ যর (রা.)-এর কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি এক মাস পর্যন্ত হরম শরীফ অবস্থান করলেন। কিন্তু আক্রমণের আশংকায় রাসূল (সা.) -এর খিদমতে উপস্থিত হননি। এক মাস পর সুযোগ পেয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে গেলেন এবং আবার উল্লিখিত শর্তের উপর বায়আত গ্রহণ করেন। তখন রাসূল (সা.) তাঁর বিস্তারিত পরিচয় ও অবস্থা জিজ্ঞেস করেন।

হযরত আবূ যর (রা.), বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে আমার কওমের কাছে ফিরে যেতে বললেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে নবী মনোনীত করে পাঠিয়েছেন! আমি কলিমার বাণী উচ্চ স্বরে প্রকাশ না করে এখান থেকে যাব না। যখন কুরাইশরা একত্রিত হল, তখন আমি মাঠে বেরিয়ে উচ্চস্বরে কলিমা শাহাদত উচ্চারণ করলাম। এটা শুনেই কুরাইশরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম এবং মৃতপ্রায় হয়ে গেলাম। তখন হযরত আব্বাস (রা.) আমার উপর পড়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, হে কুরাইশগণ। ঐ ব্যক্তি বনূ গিফার গোত্রের লোক। তোমাদের ব্যবসায়ী দল ঐ রাস্তা দিয়ে যায়। তোমরা কি ভবিষ্যৎ চিন্তা করছ না? এটা শুনে তারা আমাকে ছেড়ে দিল। দ্বিতীয় দিন আমি আবার অনুরূপ বললাম। ঐ লোকেরা আমাকে অনুরূপ আক্রমণ করল। হযরত আব্বাস (রা.) আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন। এরপর আমি আমার কওমের কাছে ফিরে গেলাম। আমার ভাইও আমার সম্প্রদায়ের অর্ধেক লোক মুসলমান হয়ে গেলেন। সম্প্রদায়ের বাকী অর্ধেক লোক রাসূল (সা.)-এর মদীনা শরীফ হিজরতের পর মুসলমান হলেন। এ জন্যই রাসূল (সা.) গিফার গোত্রের উদ্দেশে বলেছিলেন غفار الله لها আর আসলাম গোত্রের উদ্দেশে বলেছিলেন سالمها الله হজ্জের মৌসুমে হযরত আবূ যর (রা.) লোকজনের উদ্দেশে বলতেন-

حجوا حجة لعظائم الامور وصوموا يوما شديدا حره ليوم النشور وصلوتى ظلة الليل لوحشة القبور۔

হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আস (রা.) তাঁর ভাইদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি প্রজ্বলিত অগ্নির পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পিতা আমাকে আগুনে ফেলে দিতে চাচ্ছেন আর রাসূল (সা.) আমার বাহু ধরে আটকাচ্ছেন। আমি এই স্বপ্ন সঠিক মনে করে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে রাসূল (সা.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে ইসলাম গ্রহণ করলাম। وفاء গ্রন্থকার খালিদ বিনতে খালিদ বিন সাঈদ হতে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, আমি এক রাতে শুয়েছিলাম, এটা ছিল রাসূল (সা.) এর নবুওয়াত লাভের সামান্য পূর্বেকার ঘটনা। আমি স্বপ্নে দেখলাম, গভীর অন্ধকার মক্কা শরীফকে এমনভাবে ঢেকে দিল যে, কেউ তার নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পারছে না। হঠাৎ যমযম কূপ থেকে এক আলো বের হয়ে আকাশ পর্যন্ত বর্ধিত হল। বায়তুল্লাহ শরীফ আলোকিত হল। এরপর তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ঐ আলো ইয়াসরীবের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে সেখানেও আলো সম্প্রসারিত হল। এমনভাবে আলোকিত হল যে, আমি সেখানকার খেজুর বৃক্ষের খেজুরগুলো দেখতে পেলাম। আমি জাগ্রত হয়ে আমার ভাইকে স্বপ্নের কথা বললাম। আমার ভাই উমর বিন সাঈদ ছিলেন আহলে রায়। ভাই বললেন, হে আমার ভাই! এ ঘটনা আবদুল মুত্তালিবের সন্তানের মধ্যে হবে। তুমি কি দেখনি যে, এই আলো তাঁর পিতার খননকৃত কূপ হতে বের হয়েছে?

নবুওয়াতের পর আমি এই স্বপ্ন রাসূল (সা.)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। রাসূল (সা.) বললেন, হে খালিদ! আল্লাহর কসম! আমিই সেই আলো আর আমি আল্লাহর রাসূল। ইহা শুনে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে তাঁর পিতা সাঈদ তাঁকে খুব মারধোর করলেন। এমনকি তাঁর খাবার বন্ধ করে দিলেন। এ জন্য খালিদ (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে থাকতে লাগলেন। হাবশায় দ্বিতীয় বার হিজরতের সময় খালিদও হিজরত করে গেলেন। তাঁর পিতা সাঈদ অসুস্থ হয়ে বলেছিল, যদি আল্লাহ আমাকে রোগমুক্তি দেন, তা হলে ইবনে আবূ কাবশার মাবুদের ইবাদতকারী কাউকে মক্কায় থাকতে দেব না। তৎক্ষণাৎ খালিদ (রা.) বললেন, اللهم لاترفعه হে আল্লাহ, তাকে উঠতে দেবেন না। ফলে এই রোগেই সে মারা গেল। তার ভাই উমর বিন সাঈদ অনুরূপ স্বপ্ন দেখে মুসলমান হলেন। তাঁর অন্যান্য ভাইয়ের মধ্যে আবান বিন সাঈদ ও হাকাম বিন সাঈদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) হাকাম এর নাম পরিবর্তন করে আবদুল্লাহ রেখেছিলেন।

হযরত সুহাইব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সুহাইব (রা.)ও প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারন-

তাঁর পিতা পারস্য সম্রাটের কর্মচারী ছিলেন। রোমানরা ছোট ছেলে সুহাইবকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেই তিনি বড় হলেন। এরপর আরবের এক বড় দল তাঁকে ক্রয় করে উকাযের বাজারে নিয়ে এল। সেখান থেকে আবদুল্লাহ বিন জাদআন তাঁকে ক্রয় করে আবার মক্কায় নিয়ে এলেন। রাসূল (সা.) নবুওয়াত প্রাপ্ত হলে সুহাইব রাসূল (সা.)-এর ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় হযরত আম্মার বিন ইয়াসির-এর সাথে দেখা হল। আম্মার বললেন, সুহাইব, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সুহাইব বললেন, রাসূল (সা.)-এর ঘরে যাচ্ছি। আম্মার বললেন, আমিও যাব। অতঃপর দু'জন এক সাথে গিয়ে মুসলমান হলেন। রাসূল (সা.) তাঁদেরকে কুরআন শরীফ পড়ালেন। দু'জনই সারা দিন

Scanned with CamScanner

সেখানে থাকলেন। সন্ধ্যাবেলা দু'জনই গোপনে ফিরে এলেন। আম্মার (রা.)-এর পিতা-মাতা তাঁর বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আম্মার পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং পবিত্র কুরআন পড়ে শুনালেন। পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে আম্মারের পিতা-মাতার খুবই পছন্দ হল। তাঁরা মুসলমান হয়ে গেলেন। এ জন্য রাসূল (সা.) আম্মার (রা.)-কে বলতেন طيب المطيب

হযরত হুসাইন (حصين) (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

প্রথম পর্যায়ের মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন হযরত হুসাইন (রা.)। তাঁর ছেলে ইমরান (রা.) তাঁর পূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপ : কুরাইশরা حصين কে খুবই সম্মান করত। একদিন তারা হুসাইনকে বলল, হুসাইন, আপনি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, তিনি কেন আমাদের উপাস্যদেরকে গালি-গালাজ করেন ও এসবকে অপমান করেন? যাই হোক, একদিন কুরাইশ তাঁকে সাথে করে নিয়ে রাসূল (সা.)-এর দরজায় উপস্থিত হল। তারা বাইরে থাকল; হুসাইন ভিতরে প্রবেশ করলেন। রাসূল (সা.) তাঁকে দেখে সাহাবীগণের উদ্দেশে বললেন, তার জন্য স্থান করে দাও। এই সময় সাহাবীগণের সাথে হযরত ইমরানও বসা ছিলেন। হুসাইন বললেন, হে মুহাম্মদ(সা.), আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে, আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে গালি দেন এবং আমাদের অনেকের সাথে এর মন্দ আলোচনা করেন। বলুন তো, এর কারণ কি? মহানবী (সা.) বললেন, হুসাইন, আপনারা ক'জন খোদার উপাসনা করেন? হুসাইন বললেন, যমীনে সাত জন ও আসমানে একজন খোদার উপাসনা করি। রাসূল (সা.) বললেন, যখন বিপদে পড়েন, তখন কার কাছে প্রার্থনা করেন? জবাব দিলেন, আসমানের রবের কাছে। রাসূল (সা.) বললেন, যখন আপনাদের সম্পদ ধ্বংস হয়, তখন কার কাছে প্রার্থনা করেন তিনি জবাব দিলেন, আসমানের খোদার কাছে। তখন রাসূল (সা.) বললেন, আপনার প্রার্থনা শোনার তো একজনই খোদা, তা হলে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করছেন কেন? আপনি তাদেরকে শরীক করে আসমানী রবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন? হে হুসাইন! ইসলাম গ্রহণ করুন, তা হলে নিরাপদ থাকতে পারবেন। ইহা শুনে হুসাইন মুসলমান হয়ে গেলেন। হুসাইন (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে ছেলে ইমরান (রা.) উঠে দাঁড়ালেন। হুসাইনের মাথা, হাত ও পায়ে চুমু খেলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা.) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আমি ইমরানের কাজের জন্য কাঁদছি। কারণ হুসাইন যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি কাফির ছিলেন। এ জন্য ইমরান দাঁড়ালেন না; তার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। কিন্তু যখন তিনি মুসলমান হলেন, তখন ছেলে পিতার পরিপূর্ণ হক আদায় করলেন। অতঃপর যখন হুসাইন ফিরে যেতে চাইলেন, তখন রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। হুসাইন (রা.) দরজার বাইরে গেলে বাইরে অপেক্ষমান কুরাইশরা বলল, ও তো ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। এই বলে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

হযরত হামযা বিন আবদুল মুত্তলিব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত হামযা রাসূল (সা.)-এর চাচা ও দুধ ভাই ছিলেন। যেহেতু তিনি বয়সে রাসূল (সা.)-এর দু'চার বছরের বড় ছিলেন, এ জন্য তিনি রাসূল (সা.)-এর পূর্বে সুয়াইবিয়ার দুধ পান করেছিলেন। আল্লামা কাসতালানী (রা.) বলেন হযরত হামযা (রা.) নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে মুসলমান হন। اصابه গ্রন্থকার, استيعاب গ্রন্থকার ও আল্লামা যুরকানী (রা.)

বলেন, নবুয়তের দ্বিতীয় বছরে হযরত হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ এই যে, একদিন আবু জেহেল মহানবী (স.)-কে খুবই কষ্ট দিল এবং গালি দিল। এই ঘটনা সাফা অথবা হজুন তথা মুআল্লা এর কাছে ঘটেছিল। হতে পারে দুই দিন দুই স্থানে এরূপ ঘটেছিল। তখন দুই মহিলা এক জন মাওয়ালাত বিন জাদ'আন, অপর জন হামযার বোন সুফিয়া- এ সংবাদ নিয়ে হযরত হামযা (রা.)-এর কাছে গেলেন। হামযা (রা.) এই সংবাদ পেয়ে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। ঘর থেকে বের হয়ে সোজা আবু জেহেলের কাছে পৌঁছলেন এবং আবু জেহেলের মাথায় আঘাত করে জখম করে দিলেন। বনু মখজুমের কয়েকজন লোক এগিয়ে আসলে আবু জেহেল তাদেরকে বলল, আমি তাঁর ভাতিজাকে অনেক গালি দিয়েছি। তাই সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে মেরেছে। তার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়োনা। হযরত হামযা (র.) চিৎকার করে বলতে লাগলেন আমি মুহাম্মদের ধর্মের উপর আছি। যদি কেউ বাধা দেওয়ার থাকো তা হলে বাধা দাও। ইহা শুনে কুরাইশগণ আকস্মাৎ তাঁর কাছে গিয়ে বলল, হে আবু ইয়ালা, তুমি এ কি করছ? তখন পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হল

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى

"যখন কাফেররা তাদের অন্তরে মুর্খতা যুগের বিদ্বেষ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন, আর তাদের জন্য তাকওয়ার বাণী অপরিহার্য করে দিলেন।" সূরা (ফাতহ ২৬)। হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে রাসূল (সা.)-এর উপর কাফিরদের অত্যাচার অনেকটা কমে আসল। এই সময় হযরত হামযা (রা.) নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করলেন-

حمدت الله حين هدانو ادى + الى الاسلام والدين الحنيف
الذين جاء من رب عزيز + خبير بالعباد بهم لطيف

আল্লাহর প্রশংসা করছি এ জন্য যে, তিনি একনিষ্ট ধর্ম ইসলাম গ্রহণে আমার অন্তরকে হেদায়ত করেছেন। যে দীনটি এসেছে মহা পরাক্রমশালী ও বান্দা সম্পর্কে অবগত আল্লাহর পক্ষ হতে। তিনি বান্দার প্রতি অত্যন্ত নম্র।

আল্লামা যুরকানী (রা.) বলেন, উৎবা ও শায়বা রাসূল (সা.)-এর কাছে আসল এবং বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ (সা.), তুমি তোমার কওমকে যেভাবে ব্যতিব্যস্ত করেছ, আরবের আর কোন লোক কোন কওমকে তদ্রুপ বাতিব্যস্ত করেনি। যদি তোমার বিয়ে করার ইচ্ছা থাকে, তা হলে বল। আমরা তোমার কাছে আরবের সর্বোৎকৃষ্ট মেয়ে বিয়ে দেব। যদি তুমি বাদশাহ হতে চাও, তা হলে আমরা তোমাকে সম্রাট বানিয়ে দেব। আর যদি তোমার উপর জ্বীনের প্রভাব পড়ে থাকে তা হলে আমরা নিজস্ব খরচে ডাক্তার দেখিয়ে তোমার চিকিৎসা করাব। রাসূল (সা.) কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। যখন উত্বা কথা শেষ করল তখন রাসূল (সা.) বললেন, আবুল ওয়ালিদ! তোমার কথা কি শেষ? সে বলল হ্যাঁ। রাসূল (সা.) তিলাওয়াত শুরু করলেন- حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ وَفِيْ آذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عٰمِلُوْنَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْأَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ أَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا فِيْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ فَإِنْ أَعْرَضُوْا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ

পর্যন্ত তিলাওয়াত করে থামলেন। এরপর আবার সিজদার আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে সিজদা করলেন। অত:পর বললেন, আবুল ওলীদ! আমার কথা তো শুনলে, এখন তোমার ইচ্ছা। উতবা বেরিয়ে আসল কুরাইশ নেতারা তার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। তার চেহারা দেখেই তারা বুঝে নিল এই সেই উতবা নয় যাকে তারা পাঠিয়েছিল। এমন মনে হচ্ছে যে, মুহাম্মদের যাদু তার উপর প্রভাব ফেলেছে। কুরাশইরা ভীত হয়ে কাছে

Scanned with CamScanner

আসল এবং জবাব জিজ্ঞেস করল। উতবা বলল হে কুরাইশগণ। তোমরা ঐ লোকের পিছু ত্যাগ কর। কারণ সে বাদশাহী লাভ করলে এটা তোমাদেরই রাজত্ব হবে। সে সম্মানিত হলে প্রকারান্তরে তোমরাই সম্মানিত হবে। আর বাইরের কোন আক্রমনে সে নিহত হলে তোমরা মুক্তি পাবে। ইহা শুনে কুরাইশগণ বলল, হে উতবা! অবশ্যই মুহাম্মদ (সা.) তোমাকে কিছু খাইয়ে দিয়েছে। উতবা বলল, তোমরা জান মক্কায় আমার চেয়ে বেশী সম্পদশালী আর কোন লোক নেই, আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি- আমি আজ যে কুরআন শুনলাম তা কখনো কোন কবির কথা নয়। এটা অবশ্যই এমন কোন সত্তার বানী যার সাথে মানবীয় কোন নিসবত করা যায় না। কুরাইশরা বলল, উতবা! তোমার উপর যাদু প্রভাব ফেলেছে। উতবা বলল, আমি তোমাদেরক কটি প্রশ্ন করছি, মুহাম্মদ কি কখনো মিথ্যা বলেছেন ? সকলেই জবাব দিল 'না'। উতবা বলল, আমি তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ হতে একটি কথা জানিয়ে দিচ্ছি। আমি আশংকা করছি তোমাদের উপর না জানি কোন শাস্তি হয়ে যায়। কারণ আমি তাঁকে বলতে শুনেছি فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ "যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ কঠিন আযাবের মত কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করছি।" ইহা শুনে সকলে ভীত হয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে চলে গেল।

এরপর নযর বিন হারিস ও উতবা বিন আবু মুআইত ইহুদী আলিমের কাছে গেল এবং মুহাম্মদ (সা.) কে কিভাবে পরীক্ষা করা যায় তা জানতে চাইল। আলিম তাদেরকে ৩টি প্রশ্ন শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন এই তিন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে তিনি নবী নন। আবার সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেও তিনি নবী নন। যদি দু'টি প্রশ্নের জবাব দেন আর একটি প্রশ্নের জবাব না দেন তাহলে তিনি নবী। প্রথমত: আসহাবে কহফের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে, দ্বিতীয়ত: বাদশাহ যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। এরপর রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে- যদি প্রথম দু'টি প্রশ্নের জবাব বিস্তারিত দেন, আর তৃতীয় প্রশ্নের জবাব সংক্ষেপে দেন, তা হলে তিনি নবী, অন্যথায় তিনি নবী নন। ঐ লোকেরা কথামত মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঐ প্রশ্নগুলো করল। রাসূল (সা.) বলে দিলেন, আগামীকাল তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেব, কিন্তু এর পর থেকে কয়েক দিন ওহী অবতরণ বন্ধ হয়ে গেল। আল্লামা যুরকানী (রা.)-এর মতে ১৫ দিন ওহী বন্ধ ছিল। অন্যান্য বর্ণনায় ৩ দিন হতে ৪০ দিনের কথা রয়েছে। তা দেখে আহলে মক্কা বলতে লাগল, "মুহাম্মদের রব তাকে পরিত্যাগ করেছেন।" حمالة الحطب উপাধিধারী মুশরিক মহিলাটি বলতে লাগল, "মুহাম্মদ! তোমার রবকে তো দেখছিনা। তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন এবং তিনি তোমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন।" কুরাইশদের অন্য একটি মহিলা বলল "তার শয়তান পশ্চাদপসারণ করেছে।" রাসূল (সা.) তখন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অত:পর তাদের জবাবে সূরা والضحى সূরা অবতীর্ণ হল। আর তাদের তিনটি প্রশ্নের জবাবে সূরা اسراء ও- كهف এর সংশ্লিষ্ট আয়াত অবতীর্ণ হল। রাসূল (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (অর্থাৎ ان شاء الله না বলে "আমি আগামীকাল এটা করে নেব-" এরূপ বলবেন না।)

আল্লামা কাসতালানী (রা.) হযরত আবু যর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, সর্ব প্রথম সাত জন লোক ইসলাম প্রকাশ করেন। এরা হচ্ছেন মুহাম্মদ রাসূল (সা.), হযরত আবু বকর (রা.), তাঁর মাতা হযরত সুমাইয়া (রা.), হযরত সুহাইব (রা.), হযরত বিলাল (রা.) ও

হযরত মিকদাদ (রা.)। যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং ইসলাম প্রকাশ পেতে থাকল, তখন কুরাইশগণ তাঁদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং কঠোর শাস্তি দিতে লাগল। এমতাবস্থায় একদিন আবূ জেহেল হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সুমাইয়াকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। আবূ জেহেল সুমাইয়াকে লক্ষ করে তীর ছুঁড়ল। হযরত সুমাইয়া (রা.) শাহাদত বরণ করলেন। শাহাদতের পরও তাঁর লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। হযরত আবূ বকর (রা.) যখন কোন নির্যাতিত পরাধীন লোকের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। রাসূল (সা.) তাঁর চাচা আবূ তালিবের কারণে এবং হযরত আবূ বকর (রা.) স্বীয় কওমের প্রভাবে নিরাপদ ছিলেন। অন্য সব মুসলমানের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। মুশরিকরা তাঁদেরকে লোহার শিকল পরিয়ে প্রখর সূর্যতাপে রেখে দিত। হযরত বেলাল (রা.) কে সূর্যের তাপে রেখে নিস্তেজ করে দিয়ে গলায় রশি লাগিয়ে ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিত। তারা রশি দিয়ে টেনে টেনে পাহাড়ের উপরে তোলে আবার সেখান থেকে ছেড়ে দিত। এভাবে তাঁর গলায় রশির চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। হযরত বেলাল (রা.) কেবল احد احد বলতেন। বিলাল (রা.) কে এরূপ শাস্তি দানকারী তাঁর মালিক উমাইয়া বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

মহানবী (সা.)-এর 'দারে আরকুম'-এ অবস্থান

ইমাম হলবী (র.) ইবনে ইসহাক হতে বর্ণনা করেন, সূরা مدثر অবতীর্ণ হওয়ার তিন বৎসর পর্যন্ত মহানবী (সা.) ইসলাম প্রচার ও অন্যান্য ইবাদত গোপনে করতেন। একদিন হযরত সা'দ বিন আবূ ওক্কাস (রা.) কয়েকজন সাহাবী (রা.) কে সাথে নিয়ে এক গুহায় নামায পড়ছিলেন। সে সময় মুশরিকদের এক দল সেখানে গেল এবং তাঁদেরকে বাধা দিল। এতে উভয় পক্ষে বিরোধ লেগে গেল। হযরত সা'দ (রা.) এক মুশরিকের মাথায় আঘাত করে তার মাথা ফাটিয়ে দিলেন। এতে অনেক রক্তপাত হল। ইহাই ছিল ইসলামের সমর্থনে প্রথম রক্তপাত। এই ঘটনার পর রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে নির্জনে দারে আরকুমে প্রবেশ করলেন। দারে আরকুম দারে হিযরান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা সাফা পর্বতের নিকটে। রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে নামায ও অন্যান্য ইবাদত করতেন।

ইমাম হলবী (র.) লিখেন- মহানবী (সা.) চার বছর পর্যন্ত গোপনে ইসলাম প্রচার করেন এবং ৫ম বছর যখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন প্রকাশ্যে দীন প্রচার করেন- وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ- وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ এবং فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ শেষোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে মহানবী (সা.)-এর কাছে তা খুবই কষ্টকর মনে হল। কারণ তাঁর اقربين দের মধ্যে আবু লাহাবও ছিল। কয়েক দিন পর তিনি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদেরকে ডাকলেন। আল্লামা ইবনে খলদুন লিখেন- তিনি সকল কুরাইশকে সাফা পাহাড়ে সমবেত করে বললেন-যদি আমি তোমাদের সকাল-সন্ধ্যায় কোন শত্রুর আক্রমনের আশংকার কথা বলি, তা হলে কি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করবে? তারা সবাই বলল, হ্যাঁ, তখন মহানবী (সা.) বললেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের সম্মুখে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি। দ্বিতীয় দিন রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা.) কে বললেন, কিছু খাবার পাক করে নাও এবং বনি আব্দুল মুত্তালিবকে দাওয়াত কর। রাসূল (সা.) তাদের দাওয়াত খাওয়ালেন, এরপর ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সাথে সাথে সকলেই এদিক সেদিক চলে গেল। ইহা ইবনে খলদুনের বর্ণনা।

Scanned with CamScanner

অন্য দিকে আল্লামা কাসতালানী (র.) বলেন- সাফা পাহাড়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে عبد العزى অর্থাৎ আবূ লাহাব বলতে লাগল- "সারাদিন তোমার ধ্বংস হউক, এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে জমা করেছ?" তখন আয়াত অবতীর্ণ হল تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ "আবূ লাহাবের দুই হাত ও সে নিজে ধ্বংস হয়ে গেছে।" আবূ লাহাব বলল, মুহাম্মদ যা বলছে তা যদি সত্য হয় তা হলে তার ধ্বংস হতে বাঁচার জন্য আমি আমার সম্পদ ও সন্তানকে ফিদইয়া স্বরূপ প্রদান করব। তখন আয়াত অবতীর্ণ হল مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ "তার সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসবেনা।" যখন রাসূল (সা.) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন তারা ইসলাম গ্রহণ না করে বরং ক্ষুব্ধ হয়ে গেল। যখন মহানবী তাদের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তারা একে অপরকে ইঙ্গিত করে বলত, আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আকাশ থেকে কথা বলে। তারা এটা অভ্যাসে পরিণত করেছিল। তাঁকে দেখেই তারা সর্বদা বিদ্রূপ করতে থাকত। একদিন রাসূল (সা.) মসজিদে হারামে তশরীফ আনলেন। এ সময় মুশরিকরা দেবতাকে সিজদা করছিল। রাসূল (সা.) বললেন, "হে কুরাইশগণ! তোমরা মিল্লাতে ইব্রাহিমের বিরোধীতা করছ।"

জবাবে তারা বলল, আমরাতো মূর্তির উপাসনা করি আল্লাহকে ভালবাসার কারণে। এগুলো আমাদেরকে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাবে। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ "হে নবী (সা.)! আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহকে ভালবাস তা হলে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" এরপর থেকে মুশরিকগণ রাসূল (সা.)-এর বিরোধীতা ও শত্রুতায় একমত হল। তারা আবূ তালিবের কাছে গিয়ে বলল, তুমিও আমাদের মত তার বিরোধী হয়ে যাও অথবা তাকে নিয়ন্ত্রণ কর, নতুবা তাকে আমাদের কাছে ছেড়ে দাও। কারণ সে আমাদের দেবতাকে গালমন্দ বলে, তাদেরকে দোষারোপ করে। আবূ তালিব তাদেরকে নম্রভাবে জবাব দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। হামযিয়া গ্রন্থকার বলেন ঃ

ثم قام النبى يدعوا الى الله وفى الكفر شدة واباء
مما اشربت قلوبهم الكفر فناء الضلال فيهم اعياء

"এরপর নবী (সা.) তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে লেগে গেলেন, অথচ তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা কুফরীতে শক্তভাবে রয়েছে। কারণ কুফরীর পানীয় তাদের অন্তরে পান করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ভ্রষ্টতার রোগ তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

এরপর একদিন রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আ.) সুগন্ধি ব্যবহার করে অত্যন্ত সুন্দর এক লোকের আকৃতি ধারণ করে দরবারে রিসালতে উপস্থিত হয়ে বললেন "হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ আপনার উপর সালাম পাঠ করেছেন। আর বলে দিয়েছেন যে, আপনি আল্লাহর পক্ষ হতে জীন ও মানুষের প্রতি প্রেরিত রাসূল। সুতরাং আপনি তাদেরকে الى الله الا الله -এ বানীর প্রতি আহবান করুন। "রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। কুরাইশরা দ্বিতীয়বার আবূ তালিবের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি তোমার ভাতিজাকে নিজেও নিয়ন্ত্রন করলেনা, আমাদের কাছেও ছেড়ে দিলেনা। আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। সে আমাদের পূর্ব পুরুষ ও আমাদের বিচারবুদ্ধিকে দোষারোপ করছে, আমাদের দেবতাদেরকে অপমান করছে। আমরা হয়ত তাকে নিয়ন্ত্রণ করে নেব নতুবা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে এক পক্ষ ধ্বংস হয়ে যাব। ইহা শুনে আবূ তালিব চিন্তিত হয়ে পড়লেন,

কারণ এতে তাঁর কওমকে পরিত্যাগ করা অথবা মুহাম্মদ (সা.) কে পরিত্যাগ করা এ দুটির যে কোন একটি গ্রহণ করতে হচ্ছে। যাই হোক, তিনি রাসূল (সা.)কে বুঝালেন, "ভাতিজা! তুমি বাইরে গিয়ে ইসলাম প্রচার বন্ধ করে দাও, কারণ তোমার কওমের লোক আমার কাছে এসে এরূপ বলেছে। তুমি আমার উপর আমার সাধ্যের বাইরে বিপদ নিয়ে আসবে না।" রাসূল (সা.) বুঝলেন, আবূ তালিবের অন্তর দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাঁর সাহায্যের ক্ষেত্রে অন্তরে দোদুল্যমানতা বিরাজ করছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, "চাচা! যদি ঐ লোকেরা আমার এক হাতে সূর্য আর অন্য হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি এই দাওয়াত হতে বিরত থাকবনা। হয়ত এই ধর্ম বিজয়ী হবে, নয়ত আমি এই ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে মারা যাব। এই কথা বলতে বলতে রাসূল (সা.) এর চোখে পানি আসল। তিনি সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। আবূ তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, হে আমার ভাই এর ছেলে! তুমি যাও এবং তোমার যা ইচ্ছা বলতে থাক। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কারো কাছে ছেড়ে দেব না। এই বলে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন।

والله لن يصلوا اليك بجمعهم + حتى اوسد فى التراب دفينا

"আল্লাহর কসম তাদের সম্মিলিত শক্তি তোমার কিছুই করতে পারবে না আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।" এখানে সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখ করার কারণ হল, এতদোভয় দুনিয়া আলোকিত করে। কিন্তু এদের আলোও রিসালাতের আলোর সমকক্ষ নয়। কারণ সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ বা মেঘ মালার কারণে এদের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়; কিন্তু রাসূল (সা.) এর নূরের অন্তরায় কোন কিছু নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ-

"তারা আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, আর আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ না করে ছাড়বেন না।" (সূরা তওবা ৩২)

আবূ জেহেলের অবস্থার উপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় কয়েকটি ঘটনা রয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আবূ জেহেল বলল, খোদার কসম! মুহাম্মদ যখন সিজদায় যাবে, তখন আমি তার ঘাড় দলিত করে দেব। আমি রাসূল (সা.) কে এই সংবাদ পৌছালাম। রাসূল (সা.) রাগান্বিত হলেন। এই অবস্থায়ই তিনি হরমশরীফ আসলেন এবং সূরা اقرأ তিলাওত করতে লাগলেন। আবূ জেহেলের শানে বর্ণিত আয়াত كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ তিলাওয়াত করলেন। এমনি ভাবে সম্পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করে সিজদা আদায় করলেন। এমন সময় একজন আবূ জেহেলকে গিয়ে সংবাদ দিল মুহাম্মদ (সা.) এখন সিজদা করছেন। সংবাদ শুনে আবূ জেহেল পাথর হাতে নিয়ে দৌড়ে আসল রাসূল (সা.)-এর মাথা চূর্ণ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু হঠাৎ সে ফিরে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল কেন সে ফিরে গেল? তখন সে জবাব দিল আমি যা দেখছি তা কি তোমরা দেখছ না? আমার উপর আকাশের দিগন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য বর্ণনায় আছে, আমি তাঁর ও আমার মধ্যে একটি আগুনের পরিখা দেখছি। সম্ভাবনা আছে উভয় ভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাকে দমন করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালার বানী إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ এর শানে নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াত আবূ জেহেলকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন সে পাথর নিয়ে রাসূল (সা.)-এর মাথা চূর্ণ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা তার হাতকে ঘাড়ের সাথে লাগিয়ে দিলেন। আর পাথরটি তার হাতে লেগে গেল। যখন সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল, তখন তারা

Scanned with CamScanner

খুব কষ্ট করে তার হাত হতে পাথরটি বিচ্ছিন্ন করল। আবু জেহেলের এই অবস্থা দেখে তার সঙ্গীদের একজন বলল, আমি গিয়ে মুহাম্মদের মাথায় পাথর মারব। এই বলে সে পাথর নিয়ে রাসূল (সা.)-এর নিকটবর্তী হল, তখন সে অন্ধ হয়ে গেল। সে রাসূল (সা.)-এর আওয়াজ শুনল কিন্তু তাঁকে দেখল না। সে ফিরে গিয়ে তার কওমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

এমনিভাবে একদিন রাসূল (সা.) নামায পড়ছিলেন। এমন সময় আবু জেহেল এসে বলল, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি কি তোমাকে এই কাজ হতে নিষেধ করিনি? তখন আয়াত অবতীর্ণ হল أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى "আপনি কি সেই লোককে দেখেছেন যে, আমার বান্দা যখন নামায আদায় করে, তখন সে তাকে নিষেধ করে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা.) নামায আদায় করে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে আবু জেহেলের সাথে দেখা হল। সে রাসূল (সা.) কে তিরস্কার করল এবং বলল, তুমি অবশ্যই জান যে, এই মক্কাশরীফে অনেক সভাষদ রয়েছেন, যারা আমার চেয়েও গন্যমান্য। তখন আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিলেন فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ "সে তার সভাসদকে ডাকুক, আমি ও জাহান্নামের প্রহরীকে ডাকব।" ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি সে তার উপদেষ্টাদেরকে ডাকত, তা হলে জাহান্নামের প্রহরী তাকে আকড়ে ধরতেন। আরেকদিন মহানবী (সা.)-এর সাথে আবু জেহেলের দেখা হল। সে বলল, তুমি তো অবশ্যই জান এই উপত্যকার অধিবাসীকে আমি যে কোন কাজে বাধা দিতে পারি। কারণ আমি মহা পরাক্রমশালী, সম্মানী। তাঁর এই ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে আল্লাহ তার পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। জাহান্নামের আগুনে তাকে নিক্ষেপ করে আল্লাহ বলবেন ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ "শাস্তি ভোগ কর তুমি কি না মহাপরাক্রমশালী ও সম্মানী।"

যখন تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ নাযিল হল, তখন আবু জেহেলের স্ত্রী- আবু সুফিয়ানের বোন উম্মে জামীল- যার নাম ছিল আওরা বা আরওয়া- সে অত্যন্ত ক্ষেপে গেল। সে একটি বা দু'টি পাথর হাতে নিল। এমন সময় রাসূল (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-কে সাথে নিয়ে সে দিকে যাচ্ছিলেন। যখন সে রাসূল (সা.)-এর কাছে আসল, তখন সে অন্ধ হয়ে গেল। রাসূল (সা.) বললেন حال بينى وبينها এ সময় সে আবু বকর ও উমর (রা.) কে দেখতে পেল অথচ রাসূল (সা.) কে দেখেনি। সে হযরত আবু বকর (রা.) কে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সঙ্গী লোকটি কোথায়? আবু বকর (রা.) বললেন, তাঁকে দিয়ে তুমি কি করবে? উম্মে জামীল বলল, "আমি শুনেছি তিনি আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। শপথ খোদার! যদি আমি তাকে পেতাম তা হলে এই পাথর দিয়ে তাঁর মুখে আঘাত করতাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে সে বলল "খোদার কসম! যদি আমি তাকে দেখতাম তা হলে এই দুই পাথর দিয়ে তার দাঁতে আঘাত করতাম।" ইহা শুনে হযরত উমর (রা.) বললেন, "তোমার ধ্বংস হউক, তিনি কবি নন।" সে বলল- "হে ইবনে খাত্তাব। আমি তোমার সাথে কথা বলছি না। তারকার কসম! তিনিও কবি, আমিও কবি। তিনি যেমন আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন, আমিও অনুরূপ তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা লিখব"। এই বলে সে ফিরে গেল। রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল উম্মে জমীল কি তাকে দেখেনি ? রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন- "সে আমাকে কখনো দেখবে না, কারণ আল্লাহ আমার ও তার মধ্যখানে পর্দা করে দিয়েছেন। উম্মে জামিলের না দেখার কারণ হল রাসূল (সা.) তখন কুরআন তিলাওত করছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا

("যখন আপনি কুরআন তিলাওয়াত করেন তখন আপনার ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যখানে আমি পর্দা করে দেই।")

উম্মে জামীলের এই অবস্থা সম্পর্কে همزية গ্রন্থকার বলেন-

واعدت حمالة الحطب الفهر + وجائت كأنها الورقاء
ثم جائت غضبى تقول افى مثلى + من احمد يقال الهجاء
وتولت ومارأته ومن اين + ترى الشمس مقلة عمياء

"কাষ্ঠ বহনকারীনি পাথর সংগ্রহ করে বাঘিনীর মত আসল। ক্রোধান্বিত হয়ে এসে বলল-আহমদ কি ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় আমার মত হতে পারেন। এরপর সে আহমদ (সা.)-কে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল। আর কি ভাবে এক ধ্বংস প্রাপ্ত অন্ধ সূর্যকে দেখতে পাবে ?"

যখন সূরা تبت يدا অবতীর্ণ হর তখন আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল তার ভাই আবু সূফিয়ানের কাছে গিয়ে রাগত: স্বরে বলল, হে আমার বীর পুরুষ ভাই! আপনার কি শিক্ষা হবে না যে মুহাম্মদ আমাকে কবিতা দিয়ে আক্রমণ করবে? সাথে সাথে আবু সূফিয়ান বললেন বোন, আমি এখনই তাকে শেষ করে দেব। এই বলে তরবারী নিয়ে বের হয়ে আবার দ্রুত ফিরে আসল, উম্মে জামীল ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল- "আমার সামনে এক অজগর খাড়া হয়ে গেল।" এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু লাহাব তার ছেলে উতবাকে বল- যদি তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর মেয়ে রুকিয়া (রা.)-কে তালাক না দাও তা হলে আমার মাথা দিয়ে তোমার মাথায় আঘাত করব। উতবা তালাক দিয়ে দিল। তার ভাই উতায়বা বিন আবু লাহাবের স্ত্রী ছিলেন হযরত কুলসুম (রা.) বিনতে রাসূল (সা.)। সূরা লাহাব অবতীর্ণ হলে উতায়বা বলল, আমি মুহাম্মদের (সা.) খোদাকে কষ্ট না দিয়ে ছাড়ব না। এই বলে সে দরবারে রিসালতে উপস্থিত হয়ে বলল, তারকার প্রভূর শপথ, যখন তা অস্তমিত হয়। ঐ সত্ত্বার শপথ, যিনি নিকটবর্তী হলেন এর পর ঝুলে পড়লেন। অত:পর সে রাসূল (সা.)-এর দিকে থুথু নিক্ষেপ করল এবং উম্মে কুলসুম (রা.) বিনতে রাসূল (সা.) কে তালাক দিল। তার এই আচরণে রাসূল (সা.) বদদু'আ করলেন اللهم سلط عليم كلبا من كلابك হে আল্লাহ তোমার কুকুরদের একটি কুকুরকে তার উপর ক্ষমতাশীল করে দাও।" এরপর একদিন সে তার পিতাসহ এক জামাতের সাথে শাম যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিল। রাসূল (সা.)-এর বদ দু'আ সম্পর্কে সে তার পিতাকে অবগত করেছিল। রাস্তায় তারা এক স্থানে যাত্রা বিরতি করল। সেখানকার এক পাদ্রী তার আস্তানা হতে বের হয়ে এসে বললেন, এই এলাকায় হিংস্র প্রাণীদের খুব প্রভাব। ইহা শুনে আবু লাহাব তার সঙ্গীদের লক্ষ করে বলল, তোমরা কি আমার বংশ মর্যাদা ও উপযুক্ততা সম্পর্কে অবগত? তারা সকলেই বলল, হ্যাঁ, আবু লাহাব বলল, তোমরা আজ রাত আমাকে একটু সাহায্য করবে। আমার ছেলের উপর মুহাম্মদের (সা.) বদ দু'আ আছে, এ জন্য আমার ভয় হচ্ছে। তোমাদের সকল আসবাপত্র এই উপাসনালয়ে একত্রিত কর। এরপর আমার ছেলের বিছানা পাত। এর চতুর্দিকে তোমাদের বিছানা সাজাও। এভাবেই কাজ করা হল। তারা চতুর্দিকে তাদের উট বসিয়ে রাখল এবং উতায়বাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখল। অর্থাৎ তাদের আসবাবপত্র দিয়ে তার চতুপার্শ্বে দেয়াল তৈরী করল। রাতে একটি বাঘ আসল। তা ঘুমিয়ে থাকা সকলকে শুঁকে অবশেষে উতায়বার ঝুপড়িতে আক্রমণ করে তাকে দলিত মথিত করে দিল। মৃত্যুর সময় উতায়বা বলল, হে আল্লাহ!

Scanned with CamScanner

আমি তোমাদেরকে বলে যাচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী। উতায়বার পিতা আবূ লাহাব বলল, "আমি জানতাম যে, মুহাম্মদের দু'আর অন্যথা হবে না।" ইমাম হলবী (র.) বলেন, উতায়বার শপথ হতে বুঝা যায় যে, এই ঘটনা মি'রাজের পর ঘটেছিল।

কুফার আরেকটি লোক আহলে বয়াতের নিন্দা করত নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেছিল-

صلنا كموازيد على رأس نخلة + ولم ارى مهدياعلى الجذع يصلب

وقستم بعثمان عليا سفاهة + وعثمان خير من على واطيب

"আমরা তোমাদেরকে খেজুরের ডালে চলিতে চড়াব। আর আমি কোন সৎপথ প্রাপ্তকে খেজুরের ডালে চলিতে চড়াতে দেখিনি। তোমরা নির্বুদ্ধিতার ক্ষেত্রে আমাদের উপর উসমানের কিয়াস করে থাক। অথচ উসমান আলী হতে উত্তম ও পবিত্র।" এই কবিতা শুনে হযরত জা'ফর সাদিক (রা.) হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ যদি ঐ লোক মিথ্যা বলে থাকে, তা হলে তার উপর কোন কুকুর ক্ষমতাশালী করে দিন।" পরে ঐ লোককে একটি বাঘ নিহত করেছিল।

ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন, যখন কুরাইশরা রাসূল (সা.)-এর প্রতি সীমা লঙ্ঘন করল, তখন রাসূল (সা.) তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন ইউসুফ (আ.)-এর সময়কার দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দিয়ে তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য। এর ফলে সাত বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হল না। তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি তখন অনেকে মৃত জন্তু ও হাড় ইত্যাদি খেয়ে জীবন রক্ষা করে। অবশেষে আবূ সুফিয়ানকে সাথে নিয়ে মুশরিকদের একটি দল দরবারে রিসালতে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনার দাবী হল আল্লাহ আপনাকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এখন আপনার সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাদের জন্য দু'আ করুন। রাসূল (সা.) দু'আ করলেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হল। আবার লোকেরা অতি বৃষ্টির অভিযোগ করতে লাগল। তখন রাসূল (সা.) দু'আ করলেন اللهم حوالينا ولاعلينا তৎক্ষণাত বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। অন্য এক বর্ণনায় আছে, ঐ লোকেরা বলেছিল, হে আল্লাহ, আমাদের উপর থেকে শাস্তি সরিয়ে নিন, আমরা ঈমানদার হয়ে যাব। কিন্তু যখন তারা বিপদমুক্ত হল তখন আবার নাফরমানীতে তলিয়ে গেল। এ বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, ঘটনাটি হিজরতের পূর্বে ঘটেছিল। কিন্তু হিজরতের পর যে সকল দুর্বল মুসলমান হিজরত করেননি তাদের উপর আবার নির্যাতন করতে লাগল। তখন রাসূল (সা.) আবার বদদু'আ করলেন। তারা রাসূল (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দু'আর আবেদন করল এবং তার দু'আর বরকতে তারা বিপদমুক্ত হল। সে সময় তারা অনাহারে চোখের সামনে কেবল ধূয়া দেখত। কোন লোক আসমানের দিকে তাকালে আকাশ ও তার মধ্যখানে কেবল ধূয়া দেখত। আল্লাহ তায়ালার বাণী فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ- يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন যখন আকাশ ধূয়ায় ছেঁয়ে যাবে। তা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" (দু'খান-১০)। তাঁদের উপর থেকে বিপদ দূর হয়ে যাওয়ার পর যখন তারা আবার ভ্রষ্টতা শুরু করে দিল তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করলেন يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (সে দিন আমি ধরার মত ধরব, আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী)।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা.) কা'বা শরীফ তওয়াফরত অবস্থায় তিন জন লোক উকবা বিন আবূ মুআইত, আবূ জেহেল বিন হিশাম ও উমাইয়া বিন খলফ অশালীন কথা বলল। রাসূল (সা.) ঘরে তশরীফ এনে বললেন অচিরেই ঐ

লোকগুলো তোমাদের হাতে জবাই হবে।

হযরত ফাতিমা (রা.) হতে বর্ণিত আছে- কুরাইশ নেতাগণ একমত হয়ে দেবতাদের নামে কসম করে প্রতিজ্ঞা করল, যখন মুহাম্মদ (সা.) বের হয়ে আসবেন তখন তারা একযোগে তাঁর উপর হামলা করে তাঁকে নিহত করবে। হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন, আমি কেঁদে কেঁদে এই সংবাদ রাসূল (সা.)-এর কাছে পৌছালাম। মহানবী (সা.) উযু করে মসজিদে হারামে তশরীফ নিলেন। যখন ঐ নেতারা চোখ উঠিয়ে তাঁকে দেখল তখন তারা লজ্জিত হল। রাসূল (সা.) এক মুষ্টি মাটির উপর شاهت الوجوه পড়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাদের মধ্যে যার উপরই এ মাটির কনা পড়েছিল সেই বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। همزية গ্রন্থকার বলেন বিপদ নবীদের ক্ষতি করে না বরং উপকারই করে। যেভাবে সোনা আগুনে পোড়ালে তার চমক বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও বলেন

لاتحل جانب النبي ﷺ مضاما + حين مسته منهم الاسواء

كل امر ناب النبيين ناشدة + فيه محمودة والرخاء

لم يحسن النضارهون من النار + لما اختبر اللنضار الصلاء

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর প্রতি নির্যাতন

যখন রাসূল (সা.) ৩৮ জন অনুসারী নিয়ে দারে আরকমে গোপনে ইবাদত বন্দেগী আরম্ভ করলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) মসজিদে হারামে বের হয়ে ইবাদত করার জন্য রাসূল (সা.)কে বারবার তাগীদ দিতে লাগলেন। রাসূল (সা.) বললেন আবূবকর! আমরা সংখ্যায় কম। অবশেষে আবূবকর (রা.)-এর বারবার অনুরোধে রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে মসজিদে হারামে আসলেন। হযরত আবূবকর (রা.) ভাষণ দানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূল (সা.) বসা ছিলেন। তিনিই হচ্ছেন ইসলামের প্রতি আহ্বান কারী প্রথম খতীব। তাঁর ভাষনের সাথে সাথে চারদিক হতে মুশরিকরা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে মারধর করতে শুরু করল। হযরত আবূবকর (রা.) কে সবচেয়ে বেশী মারল। উতবা বিন রবীআ আবূবকর (রা.)-কে না'ল লাগানো জুতো দিয়ে প্রহার করল। এমন হয়েছিল যে তাঁর নাক চেহারার সাথে মিশে গিয়েছিল। সংবাদ পেয়ে বনু তমীমের লোকেরা দৌড়ে আসলে মুশরিকরা সরে দাঁড়াল। একটি কাপড় দিয়ে জড়িয়ে তাঁকে ঘরে নেয়া হল। সকলের ধারণা ছিল তিনি ইন্তিকাল করেছেন। এর পর বনু তমীম মসজিদে প্রবেশ করে বলল, যদি আবু বকর মারা যান, তা হলে আমরা অবশ্যই উতবাকে হত্যা করব। অত:পর বনুতমীম আবু কুহাফাকে সাথে নিয়ে আবূবকর (রা.)-এর কাছে আসল এবং তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তিনি জবাব দিতে পারলেন না। দিন শেষে তাঁর সামান্য হুশ হল এবং কিছু বলতে লাগলেন। তাঁর প্রথম কথা ছিল রাসূল (সা.) কি করছেন? ইহা শুনে বনু তমীমের লোকেরা চলে গেল। হযরত আবূ বকর (রা.) বারবার একই কথা বলতে লাগলেন। তখন তাঁর মাতা বললেন- তোমার সঙ্গীর খবর আমরা জানি না। আবূ বকর বললেন, মা, তুমি উমরের বোন উম্মে জমীল বিনতে খাত্তাবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর রাসূল (সা.) কোথায় এবং কেমন আছেন? শেষ রাতে তাঁর মাতা ও উম্মে জামীল তাঁকে নিয়ে রাসূল (সা.)-এর খিদমতে হাযির হলেন। রাসূল (সা.) তাঁকে দেখে চুমো খেলেন ও অনেক কাঁদলেন। আবূ বকর (রা.)-এর মাতা ঐদিন ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লামা যামাখশারী বলেন, এই ঘটনা হযরত আবূ বকরের ইসলাম গ্রহণের পর ঘটেছিল এবং তা একাধিকবার ঘটার সম্ভাবনা নেই।

Scanned with CamScanner

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর প্রতি নির্যাতন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) মাকামে ইব্রাহিমের পাশে দাঁড়িয়ে সূরা الرحمٰن তিলাওয়াত শুরু করলেন। কুরাইশরা তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ল । কিন্তু তিনি তিলাওয়াত করতেই থাকলেন। লোকেরা তাঁকে মেরে তাঁর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করে দিল।

রাসূল (সা.)-এর কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে কাফিরদের বিদ্রুপ

যখন মহানবী (সা.) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন তখন একদল লোক তাঁর ডান দিকে এবং একদল বাম দিকে একত্রিত হয়ে হাত তালি দিত ও সঙ্গীত পরিবেশন করত। কুরআনের আয়াতের সাথে মিলিয়ে কবিতা রচনা করত। একে অন্যকে অনুরূপ করার পরামর্শ দিত। এসবের প্রতি নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত পদান করা হয়েছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَاالْقُرْاٰنِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ۔

আর কাফিররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করনা বরং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা বিজয় হবে। (সূরা فصلت ২৬)

নওমুসলিমদের উপর কাফিরদের নির্যাতন

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় وَمَنْ كَانَ مَيْتًافَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًايَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) যখন হযরত বিলাল (রা.)-কে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা والليل اذايغشى সূরা অবতীর্ণ করেন। আলোচ্য সূরায় والشقى বলতে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে এবং الاشقى বলতে উমায়া বিন খালফকে বুঝানো হয়েছে। والذى بخل واستغنى দ্বারা আবূ সুফিয়ানকে বুঝানো হয়েছে। কারণ আবূ বকর (রা.)-এর অনুগ্রহ ও বিলাল (রা.)-কে মুক্তির কারণে তিনি তাকে দোষারোপ করেছিলেন। কারো মতে والذى দ্বারা উদ্দেশ্য উমাইয়া বিন খলফ এবং وَمَالِاَحَدٍعِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى দ্বারা আবূ বকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা.) নির্যাতিত মুসলমানদের আরও অনেককে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। তাঁদের মধ্যে আছেন- বিলাল (রা.)-এর মাতা হাম্মামা (রা.), আমির বিন ফুহায়রা (রা.) ও আবূ ফাকীহা (রা.)। আবূ ফাকীহা সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছে ছিলেন, একদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সাফওয়ানের পিতা তাঁকে শিকল পরিয়ে দ্বি-প্রহরের রৌদ্রে বালুর উপর শুইয়ে তাঁর পেটের উপর একটি পাথর রেখে দিয়েছিল, যার ফলে তার জিহ্বা বের হয়ে এসেছিল। উমাইয়ার ভাই বলছিল তাকে আরও কঠোর শাস্তি দাও, মুহাম্মদ (সা.) যাদু দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নেবে। ইহা শুনে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এই নির্যাতিত সাহাবীদের মধ্যে আরও আছেন যানীরা (রা.) ও তাঁর মেয়ে নাহদিয়া, তাঁর মেয়ে লতীফা (রা.), হযরত আমির বিন ফুহায়রা (রা.)-এর বোন ও তাঁর মাতা। মোট কথা হযরত আবূ বকর (রা.) ৯ জন লোককে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। নির্যাতিত মুসলমানদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হযরত খাব্বাব বিন আরাত। ইসলাম পূর্ব যুগে তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল। অত:পর উম্মে আনমার তাঁকে ক্রয় করে নিল। তিনি কামার ছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন এবং তাঁর কাছে যেতেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, উম্মে আনমারের কাছে ঐ সংবাদ পৌছল, সে লোহা আগুনে গরম করে

হযরত খাব্বাব (রা.)-এর মাথায় রেখে দিত। হযরত খাব্বাব (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে তা বললেন, রাসূল (সা.) দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! খাব্বাবকে সাহায্য করুন।" দু'আর ফলে তাঁর মালিকার মাথায় এক বেদনা সৃষ্টি হল। সে সব সময় কুকুরের সাথে থাকত এবং কুকুরের মত চিৎকার করত। ডাক্তারগণ বলল তাকে আগুনের ছ্যাঁকা দিতে হবে। তখন হযরত খাব্বাব (রা.) লোহা গরম করে তার মাথায় ছ্যাঁকা দিতেন। বুখারী শরীফে আছে হযরত খাব্বাব বিন আরাত (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর খিদমতে আসলাম। তখন তিনি কাবা শরীফের কাছে চাদর মুড়ি দিয়ে অবস্থান করছেন। আমরা মুসলমানরা তখন মুশরিক কর্তৃক কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলাম। আমি বললাম ইয়া রাসূলল্লাহ (সা.) আমাদের জন্য দু'আ করবেন কি? রাসূল (সা.) উঠে বসলেন, তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের হাড় থেকে মাংস আলাদা করা হয়েছে। এটাও তাঁদেরকে ধর্ম হতে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাঁদের মাথার সিঁথিতে (মধ্যখানে) গম পিষার যন্ত্র রেখে দেয়া হত তাতে মাথা দ্বিখন্ডিত হয়ে যেত। এটাও তাদেরকে ধর্ম হতে বিচ্যুত করতে পারেনি। অচিরেই আল্লাহ তায়ালা ধর্মকে বিজয়ী করবেন, এমনকি কোন লোক সানআ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। পথিমধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। ছাগলের উপর বাঘের ভয় ছাড়া কোন ভয় থাকবে না।

হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, মুশরিকগণ একদিন আমার পিঠে আগুন রেখে দিল। আমার পিঠে তখন চর্বি ছাড়া আর কিছু জ্বালানোর মত অবশিষ্ট ছিল না। নির্যাতিত মুসলমানদের মধ্যে অন্য একজন ছিলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) যাকে আগুন দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিল। ইমাম জওযী (র.) বলেন, মহানবী (সা.) আম্মারের পাশ দিয়ে একদিন গেলেন, তখন তাঁকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। রাসূল (সা.)-তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দু'আ করলেন يانار كونى بردا وسلاما على عمار كماكنت على ابراهيم (আগুন, তুমি আম্মারের উপর শীতল হয়ে যাও যেভাবে শীতল হয়েছিলে ইব্রাহিমের উপর।) পরে যখন হযরত আম্মার (রা.) তাঁর পিঠ হতে কাপড় সরাতেন তখন দেখা যেত কোষ্ঠ রোগের ন্যায় পিঠে সাদা চিহ্ন রয়েছে। তবে এ চিহ্ন রাসূল (সা.)-এর দু'আর পূর্বে ছিল। কারণ রাসূল (সা.) এর দু'আর পর তাঁর শরীরে আগুনের চিহ্ন পড়েনি। হযরত উম্মে হানী (রা.) বলেন, একদিন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) তাঁর পিতা, তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ও মাতা সুমাইয়া (রা.) সকলকে নির্যাতন করা হচ্ছিল। রাসূল (সা.) তা দেখে বললেন صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنة (হে ইয়াসির পরিবার ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, কারণ তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।) অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি বলেছেন صبرا بال ياسر اللهم اغفرلال ياسر

এই নির্যাতনে হযরত ইয়াসির (রা.) শাহাদত বরণ করেন। হযরত সুমাইয়া (রা.)কে আবূ জেহেলের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সে তাঁর লজ্জাস্থানে বর্ষার আঘাতে তাঁকে শহীদ করে। তিনিই হচ্ছেন ইসলামে প্রথম শহীদ। অন্য এক বর্ণনায় আছে আবূ জেহেল আম্মার বিন ইয়াসির ও তাঁর মাকে গরমের দিন লোহার বর্ম পরিয়ে রৌদ্রে রেখে দিত। এ প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ হল اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ "মানুষ কি মনে করে সে কেবল 'আমরা ঈমান আনলাম' বলার কারণেই তাদেরকে পরীক্ষায় না ফেলে ছেড়ে দেয়া হবে।" (আনকাবুত-২) আরেকদিন হযরত আম্মার (রা.) রাসূল (সা.)-এর খিদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ (সা.)! আমাকে সীমাহীন নির্যাতন

Scanned with CamScanner

করা হচ্ছে। রাসূল (সা.) বললেন, হে আবুল ইয়াকদান, ধৈর্য্য ধারন কর। এরপর বললেন, হে আল্লাহ আম্মারের পরিবারের কাউকে দুঃখের আগুন দিয়ে শাস্তি দিবেন না। হযরত আবূ বকর (রা.) যখন হাবশা রওয়ানা হলেন, তখন রাস্তা হতে ইবনে দাগানা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন এবং কুরাইশদের জানিয়ে দিলেন আমি আবূ বকরকে আমার জিম্মায় নিয়ে নিলাম, কুরাইশরা তার সাথে শর্তারোপ করল আবু বকর যেন ঘরের ভিতরে নামায আদায় করেন, ঘরের বাইরে যেন কুরআন তিলাওয়াত না করেন। এ জন্য আবূ বকর (রা.) তাঁর ঘরের কাছে একটি মসজিদ তৈরী করলেন। ঐ মসজিদেই ইবাদত করতেন ও তিলাওয়াত করতেন। হযরত আবূ বকর (রা.) খুবই নম্র হৃদয়ের লোক ছিলেন। তিনি কুরআন তিলাওয়াতেরত সময় অশ্রু বিসর্জন দিতেন। এ জন্য কুরাইশ মহিলাগণ তার পাশে ভীড় জমাত। তা দেখে কুরাইশগণ বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা হারিস বিন দাগানার কাছে এ অভিযোগ নিয়ে গেল। অবশেষে তাঁকে ইবনুদ দাগানার জিম্মাদারী হতে বের করে দেয়া হল। এই হাদীস শরীফ হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন।

হাবশায় হিজরত

উপরোক্ত ঘটনাবলী হতে বিরক্ত হয়ে মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে হাবশায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। এ হিযরত হয়েছিল নবুয়তের ৫ম বছর রজব মাসে। আল্লামা কাসতালানী বলেন, এই হিজরতে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ১১ জন। ইহাই নির্ভরযোগ্য মত। এদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবার সহ ছিলেন আবার কেউ একাকী ছিলেন। কারো মতে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ১২ জন। এদের মধ্যে মহিলা ছিলেন কারো মতে ৪, কারো মতে ৫, কারো মতে ২ জন। তাদের নির্দেশক ছিলেন উসমান বিন মাযউন (রা.)। তারা নদীর তীর পর্যন্ত পায়ে হেটে গেলেন। সেখান থেকে অর্ধ দীনার দিয়ে একটি নৌকা ভাড়া করলেন। فتح الباری গ্রন্থকার বলেন, এমন সময় বনিকদের দুটি নৌকা আসল। তারা সকলেই ঐ নৌকায় আরোহন করলেন। সর্বপ্রথম বের হয়েছিলেন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)। তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত রুকিয়া (রা.) বিনতে রাসূল (সা.)-কে নিয়ে বের হলেন। ইয়াকুব বিন সুফিয়ান মুত্তাসিল সনদে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান ও রুকিয়া (রা.)-এর বের হয়ে যাওয়ার সংবাদ সর্ব প্রথম এক মহিলা রাসূল (সা.)কে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি উসমান (রা.) স্বীয় স্ত্রীকে একটি গাধায় আরোহন করে রওয়ানা হয়েছেন। রাসূল (সা.) বললেন লূত (আ.)-এর পর উসমানই প্রথম সপরিবারে হিযরত করলেন। যখন কুরাইশরা দেখল সাহাবায়ে কিরাম হাবশা গিয়ে নিরাপত্তা লাভ করেছেন, তখন তারা আমর বিন আস (রা.) ও আব্দুল্লাহ বিন আবু রবীআকে হাদিয়া তোহফা সহ নাজ্জাসীর কাছে পাঠাল। তাদের সাথে আম্মারা বিন ওলিদও ছিল। عيون গ্রন্থকার বলেন, হাবশার উভয় হিযরতের সময় আমর বিন আস (রা.) কুরাইশদের দূত ছিলেন। প্রথম বার সাথে ছিলেন আব্দুল্লাহ আর দ্বিতীয়বার ছিল আম্মারা বিন ওলিদ। আল্লামা শামী লিখেন বিশুদ্ধ মত হল প্রথম সফরে আম্মারা ও দ্বিতীয় সফরে আব্দুল্লাহ সাথে ছিলেন। যাই হোক, আসহামা নাজ্জাসী তাদের হাদিয়া গ্রহণ না করে তাদেরকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিলেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

আল্লামা কাস্তালানী আবূ নাঈম হতে বর্ণনা করেন, হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের তিনদিন পর হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) দু'আ

করেছিলেন اللهم اعز الاسلام بابی جهل او بعمربن الخطاب আল্লামা যুরকানী হযরত খাব্বাব (রা.) হতে যে হাদীস বর্ণনা করেন তার ভাষ্য ছিল اللهم ايد الإسلام بابی الحكم بن هشام او بعمربن الخطاب

অন্য এক বর্ণনায় হযরত নাফে ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন اللهم ايد الاسلام بعمربن الخطاب خاصة এই হাদীস ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। হাকিম এটাকে শায়খাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। ইমাম যহবী হযরত আয়শা (রা.)-এর হাদীস হতে ইহা সাব্যস্ত করেছেন। দুই হাদীসের সমাধান ইবনে আসাকির এভাবে দিয়েছেন যে, রাসূল (সা.) প্রথমে দুই জনের জন্য দু'আ করেছিলেন, কিন্তু যখন উহার মাধ্যমে জানতে পারলেন আবূ জেহেল মুসলমান হবে না তখন কেবল উমর (রা.) এর জন্য দু'আ করেছিলেন। আল্লামা যুরকানী দারকুতনী হতে বর্ণনা করেন, হযত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন اللهم اعزعمر بالاسلام (হে আল্লাহ উমরকে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সম্মানিত করুন। কারণ ইসলাম অন্যকে সম্মানিত করে। ইহাকে সম্মানিত করার প্রয়োজন নেই। আল্লামা ইবনে খলদুন লিখেন হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের পর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপ-

তাঁর কাছে সংবাদ পৌছল তাঁর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ও তাঁর স্বামী সাঈদ বিন যয়েদ (রা.) মুসলমান হয়ে গেছেন। হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.) তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষা দেন। ইহা শুনে হযরত উমর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর বোনের কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রহারে রক্তাক্ত করে দিলেন। হযরত ফাতিমা বললেন "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি ও মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য করেছি। সুতরাং আপনি যা ইচ্ছে করুন।" ইহা শুনে হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.) ও গোপন স্থান হতে বের হয়ে আসলেন এবং উমর (রা.) কে বুঝাতে লাগলেন। এতে উমর (রা.)-এর অন্তরে এক রকম কৈফিয়ত সৃষ্টি হল। তিনি বললেন, কুরআন হতে কিছু পড়। হযরত খাব্বাব (রা.) সূরা ত্বা-হা পাঠ করে শুনালেন। তিলাওত শুনে তিনি কেঁপে উঠলেন এবং বলে উঠলেন যখন তোমরা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছে করেছিলে, তখন কি করেছিলে? খাব্বাব তাঁকে বাহ্যিক তাহারতের পদ্ধতি বলে দিলেন। উমর রাসূল (সা.)-এর অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত খাব্বাব তাঁকে নিয়ে দরবারে রিসালতে উপস্থিত হলেন। এদিকে রাসূল (সা.) ইলহামের মাধ্যমে অবগত হয়ে বাইরে তশরীফ আনলেন এবং উমর (রা.) কে লক্ষ করে বললেন হে মালিক, হে ইবনে খাত্তাব। উমর জবাবে বললেন ইয়া রাসূলল্লাহ (সা.), আমি মুসলমান হয়ে এসেছি।

এর পর তিনি কলিমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। হযরত উমর (রা.)-এর পীড়াপীড়িতে রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে কা'বা শরীফে নামায আদায় করতে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সীরতে ইবনে খলদুনের হাশিয়ায় আছে- হযরত উমর (রা.) ৩৯ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। মাদারিজ গ্রন্থকার লিখেন, কারা শরীফে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ হে নবী (সা.)-আপনার জন্য আল্লাহ ও আপনার অনুসারী মুসলমানগণই যথেষ্ট। مواهب গ্রন্থকার বলেন, হযরত উমর (রা.) سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي السَّمٰوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ সূরা নিজে নিজে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

Scanned with CamScanner

হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ৩টি কারণ বর্ণিত আছে ১. রাসূল (সা.)-এর মুখে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শুনে ২. দেবতার আওয়ায শুনে ৩. হযরত খাব্বাব বিন আরত এর মুখে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শুনে। সকল বর্ণনার সামঞ্জস্য এভাবে দেয়া যায়, রাতে রাসূল (সা.)-এর তিলাওয়াত শুনে তাঁর মধ্যে ঈমানের ভিত্তি তৈরী হয়ে যায়। পরের দিন তাঁর খালু আবু জেহেলের কথায় আবার বের হলেন। পথিমধ্যে দেবতা ও তাঁর বোনের ঘটনা ঘটে। এরপর দরবারে রিসালতে উপস্থিত হয়ে কলিমা পড়ে মুসলমান হন। নিম্নোক্ত বর্ণনা হতে এই সমাধানের যথার্থতা পাওয়া যায়।

'আবু নাঈম 'দালাইল' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত তালহা ও হযরত আয়শা (রা.) হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, যে মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যা করতে পারবে তার জন্য আবু জেহেল ১০০টি লাল ও কালো উটনী এবং এক হাজার আওকিয়া রৌপ্য পুরস্কার নির্ধারণ করল। আমি তাকে বললাম, হে আবুল হকম, পুরস্কার ঠিকই হয়েছে। এই বলে আমি উক্ত কাজের জন্য বের হয়ে গেলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম এক গো-বৎসের ভিতর হতে আওয়ায আসছে হে যুরাইহ এর বংশের লোক। একটি সাফল্যদান কারী বিষয় শুন। একজন লোক সাবলীল ভাষায় আহ্বান করছেন। "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল"- এই বাণীর প্রতি সাক্ষ্যের জন্য তিনি আহবান করছেন। ইহা শুনে আমি মনে মনে বললাম এই আহবান দ্বারা আমাকেই সতর্ক করা হচ্ছে। এরপর আমি মূর্তির পাশে গেলাম। মূর্তির ভিতর ভিতর হতে আওয়ায আসল ঃ

يا ايها الناس ذوالاحسام + ماانتم طائش الاحلام
اصبحتم كرائم الانعام + ماترون ماترى امامى
من ساطلع بحلود حى الظلام + قدلام للناظرين اتهام
بلاقور وبلاحجام .....

"হে দেহধারী মানুষ, তোমরা নিরর্থক নও। তোমরা প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানী। আমার সামনে যে চমৎকার উজ্জ্বলতা দেখছি তা তোমরা দেখছনা। যে উজ্জ্বলতা অন্ধকার বিদূরিত করে দেবে। এ আলো তেহাম হতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ পূন্যবান ও সম্মানী। দয়াবান আল্লাহ তাঁকে সম্মানীত করেছেন, তিনি শিরকের পর ইসলাম নিয়ে এসেছেন। তিনি নামায, রোযা, সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে নির্দেশ দেন। আর পাপাচার হতে মানুষকে ভয় দেখান তাই তোমরা দ্রুত বেগে ইসলামের প্রতি ধাবিত হও। এতে দূর্বলতা প্রকাশ করনা এবং পিছিয়ে পড়না।"

হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বললাম কসম আল্লাহর, এটা আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে। এরপর আমি 'দ্বিমার'-এর পাশ দিয়ে গেলাম। তার ভিতর থেকে আওয়াজ আসল।

"কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ও মুহাম্মদের আগমণের পূর্বে অনেক দিন পর্যন্ত 'দ্বিমার' এর উপাসনা করা হত। ইবনে মরয়ম (আ.)-এর পর তিনি (মুহাম্মদ) (সা.) হচ্ছেন নবুয়তের উত্তরাধিকারী। যারা দ্বিমার ও অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলবেন, হায় যদি দ্বিমার ও অনুরূপ দেবতাদের উপসানা করা না হত! হে আবূ হাফস, সত্য দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এটা তোমাকে সৎপথ দিবে। আর পথ প্রদর্শনকারী কিতাবের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আবূ হাফস, ধৈর্য ধারন কর কারণ তুমি হচ্ছ নেতা। বনু আদী সম্প্রদায়ের সম্মানের চেয়ে অন্য রকম সম্মান তুমি লাভ করবে। তুমি

বিচলিত হবে না। কারণ তুমি সত্যিকারভাবে কথায় ও কাজে ঐ ধর্মের সাহায্যকারী হবে।" হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম আমি নিশ্চিত হলাম যে, এটা আমাকে উদ্দেশ্যে করে বলা হচ্ছে। এর পর আমি নাঈম (রা.)-এর সাথে দেখা করলাম। তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বললেন কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, আমি ঐ ধর্মত্যাগী লোকটির কাছে যাচ্ছি যে কুরাইশদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করছে। আমি তাকে হত্যা করব। নাঈম (রা.) বললেন-হে উমর! তুমি কি মনে কর আবদে মনাফ গোত্র তোমাকে ছেড়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছে? এর পর বললেন তুমি কি তোমার পরিবারে ফিরে যাবে না এবং তাদের বিষয়টি সংশোধন করে দেবে না? এর পর তিনি তাঁর বোনের বাড়ীতে গমণের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

হযরত উমর (রা.) রাতে মহানবী (সা.)-এর যে তিলাওয়াত শুনেছিলেন তা ছিল সূরা الحاقة। উমর (রা. বলেন, তাঁর তিলাওয়াত শুনে আমার মনে হল তিনি কবি হবেন। তখনই তিনি তিলাওয়াত করলেন إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ـ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ـ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ـ নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের নিয়ে আসা বার্তা, এটা কোন কবির রচনা নয়। তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (সূরা হাক্কাহ ৪০-৪১)। তখন আমার মনে হল তিনি কবি না হলে জ্যোতিষ হবেন। ঠিক তখন তিনি তিলাওয়াত করলেন وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ এটা কোন গনকের কথাও নয়, তোমরা কমই অনুধাবন কর।

কুরাইশদের বিভিন্ন প্রশ্ন

এ সমস্ত ঘটনার মধ্যে আছে উতবা বিন রবীআর প্রশ্ন উত্তরে সূরা حٰمٓ অবতরণ এবং উক্ত সূরার فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ পর্যন্ত শুনে উতবার দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া উল্লেখযোগ্য।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন কুরাইশ নেতাগণ একত্রিত হল। এদের মধ্যে ছিল আসওদ বিন যামআ ওলীদ বিন মুগীরা, উমাইয়া বিন খলফ আস বিন ওয়াইল, উতবা বিন রবীআ, শায়বা বিন রবীআ, আবূ সুফিয়ান, নদ্বর বিন হারিস ও আবূ জেহেল। মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরাযী বলেন, উতবা কুরাইশদের নেতা ও অনুসৃত ছিল। গ্রন্থকার বলেন ওলীদ বিন মুগীরা কুরাইশের ৪০ জন লোক নিয়ে আসল। এদের মধ্যে উতবা বিন রবীআও ছিল। বিভিন্ন প্রশ্নের পর সে রাসূল (সা.) কে বলল, চল আমরা এমন একটি পথ অবলম্বন করি যাতে আমাদেরও তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হয়। রাসূল (সা.) বললেন তা কি? সে বলল, তোমরা আমাদের উপাস্য লাত ও মানাতের ইবাদত এক বছর করবে। আমরাও তোমাদের উপাস্যের উপাসনা এক বছর করব। যদি তোমাদের উপাস্যের উপাসনায় কল্যাণ লাভ হয়, তা হলে আমরা তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করে নেব। আর আমাদের উপাস্যের উপাসনায় কল্যাণ লাভ হলে তোমরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে নেবে। রাসূল (সা.) বললেন, আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এর জবাব না আসা পর্যন্ত আমি কিছু বলতে পারব না। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ـ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ـ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ـ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ـ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

হযরত জা'ফর সাদিক (রা.) বলেন, মুশরিকরা মুহাম্মদ (সা.)-কে বলল, যদি তুমি একদিন আমাদের উপাস্যের উপাসনা কর, তাহলে আমরা দশদিন তোমার রবের ইবাদত করব। যদি তুমি একমাস আমাদের উপাস্যের উপসানা কর, তাহলে আমরা এক বছর তোমার উপাস্যের উপাসনা করব। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়

Scanned with CamScanner

لَآاَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (يوما) وَلَآاَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآاَعْبُدُ (سنة) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ۔
উল্লেখ্য যে উপরোক্ত আয়াতগুলো জিহাদের আয়াত ও নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(الف) قل افغيرالله تأمرونى اعبد ايها الجاهلون۔ (سورة زمر۔٦٤)
হে নবী। আপনি বলুন, হে জাহিলগণ তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপসানার নির্দেশ দিচ্ছ?

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ۔
বরং আপনি আল্লাহ্‌রই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

মহানবী (সা.) যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনকে তোমরা কেন ঘৃণা কর? তারা বলল, কুরআনে আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করা হয়েছে। যদি এই কুরআন ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে আসেন, তা হলে আমরা তা মেনে নেব। তখন আল্লাহ তায়ালা وَاِذْ تَقُوْلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَ قَاوِيْلِ (الحاقة) আয়াত অবতীর্ণ করেন। অন্য আয়াতে বলেন قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ আপনি বলুন, আমার ইচ্ছামত আমি এ কুরআন পরিবর্তন করার নয়।

তারা বলেছিল অন্য একখানা কুরআন নিয়ে আস, যাতে আমাদের দোষারোপ থাকবে না; তা হলে আমরা তোমার অনুসরণ করব। অথবা কুরআনের আযাবের আয়াতসমূহ পরিবর্তন করে রহমতের আয়াত নিয়ে আস, যেখানে আমাদের উপাস্যের আলোচনা থাকবে না, থাকবে না তাদের উপাসনার নিন্দা, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। একদিন মহানবী (সা.) কুরাইশদের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে এক মজলিসে তশরীফ নিলেন। সেখানে আবূ জেহেল, ইবনে হিশাম, উতবা বিন রবীআ, শায়বা বিন রবীআ, উমাইয়া বিন খলফ, ওলীদ বিন মুগীরাও ছিল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন, তোমাদের কাছে আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি, তাতে কি মন্দ কোন কিছু রয়েছে? সবাই এক বাক্যে জবাব দিল, 'না'। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকুতম সেখানে এলেন। তিনি হযরত খাদীজা (রা.)-এর খালাতো ভাই। তিনি মক্কায় প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন ঐ সব কুরাইশ সর্দারের সাথে আলাপরত ছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে নমনীয়তা দেখতে পেলেন। এতে তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে গেলেন। এদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম বারবার রাসূল (সা.)-কে বলতে লাগলেন, আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিখান। এতেও রাসূল (সা.) তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কথা বললেন না। অন্য এক বর্ণনায় আছে; রাসূল (সা.) ইবনে উম্মে মাকতুমের সাথীকে ইশারা করে বলে দিলেন যেন তিনি কথা শেষ করা পর্যন্ত তাঁকে থামিয়ে রাখেন। সাথী লোকটি তাই করলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করলেন-

عَبَسَ وَتَوَلّٰى۔ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى۔ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى
তাঁর কাছে অন্ধ লোক আসায় তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আপনি কি জানেন, হয়ত সে?
এর পর থেকে যখনই তিনি রাসূল (সা.)-এর খিদমতে আসতেন, তখন রাসূল (সা.) বলতেন, স্বাগতম, যাঁর কারণে আমার রব আমাকে তিরস্কার করেছেন। এই বলে তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে দিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, চাঁদের চৌদ্দ তারিখ রাতে মুশরিকরা মীনায় একত্রিত হয়ে রাসূল (সা.)-কে বলল, হে মুহাম্মদ (সা:), যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক,

তাহলে চাঁদকে দু' টুকরো করে এক টুকরো আবূ কুবাইস পর্বতে এবং অপর টুকরো কাইকা'আন পর্বতে রেখে দাও। অন্য বর্ণনায় দু' পাহাড়ের পরিবর্তে পূর্ব ও পশ্চিম শব্দের উল্লেখ রয়েছে। রাসূল (সা.) বললেন, যদি আমি অনুরূপ করি, তা হলে কি তোমরা ঈমান আনবে?
তারা বলল, অবশ্যই ঈমান আনব। রাসূল (সা.) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন, আল্লাহ চাঁদকে দু'টুকরো করে দিলেন। অর্ধেক আবূ কুবাইস পর্বতে, বাকী অর্ধেক কাইকাআন পর্বতে পতিত হল। তখন রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা ঈমানের সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও। যয়নুল ইরাকী বলেন, চাঁদ দু'বার দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। তবে ইবনুল কাইয়িম বলেন, যারা মহানবী (সা.)-এর সীরাত ও আহওয়াল সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তাঁরা মনে করেন এটা সঠিক নয়। কারণ চাঁদ একবারই দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। প্রত্যক্ষ দর্শনের পরও কুরাইশরা বলতে লাগল, "ইবনে আবূ কাবশা তোমাদেরকে জাদু করেছে।" বিশেষত: আবূ জেহেল বলল, এটা জাদু, দূরবর্তী লোকদের জিজ্ঞেস করে জানতে হবে তারা দেখেছেন কি না? যখন দূর-দূরান্ত থেকে আগত মুসাফিরগণকে জিজ্ঞেস করা হল, তখন তারা জবাব দিল رابنـــاه منشقـا। আমরা (চাঁদকে) দ্বিখন্ডিত দেখেছি। আবূ জেহেল বলল هذاسحر مستمر আল্লাহ বলেনাِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ۔ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ۔
কিয়ামত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যখনই কোন নিদর্শন দেখে, তখনই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এটা চিরায়ত যাদু। (সূরা কামার ঃ ১)
'ফতহুল বারী'তে আছে ঃ খেজুর ডালের কান্না ও চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা مستفيض বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত, যা দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়।
এ প্রসঙ্গে همزية গ্রন্থকারের কবিতা উল্লেখযোগ্য।

شق عن صدره وشق له البد رومن شرط كل شرط حزاء
(তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছে। তাঁর (ইশারায়) চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। প্রতিটি শর্তের جـــزاء নিহিত আছে।)
ইমাম সবকী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন-

وبدر الدجى انشق نصفين عند + ارادت قريش منك اظهار اية
কুরাইশরা যখন আপনার কাছে নিদর্শন চাইল, তখন নিদর্শন স্বরূপ পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল।
কুরাইশরা রাসূল (সা.)-কে যেসকল প্রশ্ন করেছিল, সে সবের অনেকেরই জবাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং কিছু প্রশ্নের জবাব রাসূল (সা.) নিজের পক্ষ হতে দিয়েছেন। যেমন তাদের প্রশ্ন ছিল।
ক. ঐ পাহাড়কে সরিয়ে দাও যাতে আমাদের শহর প্রশস্ত হয়।
খ. শাম পর্যন্ত একটি নহর যারী করে দাও।
গ. আমাদের পূর্বপুরুষ বিশেষ করে কুসাই বিন কিলাবকে জীবিত করে দাও। তিনি খুব সত্যবাদী লোক ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিলে ও সত্যয়ন করলে আমরা তোমাকে সত্যয়ন করব। তাদের এসব প্রশ্নের জবাবে রাসূল বলেন ঃ مالهذا بعثت لكم انما جئتكم من الله بمابعثنى به আমি এ জন্য প্রেরিত হইনি। আমি এসেছি আল্লাহ যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা নিয়ে।
এরূপ আরো অনেক প্রশ্ন তারা করত। তারা বলত, "কেন আল্লাহ আমাদের কাছে নেমে আসেন না এবং আমরা তোমার কথায় ঈমান আনব না যতক্ষণ না তুমি আল্লাহ ও

Scanned with CamScanner

ফিরিশ্‌তাকে মুখোমুখী নিয়ে না আসবে। তারা নবীকে বলত, তুমি আল্লাহর কাছে বাগান-বাড়ী, ঐশ্বর্য কামনা কর। তুমি যে দেখছি পানাহার কর, বাজারে যাও। রাসূল (সা.) তাদের জবাবে বললেন, আমি এসব চাওয়ার জন্য প্রেরিত হইনি। আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে আয়াত অবতীর্ণ করলেন-

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ۔ (فرقان)

-যখন কাফিররা বলল, আমাদের মত এক মানুষকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা আল্লাহর পক্ষে শোভনীয় নয়, তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করলেন-

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ (يونس-٢)

"এটা কি কোন মানুষের জন্য অবাক হওয়ার বিষয় যে, আমি ওহী অবতীর্ণ করেছি তাদের মধ্য হতে এক লোকের প্রতি, যিনি মানুষকে ভয় প্রদর্শন করবেন।" তখন কাফিররা বলতে লাগল

وَاسْقُطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ

তা ছাড়া তারা আরও বলত, হে মুহাম্মদ (সা.), তোমাকে এসব ইয়ামামার রহমান তথা মুসায়লামা শিখিয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ বলেন-

قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ

-"হে নবী (সা.), আপনি বলুন, তিনিই রব, তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই; তাঁরই উপর আমি ভরসা রাখি, আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনস্থল।"

পূর্ববর্তী উম্মতদের যারা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্যে নিদর্শন অবতীর্ণ হওয়ার পরও তাঁর নাফরমানী করেছিল, তাদের মূলোৎপাটন করে দেয়া হয়েছিল। এ জন্য এই উম্মতকেও আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে সতর্ক করেছেন-

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً (انفال-٢٥)

-সেই শাস্তির ভয় কর, যা কেবল যালিমদের জন্যই আসবে না।

আবূ জেহেল বললো, মুহাম্মদের কাছে যেমন ওহী আসে, আমার কাছেও যতক্ষণ না অনুরূপ ওহী আসবে, ততক্ষণ আমি ঈমান আনব না। এর জবাবে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ

তারা বলে, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না আমাদের প্রতি অনুরূপ বাণী আসবে।

هـمزية গ্রন্থকার এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন যার মর্মার্থ নিম্নরূপ : "কাফিরদের জন্য আশ্চর্যজনক কথা যে কুরআনে জ্ঞানবানদের জন্য রয়েছে হিদায়াত; সেই কুরআনের মাধ্যমেই তারা ভ্রষ্টতায় সম্প্রসারিত হয়েছে। তারা অবতীর্ণ কিতাব চাচ্ছে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের কাছে কিতাব তো এসেছে। তাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয়? এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে উপদেশ। এতে রয়েছে মানুষের জন্য রহমত ও রোগ-মুক্তি। কুরআনের আয়াত জীন ও মানুষকে অক্ষম করে দিয়েছে। তা না হলে কেন তাদের অলংকারবিদ ও বুদ্ধিজীবিগণ অনুরূপ আয়াত রচনা করতে পারছে না? এর অনন্য শাব্দিক বিন্যাসের কারণে প্রতিদিন অনেক শ্রবণকারী ও পাঠক হিদায়াত পাচ্ছে। শ্রবণকারী ও বুদ্ধিমানগণ তা থেকে প্রশান্তি লাভ করছে। কারণ ইহা হচ্ছে অলংকারে পূর্ণ ও সুমিষ্ট।"

ওলীদ বিন মুগীরা একদিন বলল, মক্কায় আমাকে এবং তায়েফে আবূ মাসউদ সাকাফীকে নেতা বিবেচনা করা হয়। তা হলে ওহী কেন মুহাম্মদের কাছে আসে?

আমাদের কাছে কেন আসে না? আল্লাহ বলেন-

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ۔

দুই গ্রামের গণ্যমান্য দুইলোকের প্রতি কোন এই কুরনআন নাযিল হল না। তাদের ঐ কথার জবাবে আল্লাহ বলেন (زخرف) اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ (তারা কি আপনার প্রতিপালকের রহমতকে ভাগ করে নিয়ে গেছে?) অন্য এক বর্ণনায় আবূ মাসউদ এর স্থলে উরওয়া বিন মাসউদ-এর নাম এসেছে।

সূরা والضحى হতে ناس পর্যন্ত তকবীর পড়ার দলীল

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে তিন/চার/পনের বা চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওহী অবতরণ বন্ধ ছিল। এ কারণেই তাঁর ঘরে কুকুরের বাচ্চা পড়ে থাকা, দরজায় ছবি থাকা ও নখ কর্তন না করা এসব বিষয় ঘটেছিল। হাফিয ইবনে হাজার (র.) বলেন, জীবরীল (আ.)-এর দেরীতে আসার কারণেই কুকুরের বাচ্চার সেই ঘটনা ঘটেছিল, যা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রাসূল (সা.)-কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন স্বয়ং জিবরীল (আ.) এর জবাব দিয়েছিলেন এভাবে-

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ۔ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ (مريم ٤٢)

আমরা আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ না পেলে অবতরণ করি না। আমাদের সামনে-পেছনে ও এর মধ্যিখানে যা আছে সকল তাঁরই মালিকানাধীন। আর আপনার প্রতিপালক বিস্মৃত হওয়ার নন। সূরা والضحى হতে ناس পর্যন্ত প্রত্যেক সূরা তিলাওয়াতের পর তকবীর পড়ার দলীল 'সীরাতে হলবী'তে আছে, যখন সূরা والضحى অবতীর্ণ হল, তখন রাসূল (সা.) ওহী অবতরণের আনন্দে তকবীর পাঠ করলেন। হযরত ইকরামা বিন সুলাইমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইসমাঈল বিন আবদে রব-এর কাছে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলাম। যখন সূরা والضحى পড়লাম, তখন তিনি বললেন, তকবীর পড়, কারণ আমি সাত কারীর অন্যতম আবদুল্লাহ বিন কাসীর-এর কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেছি। সূরা والضحى তে পৌছলে তিনি বললেন, এখান হতে শেষ পর্যন্ত তকবীর পাঠ করবে। ইব্‌নে কাসীর আমাকে বলেছেন, তিনি মুজাহিদ (র.)-এর কাছে পড়েছেন, তিনিও অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা.) অনুরূপ আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত উবাই বিন কাব (রা.) অনুরূপ করতে বলেছেন। হযরত উবাই (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ এই হাদীসকে গরীব বলে থাকেন।

ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, যদি তুমি নামাযে বা নামাযের বাইরে সূরা والضحى হতে الحمد পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তকবীর না পড়, তা হলে তুমি রাসূল (সা.)-এর একখানা সুন্নত পরিত্যাগ করলে। আল্লামা ইবনে জরীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন, ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে সূরা والضحى হতে শেষ পর্যন্ত সূরার শেষে তকবীর বলা সুন্নত। হানাফী মতে, তা মুস্তাহাব।

বিদ্রুপকারীগণ

বিদ্রুপকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ۔

-বিদ্রুপকারীদের বিপক্ষে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট।

ইবনে আব্দুল বার বলেন, এখানে مستهزءين দ্বারা আবূ জেহেল, আবূ লাহাব, উকবা বিন আবূ মুআইত, উসমান (রা.)-এর চাচা হাকাম, আস বিন উমাইয়া, আস বিন

Scanned with CamScanner

ওয়াইলকে বুঝানো হয়েছে। আবূ জেহেলের বর্ণনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আবূ লাহাব ও উকবা বিন আবূ মুআইত সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, আমি দুই নিকৃষ্টতম ব্যক্তির মধ্যিখানে বাস করি। এক জন আবূ লাহাব, অন্যজন উকবা বিন আবূ মুআইত। আবূ লাহাবের অবস্থাও স্পষ্ট; বাকী উকবা। সে একদিন রাসূল (সা.)-এর চেহারা মুবারকে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। সেই থুথু ফিরে গিয়ে তার নিজের মুখে আগুনের মত নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে তার মুখের চামড়া জ্বলে যায়। মৃত্যু পর্যন্ত এর চিহ্ন তার মুখের মধ্যে থেকে যায়।

হাকাম বিন আস যদিও মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়ে যান, তবুও তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কথা রয়েছে। এ কারণে রাসূল (সা.) তাঁকে মদীনা হতে বের করে দিয়েছিলেন। তার ছেলে মারওয়ান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ অধিকাংশ আইম্মায়ে কিরাম একমত যে, যদিও কোন কোন বর্ণনায় আছে, মারওয়ানকে নিয়ে হাকাম দরবারে রিসালতে এসেছিলেন, কিন্তু তার জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়নি। বরং রাসূল (সা.) তাকে 'গিরগিটির ছেলে গিরগিটি, অভিশপ্তের ছেলে অভিশপ্ত'- বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, মারওয়ান বিন হাকাম রাসূল (সা.)-কে দেখেন নি। হযরত আয়িশা (রা.) মারওয়ানকে বলেছিলেন, তোমার পিতাকে উপলক্ষ করে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔

যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে দোষারোপ করে, পরনিন্দা করে, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। (সূরা কলম : ১০)। হযরত খাব্বাব বিন আরত কর্মকার ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আস বিন ওয়াইল একখানা তরবারী ক্রয় করেছিল। যখন তিনি এর মূল্য চাইলেন, তখন আস বলল, খাব্বাব, তোমার নবী বলেছেন বেহেশতে সর্বপ্রকার নিয়ামত পাওয়া যাবে, এ কথা কি ঠিক নয়? খাব্বাব বললেন, হ্যাঁ। আস বলল, তা হলে আমাকে একটু সময় দাও; আমি বেহেশতে গিয়ে তরবারীর মূল্য পরিশোধ করব। সেখানে সম্পদ-সন্তান সবই পাওয়া যাবে। তার এ কথার জবাবে আল্লাহ বলেন-

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا

-আপনি কি তাকে দেখেন নি যে আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে? অপর দিকে বলে আমাকে অবশ্যই সম্পদ ও সন্তান দেয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ঐ পাঁচ জন লোক একই রাতে মারা গিয়েছিল, আল্লাহর বাণী إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ এর মর্মার্থ হই। যখন দূযখ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হল- عليها تسعة عشر

তখন আবূ জেহেল বলল, ১০ জনের মুকাবিলায় আমি যথেষ্ট। তোমরা কি নয় জনের মুকাবিলা করতে পারবে না? তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন-

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۔

-আমি ফিরিশ্তাদের থেকে দূযখ রক্ষী নির্ধারিত করেছি, আর তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছি কাফিরদেরকে ফিতনায় পতিত করার উদ্দেশ্যে। (সূরা মুদ্দাস্সির)

কাফিররা যখন বলল, মুহাম্মদ! আপনি আমাদের দেবতাকে গালি-গালাজ করবেন না; তা হলে আমরাও আপনার মাবূদকে গালি-গালাজ করব না তখন আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা যাদের উপাসনা করে, আপনি সেই উপাস্যদের গালি দেবেন না, তা হলে তারা না জেনে কেবল শত্রুতা বশত আল্লাহকে গালি দেবে।" বিদ্রূপকারীদের একজন ছিল নদর বিন হারিস। সে বলল, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন,

আমিও অচিরেই তা অনুরূপ নাযিল করব। এই বলে সে কোন এক পাদ্রীর কাছ থেকে আজমীদের ইতিহাস সম্বলিত একটি বই ক্রয় করে নিয়ে এল এবং বললো, মুহাম্মদ আ'দ সামুদ ও অন্যান্য জাতির যে ঘটনা বর্ণনা করেন, এটিও অনুরূপ ঘটনার বই। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে বাজে কথা সম্বলি বই ক্রয় করে। بسنبوع গ্রন্থকার বলেন, এ আয়াত গান বিক্রির নিন্দা করে অবতীর্ণ হয়েছে। হতে পারে উভয় কারণেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। যখন রাসূল (সা.) আয়াত তিলাওয়াত করলেন, নদ্বর বিন হারিস বলল, আমরা চাইলেও অনুরূপ বলতে পারি। এটা তো পূর্ববর্তী ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। তখন আল্লাহ তাদের দাবীর অসত্যতা বর্ণনা করে বলেন, "হে নবী, আপনি বলুন, যদি সকল জীন ও ইনসান সম্মিলিত ভাবে প্রচেষ্টা করে, এই কুরআনের মত কিছু রচনা করতে, তবুও তারা পারবে না।"

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

আয়াত অবতীর্ণ হলে মক্কার কাফিররা আব্দুল্লাহ বিন যুবারীর কাছে গিয়ে বলল, মুহাম্মদের দাবী হল, আমাদের উপাসকরা দুযখের ইন্ধন হবে। আবদুল্লাহ বিন যুবারী রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, হে মুহাম্মদ (সা.), এটা কি কেবল আমাদের উপাস্যের জন্য, নাকি আল্লাহ ছাড়া যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়, সবার জন্য? রাসূল (সা.) বললেন, সবার জন্য। তখন ইবনে যুবারী বলল, নাসারাগণ ঈসা (আ.)-কে, ইহুদীগণ উযায়র (আ.)-কে এবং বনু সলীম ফিরিশ্তার উপাসনা করে। তা হলে কি তারাও দুযখের ইন্ধন হবে? তখন আয়াত অবতীর্ণ হল-

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ۔ (انبياء-١٠١)

যাদের জন্য আমার কল্যাণ অগ্রগামী হয়েছে, তারা তা থেকে দূরে থাকবে।

আবদে মনাফ গোত্রের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ

আল্লামা ইবনে খালদুন লিখেন, যখন কুরাইশরা দেখল, অধিকাংশ মুসলমান মক্কা হতে হিজরত করে হাবশায় চলে গেছেন, যাদের উপর তারা আর দাবী খাটাতে পারছে না, মক্কায় হাতে গোনা কয়েকজন মুসলমান রয়ে গেছেন, হযরত হামযা (রা.) ও হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমাগণ কাফিরদের সাথে মুখোমুখী কথা বলতে পারছেন, ফলে কাফিররা মুসলমানদেরকে কিছুই বলতে পারছে না। এ দিকে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; তখন তারা সকলে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবদের সাথে বিয়ে, লেন-দেন, মেলামেশা, সঙ্গ দেয়া, এমনকি কথাবার্তাও বন্ধ করে দেবে। এ কথার উপর তারা শপথ গ্রহণ করল এবং এ বিষয়গুলো লিখে তাতে সবাই স্বাক্ষর করে কা'বা শরীফে রেখে দিল। এই পরামর্শে বনূ হাশিমের কেবল আবূ লাহাব ছিল। বাকী সবাই আবূ তালিবের পক্ষে ছিলেন। তিন বছর পর্যন্ত এই শপথ কার্যকর থাকল। মাদারিজ গ্রন্থকার বলেন, এই শপথনামায় এটাও লিখিত ছিল যে, এই যমীনের কোন বস্তু হতে তাদেরকে উপকৃত হতে দেয়া যাবে না। তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ক্রয় করা যাবে না। তাদের কাছে কিছু বিক্রি করাও যাবে না। হজ্জের মওসুমে অন্যান্য সকল গোত্রের লোকদেরকেও তাঁদের সাথে লেনদেন না করার জন্য বলা হল।

মোটকথা, অনুরূপ শপথনামা লিখে কা'বা শরীফের দরজায় ঝুলিয়ে দেয়া হল। যে এটা লিখেছিল, তার হাত নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। তিন বছর পর্যন্ত মুসলমানগণ শিআবে আবূ তালিবে অন্তরীণ থাকলেন। এ ঘটনা নবুওয়াতের ৭ম বছর মুহররম মাসে ঘটেছিল।

Scanned with CamScanner

ইমাম হলবীর মতে নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর ইহা ঘটেছিল। তিন বছর পর্যন্ত আবদে মনাফ গোত্রের কষ্ট দেখে কারো কারো অন্তর নরম হল। তখন কিছু কিছু নেতা শপথ ভঙ্গের পরামর্শ করল। এমন সময় আবূ তালিব সংবাদ পৌছালেন, আমার ভাতিজা মুহাম্মদ (সা.) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রের কেবল আল্লাহ ও রাসূলের নাম বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল অংশ পোকা খেয়ে ফেলেছে। এর পর থেকে প্রতিজ্ঞাপত্রের আমল ছেড়ে দেয়া হয়। এমন সময় হাবশায় সংবাদ পৌছল যে, সকল কুরাইশ মুসলমান হয়ে গেছে। এটা শুনেই এক দল মুসলমান মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কায় এসে তাঁরা মুসলমানদেরকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন, সে অবস্থায়ই দেখতে পেলেন। মাওয়াহিব গ্রন্থকার বলেন, এ ঘটনা নবুওয়াতের ৭ম বছর মুহররম মাসে ঘটেছিল। শপথনামার লেখক ছিল মনসূর বিন ইকরামা।

হাবশা হতে মুসলমানগণ ফিরে আসার একটি কারণ এই ছিল। যখন أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ হতে وَالْعُزَّى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন শয়তান তার শেষে জুড়ে দিল-

تلك الغرانيق العلا وان شفا عتهم لترجى

যখন সূরা শেষ করলেন, তখন রাসূল (সা.) সিজদা করলেন। সাথে মুশরিকরাও সিজদা করল। কারণ তাদের ধারণা জন্মেছিল যে, রাসূল (সা.) তাদের উপাস্যের উদ্দেশে সিজদা করছেন। এ সংবাদ জনসমক্ষে প্রচার হতে লাগল। স্বয়ং শয়তানও তা প্রচার করতে থাকল। এমনকি এ সংবাদ হাবশা পর্যন্ত পৌছল যে, মক্কাবাসী মুসলমান হয়ে গেছে এবং তারা রাসূল (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করছে। এখন সকল মুসলমানই নিরাপদ। এ কারণে কুরাইশদের নির্যাতনে নিরুপায় হয়ে যারা হাবশায় হিজরত করেছিলেন, তারা ফিরে আসলেন। রাসূল (সা.)-এর সূরা নজম তিলাওয়াত করা এবং তাঁর সাথে মুসলমান, মুশরিক ও জীনদের সিজদা করার বর্ণনা ইমাম বুখারী (র.) উল্লেখ করেন। তবে তিনি غرانيق এর হাদীসকে ভিত্তিহীন বলেছেন। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ হাদীসকে মুরসাল বলেছেন। মুহদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে এই হাদীস সম্পর্কে অনেক ভিন্ন মত রয়েছে। দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় উল্লেখ না করে কেবল সিদ্ধান্ত উল্লেখ করলাম। সিদ্ধান্ত এই যে, রাসূল (সা.) সূরা নযমের-

وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ

তিলাওয়াত করে সাকতা আদায় করেন। এমন সময় শয়তান উচ্চস্বরে تلك الغرانيق العلى وان شفا عتهم لترجى উচ্চারণ করে মানুষকে শুনিয়ে দেয়। এদিকে মুশরিকগণ মনে করে, এই অংশও কুরআনের আয়াত। এ কারণে আনন্দিত হয়ে তারাও রাসূল (সা.)-এর সাথে সিজদায় পতিত হয়। পরে যখন জানল যে, এই অংশ কুরআনের আয়াত নয়, তখন আবার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগল।

হাবশায় দ্বিতীয় বার হিজরত

অতঃপর মুসলমানরা পুনরায় মক্কা ত্যাগ করে হাবশায় যেতে লাগলেন। এদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ, তাঁর স্ত্রী রমলা বিনতে আবূ সুফিয়ান (উম্মে হাবীবাহ নামে পরিচিত)-কে সাথে নিয়ে হিজরত করল। কিন্তু সেখানে গিয়ে উবায়দুল্লাহ খৃস্টান হয়ে গেল। খৃস্টান অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর উম্মে হাবীবাহ (রা.) হাবশায়ই অবস্থান করেন। অবশেষে অষ্টম হিজরীতে রাসূল (সা.) তাঁকে নিকাহ করেন। বিস্তারিত বর্ণনা পরে উল্লিখিত হবে।

হযরত আবূ বকর (রা.) হাবশা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন; কিন্তু পথিমধ্যে ইবনে

দাগানা নিজ যিম্মায় তাঁকে মক্কা শরীফ নিয়ে এলেন। এ বর্ণনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কাফিরদের শপথনামা বাতিল হয়েছিল নবুওয়াতের দশম বছরে। ইবনে সা'দ এর মতে নবুওয়াতের ৯ম বছরে।

নাজরানের প্রতিনিধি দল

নাজরান মক্কা হতে সাত মাইল দূরে মক্কা ও ইয়ামনের মধ্যিখানে অবস্থিত। মুসলমানগণ নাজরান হয়ে হাবশা যেতেন। মুহাজিরদের মাধ্যমে নাজরানবাসী রাসূল (সা.) সম্পর্কে জানতে পারে। এরপর নাজরানের খৃস্টানদের ২০ জন লোক মক্কা পৌছেন এবং রাসূল (সা.)-এর সাথে মসজিদে হারামে সাক্ষাত করেন। তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। রাসূল (সা.) সন্তোষজনক জবাব দিলেন। অতঃপর পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াত করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করলেন। লোকেরা তা শুনে অশ্রুপাত শুরু করলেন এবং সানন্দে মুসলমান হয়ে গেলেন। এতে আবূ জেহেল তাদেরকে খুবই তিরস্কার করল। তারা জবাব দিলেন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা তোমাদেরকে জাহিল বলছি না। আমরা যার উপর আছি, তার প্রতিদান আমাদের রয়েছে। তোমরা যার উপর আছ তার প্রতিদান তোমাদের রয়েছে। তখন আয়াত অবতীর্ণ হল-

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ..হতে.. لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ـ

এবং وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

এবং নবী (সা.)-এর উপর যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তারা যখন তা শুনে, তখন আপনি তাদের চক্ষু অশ্রুপাত করতে দেখবেন।

যিমাদ আযদীর ইসলাম গ্রহণ

وفاء الوفاء গ্রন্থকার বলেন, সেই সময় যিমাদ আযদীও মক্কায় এলেন। মক্কাবাসীরা মহানবী (সা.)-কে পাগল বলত। যিমাদ বললেন, আমি ভাল ঝাড়-ফুঁক জানি। আমার হাতে আল্লাহ তাঁকে রোগমুক্ত করবেন। এরপর রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.), আমি কি আপনাকে ঝাড়-ফুঁক দেব? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমি তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করে, এমন কেউ নেই। আবার আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হিদায়াতকারী আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

যিমাদ বললেন, কথাগুলো আবার বলুন। রাসূল (সা.) কথাগুলো তিন বার বললেন। এটা শুনে যিমাদ বললেন, "আমি অনেক জ্যোতিষী ও কবির কথা শুনেছি; কিন্তু আপনার বাণীর মত কথা আর শুনিনি। আপনি আপনার হাতখানা বাড়িয়ে দিন। আমি ইসলামের উপর বায়আত গ্রহণ করব।" তিনি বায়আত গ্রহণ করলেন। রাসূল (সা.) বললেন, তোমার কওমের পক্ষ হতেও? তিনি জবাব দিলেন, আমার কওমের পক্ষ হতেও।

হযরত খাদীজা (রা.) ও আবূ তালিবের ইন্তিকাল

ইবনে খলদুন লিখেন, হযরত খাদীজা (রা.) বিনতে খুয়াইলিদ-এর ইন্তিকালের ৩৫ বা ২৫ দিন পর আবূ তালিব ইন্তিকাল করেন। মাদারিজুন নবুওয়াত গ্রন্থকার আবূ তালিবের ইন্তিকাল নবুয়তের দশম সনে হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। আল্লামা কাসতালানী (র.)

Scanned with CamScanner

গেলেন, যখন রাসূল (সা.)-এর বয়স ৫০ বছর ৮ মাস ১১ দিন, তখন আবূ তালিব ইন্তিকাল করেন। ইমাম হলবী (র.) বলেন, বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব শি'আবে আবূ তালিব হতে বের হওয়ার ২৮ দিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন। আবূ তালিব ও খাদীজা (রা.)-এর ওফাত একই বছরে হয়েছিল। হামযিয়া গ্রন্থকার বলেন ঃ

وفقى عمه ابوطالب والد + دهرفيه السراء والضراء

ثم ماتت خديجة ذالك العام + ونالت من احمد العلماء

রাসূল (সা.)-এর চাচা আবূ তালিব ইন্তিকাল করলেন, যিনি তাঁর সংকট কালে পিতার ন্যায় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরপর ঐ বছরই খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করলেন, যিনি আহমদ (সা.)-এর কাছ থেকে অনেক উপকার লাভ করেছিলেন।" এই ঘটনা মদীনায় হিজরতের তিন বছর পূর্বে এবং নবুওয়াতের দশম বছরে হয়েছিল। আবূ তালিবকে রাসূল (সা.) মৃত্যুর সময় অনেক বুঝালেন, চাচা, তুমি একটিবার لا اله الا الله কলিমা বলে যাও। তা হলে আমি আল্লাহ্র কাছে দাবী পেশ করব অথবা সাক্ষ্য দেব। অথবা শাফাআত করব। শব্দ তিনটি বর্ণনায় এসেছে। এ সময় আবূ তালিব চুপ হয়ে গেলেন।

আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

আপনি যাকে পছন্দ করেন হিদায়াত দান করতে পারবেন না ; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করবেন।

রাসূল (সা.) বুঝে নিলেন, আবূ তালিব ঈমান গ্রহণ করেন নি। সবশেষে আবূ তালিব اخترت النار على العار আমি লজ্জার পরিবর্তে দুযখ কবুল করে নিলাম। এই বাক্য বলে ইন্তিকাল করলেন। ইমাম কাসতালানীর মতে, এর তিন দিন বা পাঁচ দিন পর হযরত খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর ইন্তিকালের পর রাসূল (সা.) হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রা.)-কে বিয়ে করলেন। হযরত খাদীজা (রা.) নবুওয়াতের দশম বছরে রামযান মাসে ৬৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। রাসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর বৈবাহিক জীবন পঁচিশ বছর ছিল। হজুন অর্থাৎ জান্নাতুল মুআল্লায় তাঁকে দাফন করা হয়।

তায়িফে ইসলামের দাওয়াত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.) ও আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর মক্কার নির্বোধ মুশরিকরা রাসূল (সা.)-কে আরো বেশী কষ্ট দিতে শুরু করল। তারা সব সময় বিদ্রূপ করতে ও কষ্ট দিতে থাকত। এমন কি নামাযরত অবস্থায় তাঁর শরীর মুবারকের উপর নোংরা বস্তুসমূহ রেখে দিত। একদিন মহানবী (সা.) সকীফ সম্প্রদায়ের নেতা আবদুল লাইল বিন আমর বিন উমাইর বিন আউফ এবং তার দুই ভাই মাসউদ ও হাবীব এর কাছে তায়িফে তশরীফ নিলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা তাঁকে অত্যন্ত কঠোর জবাব দিল। তিনি তাদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে তাদেরকে তাঁর আগমনের বিষয়টি গোপন রাখতে বললেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা রাখল না; বরং সেখানকার নিকৃষ্ট লোক ও ছোট বালকদেরকে তাঁর পেছনে লাগিয়ে দিল। ঐ দুর্ভাগারা তাঁর পেছনে তালি বাজাতে শুরু করল এবং ঢিল মারতে লাগল। অবশেষে তিনি উতবা ও শায়বা ইবনে রবীআর বাগানের দেয়ালের ছায়ায় বসলেন। ছেলেরা ফিরে গেল। তিনি একটু স্বস্থি অনুভব করলেন। তিনি আসমানের দিকে মাথা তুলে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমি আমার দুর্বলতা এবং মানুষের কাছে যথাযথ দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার অক্ষমতাকে আপনার হাতে সোপর্দ করছি। হে সর্বাধিক দয়ালু আল্লাহ্। আপনি দুর্বলের রব। আপনি

আমার রব। আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করবেন। কোন শত্রুতা পোষণকারীর হাতে সোপর্দ করবেন, যে আমার সাথে অভদ্র আচরণ করবে, নাকি আমাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবেন, যার কাছে আপনি আমার ব্যাপারটি সমঝিয়ে দিয়েছেন? আপনার ক্রোধ আমার উপর না থাকলেই তা যথেষ্ট। আপনার ক্ষমা আমার উপর সম্প্রসারণ করুন। আপনার সত্তার নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার দ্বারা অন্ধকার আলোকিত হয়েছে; ইহ ও পরকালীন বিষয়াদি পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পেয়েছে। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন আপনার গযব আমার প্রতি অবতীর্ণ না হয় এবং আপনার অসন্তুষ্টি আমার উপর আবশ্যক না হয়। আপনি ছাড়া কোন উপায় ও শক্তি নেই।'

আল্লামা কাসতালানী ও হলবী এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। সীরাতে ইবনে হিশামের বর্ণনাও অনুরূপ। রিওয়ায়াতখানা নিম্নরূপ- রাসূল (সা.) পঞ্চাশ বছর বয়সে নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়াল মাসে হযরত যায়িদ বিন হারিসা (রা.)-কে সাথে নিয়ে তায়িফ তশরীফ নিলেন। সেখানে এক মাস অন্য বর্ণনা মতে দশ দিন অবস্থান করলেন। তিনি আবদুল লাইল, মাসউদ ও হাবিবের সাথে আলাপ করা কালে তাদের একজন বলল, যদি তোমাকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়ে থাকে, তা হলে তুমি কেন পা টেনে টেনে দ্বারে দ্বারে ঘুরছ? অন্য জন বলল, আল্লাহ তোমাকে নবী বানিয়ে পাঠালেন, অন্য কাউকে কি পেলেন না? তৃতীয় জন বলল, যদি তুমি সত্য নবী হয়ে থাক, তা হলে তো তুমি অনেক বড় লোক। আমি কখনো তোমার সাথে কথা বলব না। আর যদি মিথ্যা বলে থাক, তা হলে মিথ্যাবাদীর সাথে কথা না বলাই ভাল।

আল্লামা কাসতালানী (র.) বলেন, মাসউদ ও হাবীব পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম হলবী বলেন, কেবল হাবীব পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তবে কেউই সাহাবী নন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আবদে লাইল বিন আবদে কালাম মহানবী (সা.)-কে তায়িফ থেকে বের করে দেয়ার জন্য কিছু অসৎ লোককে তাঁর পেছনে লাগিয়ে দেয়। ঐ লোকেরা তাঁর উপর পাথর ছুঁড়ে মারল। যখন তিনি অক্ষম হয়ে বসে যেতেন, তখন ঐ দুষ্ট লোকেরা তাঁর হাত ধরে খাড়া করে আবার পাথর ছুঁড়ত এবং হাসত। এ সময় হযরত যায়িদ বিন হারিসা (রা.) রাসূল (সা.)-কে রক্ষার জন্য নিজেকে সামনে দিতেন। রাসূল (সা.)-এর শরীর মুবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ল। তাঁর জুতা মুবারকও রক্তে লাল হয়ে গেল। রাসূল (সা.) উতবা ও শায়বার বাগানের ছায়ায় থামলে তাঁর এরূপ নির্যাতিত অবস্থা দেখে তাদের দয়া হল। সে তার দাস উদাসকে একটি খাঞ্চায় করে কিছু আঙুর তাঁর জন্য পাঠিয়ে দিল। যখন উদাস আঙুর নিয়ে দরবারে রিসালতে উপস্থিত হল এবং রাসূল (সা.)-কে তা খেতে বলল, রাসূল (সা.) بسم الله অথবা بسم الله الرحمن الرحيم বলে খাঞ্চার দিকে হাত বাড়ালেন। শুনে উদাস আশ্চর্য হল এবং বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! এ শহরের লোক এ জাতীয় কথা বলে না। এরপর সে রাসূল (সা.)-এর চেহারা মুবারকের দিকে দেখতে লাগল। রাসূল (সা.) বললেন, হে উদাস, তুমি কোথায় থাক? তোমার ধর্ম কি? উদাস জবাব দিল, আমি খৃস্টান ও নিনবীর অধিবাসী। (নিনবী মুসিল শহরে দজলা নদীর তীরবর্তী একটি গ্রামের নাম।) রাসূল (সা.) বললেন, তা হলেতো তুমি সৎপুরুষ ইউনূস বিন মাত্তার গ্রামের লোক। উদাস বলল, আপনি ইউনুস বিন মাত্তাকে কিভাবে চিনেন? আপনি তো নিরক্ষর সম্প্রদায়ের উম্মী লোক। আমি নিনবী থেকে এসেছি। আল্লাহর কসম, সেখানেও কেউ মাত্তাকে চিনে না। রাসূল (সা.) বললেন, তিনি আমার ভাই, তিনি নবী ছিলেন। আর আমিও নবী। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি বললেন আমি তাঁর সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত। ইহা

Scanned with CamScanner

শুনেই উদাস ঝুঁকে পড়লেন এবং রাসূল (সা.)-এর মাথা, হাত ও পা মুবারকে চুমু খেলেন। উতবা ও শায়বা পরস্পর বলতে লাগল, দাসটি নষ্ট হয়ে গেছে। যখন উদাস তাদের কাছে এলেন, তারা উদাসকে বলল, উদাস! তোমার কি হল? তুমি যে তাঁর মাথা, হাত ও পায়ে চুমু খেলে? অন্য কারো সাথে অনুরূপ করতে তো দেখিনি। উদাস বললেন, হে আমার সরদার, ঐ লোকের মত উত্তম লোক এ যমীনে আর নেই। তিনি আমাকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিয়েছেন, যা নবী ছাড়া কেউ জানেন না। তখন তারা বলল, উদাস, তুমি খেয়াল রাখবে ঐ লোক যেন তোমাকে ধর্মচ্যুত না করে।

যখন রাসূল (সা.) قرن الثعالب নামক স্থানে পৌছলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা পাহাড়ের যিম্মাদার ফিরিশ্‌তাকে সাথে দিয়ে জিবরীলে আমীনকে পাঠালেন। পাহাড়ের যিম্মাদার ফিরিশ্‌তা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), যদি আপনি অনুমতি দেন, তা হলে ঐ দুই পাহাড়কে তাদের উপর উল্টে দেব। রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, হে ফিরিশ্‌তা! আমি আশা করি, এদের বংশের মধ্যে এমন মানুষ হবে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে কেবল তাঁর ইবাদত করবে। ইহা শুনে ফিরিশ্‌তা বললেন, আপনি সত্যিই করুণাময় ও দয়াশীল, যেমন আল্লাহ বলেছেন। তাঁর ধৈর্যের বর্ণনা দিয়ে হামযিয়া গ্রন্থকার বলেন ঃ

حملت قومه عليه ناقضى + واخو الحلم دأبه الاغضاء
وسع العلمين علماء وحلما + فهو بحر لم تعبه الا عتباء

রাসূল (সা.) তায়িফ হতে এসে হেরায় থামলেন। এর পূর্বে তিনি কয়েক দিন নাখলায় অবস্থান করেছিলেন। হেরায় এসে তিনি আখনাস বিন শরীক ও সুহাইল বিন আমর (দু জনই পরে মুসলমান হয়েছিলেন) এর কাছে সংবাদ পাঠালেন তাঁকে তাদের যিম্মাদারীতে গ্রহণ করার জন্য; কিন্তু কেউই সাহস করলেন না। অবশেষে মুতইম বিন আদীর কাছে সংবাদ পাঠালেন। তিনি রাসূল (সা.)-কে নিজ যিম্মাদারীতে গ্রহণ করলেন। রাসূল (সা.) মুতইম বিন আদীর ঘরে রাত যাপন করলেন। সকালে মুতইম তাঁর ছয় বা সাত জন ছেলে নিয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করতে লাগলেন। সে সময় তিনি তাঁর তরবারী সাথে রাখলেন। আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে রক্ষাকারী, না তাঁর অনুসারী? তিনি জবাব দিলেন, রক্ষাকারী। আবূ সুফিয়ান বললেন, তাকে আশ্রয় দেবে না।

জীনের আলোচনা

তায়িফ হতে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (সা.) নাখলায় অবস্থান করেন। নাখলা মক্কা শরীফ হতে এক দিনের পথ। রাসূল (সা.) রাতের নামায আদায় করছেন। হঠাৎ সাত জন জীন সেখানে পৌঁছলেন। এক জনের নাম যুবাতাহ, বাকী ছয় জনের পাঁচ জনের নাম মুনশী, নাশী, শাসির, মাদ্বির ও আহকাব। এক জনের নাম অজ্ঞাত। তারা শামের এক শহর হতে এসেছিলেন, যার সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, সেখানকার পানি মিষ্টি। সেখানকার ফল ঔষধ স্বরূপ এবং সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। রাতের নামায যে সব বর্ণনায় আছে, তা সহীহাইনের বর্ণনার বিপরীত। কারণ তাতে ফজরের নামাযের কথা উল্লেখ আছে। দু' বর্ণনার تطبيق এরূপ হতে পারে যে, যেহেতু মি'রাজের পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়নি, এ জন্য এ নামায ফজরের পূর্বে আদায় করেছিলেন। হয়ত রাতের শেষে নামায শুরু করেছিলেন এবং নামায শেষ করার পূর্বেই ফজর শুরু হয়ে গিয়েছিল। অথবা জীনেরা দুই ওয়াক্তের নামাযই শুনেছিল। মাওয়াহিব গ্রন্থকারের মতে রাসূল (সা.) নামাযে সূরা জীন তিলাওয়াত করছিলেন। জীনরা তাদের পাথেয়ের জন্য

আবেদন করল। রাসূল (সা.) বললেন-

كل عزم ذكراسم الله عليه يقع فى يد احدكم اوفرماكان لحما وكل بعرعلف لد وابكم۔

ইসমাঈল বিন যিয়াদ তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন বতনে নাখলায় নসীবিন হতে নয় জন জীন উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের নাম ছিল-

سبط۔شاصر۔ماضر۔حاسا۔ ناسا۔ يحمم۔عرقم۔اضرس۔خاضر

মোট কথা রাসূল (সা.)-এর কাছে বিভিন্ন সময়ে দল দল হয়ে জীনরা উপস্থিত হতেন। কিন্তু ঐ ঘটনাবলীকে ليلة الجن এর মধ্যে গণ্য করা হয় না। তিনটি ঘটনার জন্য লাইলাতুল জীন প্রয়োগ করা হয়। এর মধ্যে দু'বার জীনদের সাথে রাসূল (সা.)-এর সাক্ষাত হয়নি। তারা প্রথম দু'বার কুরআন শরীফ শুনে চলে যাওয়ার পর সূরা জীন অবতীর্ণ হল। দ্বিতীয় বার তারা কুরআন শুনে ফিরে যাওয়ার পর নাযিল হয়-

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ (احقاف۔٢٩)

"যখন আমি আপনার প্রতি জীনদের একটি দলকে আকৃষ্ট করে দিয়েছিলাম। তারা আপনার (তিলাওয়াত) মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।" তৃতীয় বার হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) সাথে ছিলেন। ঐ সময় জীনেরা তাদের পাথেয়ের আবেদন করে। রাসূল (সা.) প্রথম বার সূরা الرحمٰن দ্বিতীয় বার সূরা اقرأ ও তৃতীয় বার সূরা জীন পড়েছিলেন। والله اعلم

ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর শিআবুল ঈমান গ্রন্থে লিখেন হযরত কাতাদাহ (রা.)-হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ইবলিসকে যখন আল্লাহ যমীনে নামিয়ে দিলেন, তখন বলা হল, হে আল্লাহ, আপনি শয়তানকে লানত করলেন। তার ইল্‌ম কি? আল্লাহ বললেন, তার ইলম হচ্ছে যাদু। বলা হল, তার কিরাত কি? আল্লাহ বললেন, কবিতা। বলা হল, তার লেখা কি? আল্লাহ বললেন, উল্কি। বলা হল, তার খাবার কি? আল্লাহ বললেন, সব মৃত প্রাণী ও যে প্রাণী যবেহ করতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, তা। বলা হল, তার পানীয় কি? আল্লাহ বললেন, সকল নেশা উদ্রেককারী বস্তু। বলা হল, তার আবাস কোথায়? আল্লাহ বললেন, গোসলখানা। বলা হল, তার বিচরণস্থল কোথায়? আল্লাহ বললেন, বাজার। বলা হল, তার আওয়ায কোনটি? আল্লাহ বললেন, বাঁশির আওয়ায। বলা হল, তার শিকারের বস্তু কি? আল্লাহ বললেন, নারী জাতি। অতএব গোসলের জায়গা হচ্ছে শয়তানের আবাসস্থল আর বাজার হচ্ছে তাদের বিচরণের স্থান। উল্লেখ্য, ইবলিসের উপরোক্ত উদাহরণ যে সকল জীন ঈমান আনেনি, তাদের বেলায় প্রযোজ্য।

মি'রাজের বর্ণনা

নবী করীম (সা.) মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মানুষের আকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন করেছেন; কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে এত উচ্চাসনে ছিলেন যে, সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে 'পরম বন্ধু'র সান্নিধ্যে পৌছতে সক্ষম। ঐতিহাসিকগণ ও সীরাত লেখকগণ মি'রাজুন্নবী (সা.) সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়ে ভিন্ন মত করেন।

১. মি'রাজ কি রূহানীভাবে হয়েছিল, নাকি সশরীরে ? ২. কোন সময় হয়েছিল? ৩. কোন স্থান হতে ভ্রমণ শুরু হয়েছিল।?

قاضى عياض শিফা কিতাবে লিখেন-একদল লোক বলে থাকেন মি'রাজ রূহানী ভাবে হয়েছে। আর এটা ছিল স্বপ্নযোগে। তবে এ কথার উপর সবাই একমত যে, নবীগণের স্বপ্ন সত্য ও ওহী। এই মত পোষণ করেন হযরত মুআবিয়া (রা.)। হাসান হতেও অনুরূপ বর্ণিত, তবে মশহুর মত হল এর বিপরীত। এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন সীরতে

Scanned with CamScanner

ইবনে ইসহাক ও তফসীরে কবীরে উল্লেখ আছে, মুহাম্মদ বিন জরীর তাবারী হতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন, এটা হল স্বপ্ন। রাসূল (সা.)-এর দেহ প্রাণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়নি। তিনি রূহানী ভাবে মিরাজে গিয়েছিলেন। এই মত পোষণ করেন হযরত আয়িশা (রা.) এবং হযরত মুআবিয়া (রা.)। যাঁরা সশরীরে মি'রাজের পক্ষে, তাঁরা দলীল প্রদান করেন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা-

سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মি'রাজ সশরীরে হয়েছিল। কারণ اسراء অর্থ রাতের সফর। স্বপ্নযোগে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়া নয়। আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন, আমি কোন কারণ দেখছি না اسرى শব্দকে স্বপ্নযোগে প্রয়োগ করব। বরং এর আসল অর্থই গ্রহণ করা হবে। তা ছাড়া بعبده শব্দ দ্বারা পরিষ্কারভাবে সশরীরে মি'রাজ প্রমাণিত হয়। কারণ عبد-এর প্রয়োগ রূহসহ দেহের জন্য হয়ে থাকে। দেহ ছাড়া কেবল রূহের উপর এ শব্দের প্রয়োগ আরবী নিয়ম, অভিধান ও তফসীর-এর বিপরীত। সুতরাং যতক্ষণ না মি'রাজের ঘটনায় রূহ ও শরীরকে শামিল করা হবে, ততক্ষণ اسرى بعبده এর অর্থই ঠিক হবে না।

যাঁরা রূহানী মি'রাজের পক্ষে, তাঁরা দলীল প্রদান করেন- وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

যারা সশরীরে মি'রাজের প্রবক্তা, তাঁরা এই আয়াতের জবাব এভাবে দিয়ে থাকেন যদিও رؤيا শব্দ স্বপ্নের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এর অন্য অর্থ চাক্ষুষ দেখাও হয়, যাকে ফারসীতে نظارش ও হিন্দীতে 'দশনি' বলে। এর সপক্ষে বুখারী শরীফের হাদীস উল্লেখ করেন, "হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنٰكَ আয়াতে উল্লিখিত رؤيا অর্থ স্বচক্ষে দেখা। আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে সেই রাতে তা দেখিয়েছেন, যে রাতে তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ভ্রমণ করিয়েছিলেন।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ইন্তিকালের পর ৩৩ বছর জীবিত ছিলেন। সে সময় তিনি সাহাবা-ই-কিরামের ঐকমত্য অনুযায়ী 'তফসীরে কুরআন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত' বলে খ্যাত ছিলেন। এ জন্য তাঁর মতের সাথে ভিন্ন মত পোষণ কেবল হাদীসের সাথে ভিন্নমত নয়, বরং ইজমার বিরোধিতা করার শামিল।

ইমাম হলবী (র.) বলেন, সশরীরে মি'রাজের পক্ষে ৩০ খানা হাদীস রয়েছে, যে হাদীসসমূহ মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত। শায়খ আবদুল ওহাব শা'রানী ৩৪ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। সশরীরে মি'রাজ অস্বীকারকারীগণের যুক্তি হল, এত স্বল্প সময়ে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা কিয়াসের বিপরীত। এর জবাবে বলা যায়, তাঁদের কি জানা নয় যে, রাসূল (সা.) নূর ছিলেন, এ কারণে তাঁর ছায়া যমীনে পড়ত না। কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক তাঁকে নূর বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন لَقَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ (সা.)। (শরহে শিফা ঃ কাযী আয়াদ্ব র.)

তাই বিবেকবানদের বুঝানোর প্রয়োজন নেই যে সূর্য উদয়ের পর পৃথিবীতে তার আলো পৌছতে কত সময় লাগে। এ ধরনের সন্দেহ পোষণকারীগণ অন্যান্য সকল মুজিযা সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করতে পারে। যদি বিলকিসের সিংহাসন চোখের পলকের সাথে এত দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তা হলে সর্বোত্তম সৃষ্টি রাসূল (সা.)-এর জন্য কেন তা সম্ভব হবে না!

মি'রাজের দিন তারিখ সম্পর্কে মতপার্থক্য

আল্লামা কাসতালানী (র.) বলেন, রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল (সা.) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। এরপর মসজিদে আকসা হতে তাঁকে সাত আসমানের উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি তাঁর রবকে সশরীরে দু'চোখ দিয়ে দেখেন। আল্লাহ তার প্রতি যা ওহী করার তা করলেন এবং নামায ফরয করে দিলেন। অতঃপর ঐ রাতেই মক্কায় ফিরে এলেন। তিনি যখন এ সংবাদ প্রদান করলেন তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও সকল ঈমানদারগণ তা বিশ্বাস করলেন। কিন্তু কাফিররা তা অবিশ্বাস করল। মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার তারিখ সম্পর্কে আল্লামা কাসতালানী (র.)-এর একটি মত হল, মি'রাজ রজব মাসের ২৭ তারিখ হয়েছিল। আল্লামা যুরকানী (র.) এই মতের সপক্ষে বলেন, এর উপরই মানুষের আমল আর এটিই অধিক শক্ত মত। কারণ যখন কোন মাসআলায় সলফে সালেহীন ভিন্নমত পোষণ করেন এবং এর যে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার দলীল না থাকে, আর এর মধ্যে একটি মতের উপর আমল চলে আসে, তা হলে এটিই গ্রহণযোগ্য। কারণ বুঝতে হবে এই মতটি অগ্রাধিকার পাওয়ার কারণে অন্য মতের উপর প্রাধান্য পেয়েছে। তা ছাড়া কাসতালানী (র.) এই মতের উপর মুহাদ্দিসীন এর কয়েকটি মত উল্লেখ করেছেন। এ জন্য ইহা গ্রহণযোগ্য অভিমত।

ইমাম হলবী (র.) বলেন, জেনে রাখো, রাসূল (সা.)-এর মি'রাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ইহা পবিত্র কুরআন দ্বারা সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। আর এর বিস্তারিত বর্ণনা ও অলৌকিকতার ব্যাখ্যা অনেক হাদীস শরীফে রয়েছে যা এক জামাত সাহাবী (রা.) হতে বর্ণিত। ইহা রাসূল (সা.)-এর হিজরতের ছয় বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে হযম এই মত গ্রহণ করেন এবং এর প্রতি ইজমা হয়ে যাওয়ার দাবী করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে হিজরতের দু'বছর বা তিন বছর পূর্বে মি'রাজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অতঃপর মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার বার নিয়ে আলোচনা করছি। এ প্রসঙ্গে ইবনে দাহিয়ার উক্তি।

তিনি সোমবারের কথা উল্লেখ করেন। যেহেতু তাঁর জীবনের অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন তাঁর জন্ম, নবুওয়াত, হিজরত, ওফাত, মক্কা হতে বের হওয়া ও মদীনায় প্রবেশ সোমবারেই হয়েছিল। রাসূল (সা.) কোন স্থান হতে মি'রাজ শুরু করেছিলেন, এ সম্পর্কে ৫টি নাম রয়েছে। ১. হাতিম, ২. হিযির, ৩. মসজিদে হারাম, ৪. উম্মে হানী (রা.) এর ঘর ৫. শিআবে আবূ তালিব। ইবনে হাজার আসকালানী (র.) সকল বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য করেন এভাবে ঃ রাসূল (সা.) উম্মে হানী (রা.)-এর ঘরে আরাম করছিলেন। আর তাঁর ঘর ছিল শিআবে আবূ তালিবের কাছেই। যেহেতু তিনি ঘুমিয়েছিলেন, এ কারণে ফিরিশ্‌তা তাঁর ঘরের ছাদ ভেদ করে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে বের করে নিয়ে মসজিদে হারামে গেলেন। যেহেতু রাসূল (সা.)-এর তন্দ্রা অবশিষ্ট ছিল, তাই তিনি হিজরের নিকট শুয়ে পড়লেন।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমি রাত্রিবেলা মসজিদে হারামে ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় জিবরীল (আ.) এসে আমাকে নিয়ে মসজিদের দরজায় গেলেন। হঠাৎ দেখা গেল একটি সাদা প্রাণী যাকে বুরাক বলা হয়। এর গতিবেগ বিজলীর মত হওয়ার কারণে বা ইহাতে সাদা ও কালো রং-এর মিশ্রণের ফলে ইহাকে বুরাক বলা হয়। যেমন বলা হয় شاة برقاء (সাদা-কালো ছাগল।) বুরাক হচ্ছে গাধার চেয়ে একটু বড় আর খচ্চরের চেয়ে

Scanned with CamScanner

একটু ছোট। কানগুলো ঝোলানো। ইহা জীন ও লাগাম লাগানো অবস্থায় ছিল। আমি এটায় আরোহণ করলাম। ইহা এক একটি পদক্ষেপে দৃষ্টি সীমার প্রান্ত পর্যন্ত যায়। যখন ইহা নীচে নামে সামনের পা দীর্ঘ করে এবং পিছনের পা খাটো করে আবার যখন উপরে উঠে তখন পিছনের দু'পা সম্প্রসারিত করে এবং সামনের পা ছোট করে। যখন আমি এর নিকটবর্তী হলাম তখন ইহা ভীত হয়ে গেল। জিবরীল (আ.) বললেন, তুমি স্থির থেক। কারণ তোমার পিঠে মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে উত্তম কেউ কখনো সওয়ার হননি। অন্য বর্ণনায় আছে এর দুই রানে রয়েছে দুই খানা ডানা। যখন আমি এতে আরোহণের জন্য ইহার নিকটবর্তী হলাম, তখন ইহা তার পিঠ কুঁচকে দিল। অন্য বর্ণনায় আছে এর কান ভাঙতে লাগল। হযরত জিবরীল (আ.) তাঁর হাত বুরাকের পিঠে রেখে বললেন, হে বুরাক তুমি কি লজ্জাবোধ করছ না। আল্লাহ্‌র কসম তোমার পিঠে মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশী সম্মানিত কোন বান্দা কখনো আরোহণ করেননি। ইহা শুনে বুরাক লজ্জা পেল এবং স্থির হলে গেল। অতঃপর আমি তাতে আরোহণ করলাম।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, জিবরীল (আ.) বললেন, শোন, হে বুরাক! আল্লাহ্‌র কসম তোমার পিঠে তাঁর মত কোন নবী আরোহণ করেননি। বায়হাকী শরীফে আছে রাসূল (সা.) বলেন আমার পূর্বে নবীগণ এতে আরোহন করেছেন। নাসাই শরীফে আছে আমার পূর্বে নবীগণের জন্য ইহা বাধ্য হয়েছে। ইমাম নববী (র.) বলেন, সকল নবীই এতে আরোহণ করেছেন। তা প্রমাণের জন্য সহীহ বর্ণনার প্রয়োজন।

তারিখে আযরকে আছে ইবরাহীম (আ.) প্রতি বছর বুরাকে চড়ে হজ্জ করতেন। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়ার (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, বুরাক ইবরাহীম (আ.)-এর একটি বাহন, যাতে চড়ে তিনি বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করতেন। ইবনে দাহিয়ার উক্তি, রাসূল (সা.)-এর পূর্বে কেউ বুরাকে আরোহণ করেননি। তা হলে জিবরীল (আ.)-এর পূর্বোক্ত উক্তির অর্থ হবে ইতিপূর্বে আর কেউই বুরাকে আরোহন করেননি। حصائص صغرى গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে দু'টি মত উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল, একমাত্র রাসূল (সা.)ই বুরাকে আরোহণ করেছেন, কারো মতে কেবল জীন ও লাগাম অবস্থায় বুরাকে আরোহণ করা রাসূল (সা.)-এর জন্য খাস ছিল। রাসূল (সা.) বলেন, এর পর ইহা বয়তুল মুকদ্দসে পৌছল। আমি মসজিদের দরজার সাথে সংশ্লিষ্ট বৃত্তাকার স্থানে ইহা বাঁধলাম, যেখানে পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁদের বাহন বাঁধতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জিবরীল (আ.) তাঁর হাতের আঙুল দিয়ে صخرة নামে পরিচিত পাথরটি কে ছিদ্র করে দিলেন। (متاع) গ্রন্থে আছে, বায়তুল মুকাদ্দাসের صخرة পাথর পিষা আটার মত হয়ে গেল। সেখানে তিনি তাঁর বাহনটি বাঁধলেন। এখনো লোকেরা সেই স্থানটি অনুসন্ধান করে। কেউ কেউ দুই বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে থাকেন এভাবে, রাসূল (সা.) আদব রক্ষার্থে অন্যান্য নবী রাসূলের ন্যায় মসজিদের দরজার বাইরে বৃত্তাকার স্থানে বাহনটি বেঁধেছিলেন। জিবরীল (আ.) তা নিয়ে صخرة এর কাছে গেলেন যেটি তিনি আঙুল দ্বারা ছিদ্র করেছিলেন এবং এটাকে মসজিদের দরজার ভিতরে প্রবিষ্ট করলেন। যেমনত : তিনি বুঝাতে চাইলেন যাদের বাহন থাকে দরজার বাইরে আপনি তাদের ন্যায় নন, বরং আপনার বাহন দরজার ভিতরে থাকবে।

হযরত আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রোম সম্রাটের সাথে যে আলোচনা হয়েছিল তা নিম্নরূপ-

যখন রাসূল (সা.) এক পত্র দিয়ে হযরত দাহিয়া কলবী (রা.) কে রোম সম্রাটের কাছে

পাঠালেন। সম্রাট পত্র পড়ে তা রাজ সভাসদগণকে শুনালেন। চিঠি পড়ার পর সভাসদগণ বলল, জাঁহাপনা, আপনার উচিত আরবকে শেষ করে দিতে এখনই নির্দেশ প্রদান করা। সম্রাট বললেন, আরব ব্যবসায়ীগণ আমাদের এখানে আসেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করে পরে যে নির্দেশ দেয়ার, দেব। অনুসন্ধানের পর কয়েক জন আরব ব্যবসায়ীকে বাদশার দরবারে উপস্থিত করা হল। এদের মধ্যে আবূ সুফিয়ানও ছিলেন। বাদশাহ সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে নবুওয়াতের দাবীদার লোকটির অধিক নিকটবর্তী? আবূ সুফিয়ান বললেন, আমি। মাত্র চার স্তর উপরে গিয়ে তাঁর বংশ আমার বংশের সাথে মিলে গেছে। সম্রাট বললেন, তোমরা সবাই আমার সামনে এসে যাও এবং আবূ সুফিয়ানের পাশে খাড়া হও। আমি তাকে কয়টি প্রশ্ন করব। যদি আবূ সুফিয়ান উত্তর দিতে ভুল করেন তা হলে তাৎক্ষণিক তা সংশোধন করে দিবে।

সম্রাট : নবুয়তের দাবীদার লোকটি কি তাঁর পৈত্রিক রাজত্বের দাবী করছেন ?

আবূ সুফিয়ান : না,

বাদশাহ : বংশের দিক থেকে তিনি কেমন?

আবূ সুফিয়ান : তিনি আরবের মধ্যে অনন্য।

বাদশাহ : তিনি কোন কাজের নির্দেশ দেন, আর কোন কাজ থেকে নিষেধ করেন?

আবূ সুফিয়ান : তিনি ভাল কাজের নির্দেশ দেন আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন।

বাদশাহ : তাঁর অনুসারী দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ বেশী, না ধনী শ্রেণীর ?

আবূ সুফিয়ান : দরিদ্র লোক বেশী।

বাদশাহ : কোন লোক তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে পুনরায় কি তা প্রত্যাখ্যান করে?

আবূ সুফিয়ান : না, বরং দিন দিন এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

বাদশাহ : আচ্ছা আবূ সুফিয়ান, তিনি কি কখনো মিথ্যা বলেছেন?

আবূ সুফিয়ান : না, তবে আমি একটি ঘটনা বলি, যা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন তিনি সত্য বলছেন, না মিথ্যা বলছেন ?

বাদশাহ : ঘটনাটি কি ?

আবূ সুফিয়ান : তিনি বলেন, তিনি এক রাতে আমাদের মসজিদ তথা মসজিদে হারাম হতে রওয়ানা করে আপনাদের মসজিদ তথা বয়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়েছেন। আবার একই রাতে তিনি মক্কায় ফিরে এসেছেন। সম্রাট আপনিই বলুন তিনি এটা সত্য না মিথ্যা বললেন ? এমন সময় রাজাকে বাতাসকারী খাদিম বললেন ঐ রাত সম্পর্কে আমি অবগত আছি। বাদশাহ বললেন, কিভাবে তুমি জানলে? খাদিম বললেন, আমি পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদিম ছিলাম। রাতে মসজিদের দরজা বন্ধ না করে আমি ঘুমাতাম না। ঐ রাতে আমি সকল দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা বন্ধ করতে পারলাম না। আমি অন্যান্য কর্মচারী ও উপস্থিত সকলের সহযোগিতা নিয়েও তা বন্ধ করতে পারলাম না। লোকেরা বলল, হয়ত মসজিদের ভিত্তি নেমে গেছে। আগামীকাল মিস্ত্রি এনে তা ঠিক করে দেয়া হবে। আমি দরজা খোলা রেখে দিলাম। সকালে যখন মসজিদে গেলাম, তখন صخرة এর মধ্যে একটি ছিদ্র দেখতে পেলাম। তাতে রশি বাঁধার চিহ্ন দেখলাম। প্রতিটি صخرة - এর সামনে এক একটি পশুর পায়ের চিহ্ন দেখলাম। এরূপ পদচিহ্ন দুনিয়ার কোন পশুর নেই। দরজা বন্ধ করতে ও আর কোন বাধা রইল না। এ সময় আমি বলতে লাগলাম, আমরা পূর্ববর্তী কিতাবে যে সংবাদ পেয়েছিলাম আখেরী যামানার নবী এই মসজিদে নামায পড়ে মি'রাযে যাবেন। হয়ত

Scanned with CamScanner

আজ রাত মি'রায হয়ে গেছে। পরে সংবাদ নিয়ে দেখলাম ঐ রাতেই তিনি মি'রাজ করেছিলেন। আরজ এটা দরজা বন্ধ না হওয়ার কারণ ছিলই।

ইমাম হলবী বলেন, রাসূল (সা.) صخرة এর ডান দিকে قبة المعراج হতে উর্ধ্বাকাশে গমন করেছেন, এতে কোন দ্বিমত নেই। আবূ বকর ইবনুল আরবী বলেন, বয়তুল মুকাদ্দাসের সাখরা হল আল্লাহর অলৌকিক নিদর্শনের একটি। এটি একটি পাথর যা মসজিদে আকসার মধ্যখানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থাপিত। এটার চর্তুপাশে ভেঙ্গে গেছে।। যে আল্লাহ আকাশকে যমীনের উপর পড়ে যাওয়া হতে নিবৃত্ত রাখছেন, তিনিই ইহাকে মাটিতে পড়ে যাওয়া হতে রক্ষা করছেন। ইহার উপরে দক্ষিণ দিকে রয়েছে রাসূল (সা.)-এর কদমের চিহ্ন। বুরাকে আরোহণের সময় এ পদচিহ্ন পড়েছিল। অপরদিকে রয়েছে জিবরীল (আ.)-এর হাতের চিহ্ন যা দিয়ে তিনি তা ধরেছিলেন। ইমাম আবূ বকর ইবনুল আরবী পাথরের উপর কদমের চিহ্ন রয়েছে বলে সাবিত করেন। নাসির উদ্দীন দামেশকী এই ঘটনাকে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর তাঁরা দু'জন বায়তুল মুকাদ্দাসের صخرة এর দিকে মনোনিবেশ করলেন। রাসূল (সা.) ইহার পূর্ব দিক হতে উপরে উঠলেন, তখন ইহা রাসূল (সা.)-এর কদমের নিচে নড়াচড়া করতে শুরু করলো এবং নম্র হয়ে গেল। হযরত জিবরীল (আ.)এর ইঙ্গিত পেয়ে তা নড়াচড়া বন্ধ করল।

এরপর রাসূল (সা.) অন্যান্য নবীগণকে সাথে নিয়ে আযান ও ইকামতের সাথে দুই রাকআত নামায আদায় করলেন। নামাযে তাঁকে ইমাম নিযুক্ত করা হল। আযান ও ইকামত বলতে বর্তমানে প্রচলিত আযান ও ইকামত নয়। কারণ ইহা তখনো অবতীর্ণ হয়নি। ইবনে হাবীব (র.) বলেন وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا (زخرف) আয়াত খানি মি'রাজের রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতীর্ণ হয়েছে। خصائص كبرى গ্রন্থে আছে রাসূল (সা.) মি'রাজের রাতেই ইকামতের শব্দগুলো শিখেছিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রাসূলকে আযান তথা ইকামত শিক্ষাদানের ইচ্ছে করলেন তাঁকে আল্লাহর আরশের হিজাবের প্রান্ত সীমায় উঠিয়ে নিলেন। তখন হিজাবের ভিতর হতে একজন ফেরেশতা বের হয়ে বললেন اشهد ان لااله الا الله পর্দার অপর দিক হতে বলা হল আমার বান্দা ঠিকই বলছেন, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমিই বড়, আমিই সুমহান। এরপর ফেরেশতা বললেন اشهد ان لااله الا الله পর্দার অপর দিক হতে বলা হল, আমার বান্দা ঠিকই বলেছে। আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। ফেরেশতা বললেন اشهد ان محمدا رسول الله পর্দার অপর দিক থেকে বলা হল, আমার বান্দা ঠিকই বলেছে। আমিই মুহাম্মদ (সা.) নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি। ফেরেশতা বললেন حى على الصلوة- حى على الفلاح- قدقامت الصلوة-الله اكبر-لااله الا الله এরপর ফেরেশতা মুহাম্মদ (সা.)-এর দু'হাত ধরলেন এবং তাঁকে নিয়ে আকাশবাসীর কাছে এগিয়ে গেলেন। شفاء গ্রন্থকার বলেন, হিজাব বান্দার জন্য প্রযোজ্য, আল্লাহ্র জন্য নয়। যেমন আল্লাহ বলেন فهم المحجوبون তিনি বলেন, যদি রাসূল (সা.) আল্লাহকে দেখেছেন এ কথা সত্য হয়, তা হলে এটা রাসূল (সা.)-এর চোখ হতে হিজাব উঠিয়ে নেয়ার পর অন্য স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। অন্য বর্ণনায় আছে এর পর নামায কায়িম করা হল। এরপর সবাই সরে গেলেন।

দুই বর্ণনাকে একত্রিকরণ এভাবে হতে পারে যে, হযরত জিবরীল (আ.) অন্যান্য নবীগণের মধ্য হতে রাসূল (সা.) কে ইমামতীর জন্য হাত ধরে আগ বাড়িয়ে দিলেন। এমন সময় ফেরেশতা নাযিল হলেন। নবীগণকে একত্রিত করা হয়। রাসূল (সা.) ইমাম হয়ে নামায আদায় করলেন।

خصائص صغرى গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। "রাসূল (সা.)-এর একটি বৈশিষ্ট্য

হল নবীগণ ও ফেরেশতাগণের ইমামতি করেছেন।

ইমাম কুরতুবী (রা.) স্বীয় তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন- রাসূল (সা.) কে রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.) থেকে নিয়ে সকল নবীকে একত্রিত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন ৭ কাতার। তিন কাতার ছিলেন নবী ও রাসূল আর বাকী চার কাতার কেবল নবীগণের। এ হাদীসে ফিরিশতাদের উল্লেখ না করা তাদের নামায না পড়া প্রমাণ করে না।

কাযী আয়ায (রা.) বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়েছিলেন উর্ধ্ব জগতে যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ যাওয়ার সময়। আল্লামা হাফিয ইবনে হজর (র.) বলেন তিনি নবীগণকে নিয়ে নামায পড়েছিলেন عـــروج এর পূর্বে ও পরে। ইমাম হলবী বলেন, এ কথা স্পষ্ট যে, মি'রাজ থেকে ফিরেই তিনি নামায পড়েছিলেন।কারণ তা না হলে আসমানে নবীগণ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করতেন না।

হাফিয ইবনে কসীর (র.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর পরিচয় জিজ্ঞেস করা বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার অন্তরায় নয়। কারণ বায়তুল মুকাদ্দাস ও আসমানে দেখার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এ ভাবে ফেরেশতাগণ কর্তৃক তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করা ইতিপূর্বে তাকে নিয়ে নামায পড়ার অন্তরায় নয়। والله اعلم

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার সামনে সাদা ও লাল দু'টি পেয়ালা রাখা হল। আমি সাদা পেয়ালা উঠিয়ে তা থেকে পান করলাম এবং লাল পেয়ালা পরিত্যাগ করলাম। জিবরীল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি দুধ পান করলেন আর মদ পরিত্যাগ করলেন। যদি আপনি মদ পান করতেন, তা হলে আপনার উম্মত মুরতদ হয়ে যেত।

সত্যায়ন ও মিথ্যা প্রতিপন্নকরন

মুতইম বি আদি মি'রাজের ঘটনা শুনেই বলল, আজকের পূর্বে তোমার কথা বার্তা সহজ ছিল। কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মি'রাজের কথায় তুমি মিথ্যাবাদী। কারণ আমরা অনেক কষ্টে সেখানে ১ মাসে যাই আবার ১ মাসে ফিরে আসি। তুমি বলছ এক রাতে গিয়ে আবার ফিরে এসেছ। মুতইম বিন আদী আবার বলল, আচ্ছা তুমি বায়তুল মুকাদ্দাসের গঠনের বর্ণনা দাও। রাসূল (সা.) বললেন, আমি তো রাতে গিয়েছি। এমন সময় জিবরীল (আ.) তাঁর সামনে বায়তুল মুকাদ্দাস এনে তুলে ধরলেন। তিনি এর প্রতি দেখে দেখে সব কিছু বলে গেলেন।

আল্লামা ইবনে হজর বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিলকিসের সিংহাসনের মত নিয়ে আসা হয়েছিল। রাসূল (সা.)-এর মুখে বায়তুল মুকাদ্দাস এর বর্ণনা শুনে কাফিরগণ বলল, বায়তুল মুকদ্দাসের বর্ণনা তো কারো মুখে শুনে ও বর্ণনা করতে পার। এবার বল তো রাস্তায় কি কি দেখে এসেছে? রাসূল (সা.) বললেন, আমি অমুক কাফেলার পাশ দিয়ে গিয়েছি। অমুক ময়দানে বুরাকের পদশব্দ শুনে তাদের উট রশি ছিঁড়ে পলায়নের চেষ্টা করে। একটি উট পলায়ন করে অনেক দূরে চলে গেছে। আমি তোমাদেরকে ঐ উটের সন্ধান দিতে পারি। (এই বলে তিনি উটের সঠিক সন্ধান দিলেন)। এরপর আমি ফিরে এসে অমুকের উট অমুক স্থানে পেলাম। কাফেলার লোক ঘুমিয়েছিল। তাদের পাত্র পানিতে পূর্ণ ও কোন এক বস্ত্র দিয়ে ঢাকা ছিল। আমি এটা খুলে সব পানি পান করে আবার ঢেকে রেখেছি।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রাসূল (সা.) অনুমতি না নিয়ে অন্যের পানি পান করলেন কিভাবে? এর জবাব দুটি ১. আহলে আরবের নিকট মুসাফিরের জন্য অনুমতি ছাড়াই

Scanned with CamScanner

অন্যের পানি ও দুধ পান করা ঠিক ছিল। ২. রাসূল (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যের বস্তু গ্রহণ করতে পারতেন। মালিকের জন্য ওয়াজিব ছিল রাসূল (সা.)-এর চাহিদা অনুযায়ী বস্তু দিয়ে দেয়া।

এরপর রাসূল (সা.) বললেন, ঐ কাফেলা 'সানিয়া'র দিক থেকে মক্কায় আসছে। কাফেলার পূর্বের উটটি চিত্রা রঙ্গের। সত্যায়নের জন্য তারা সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখল, সত্যিই কাফেলার সামনে রয়েছে চিত্রা রঙের উট। এরপর তারা কাফেলার কাছে পানির পাত্র ও উট পলায়নের কথা জিজ্ঞেস করল। কাফেলা রাসূল (সা.)-এর কথার সত্যয়ন করল। আরেক দল হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে বলতে লাগল, তোমাদের সঙ্গী লোকটি দাবী করছেন যে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। তিনি জবাব দিলেন, যদি রাসূল (সা.) অনুরূপ বলে থাকেন, তা হলে আমি তা বিশ্বাস করি, কারণ আমি এর চেয়ে ও দুরূহ আসমানী বার্তাকে বিশ্বাস করি। যদি আমরা এটা বিশ্বাস না করি তা হলে এক মুহূর্তে আসমান হতে সংবাদ আসার কথা কিভাবে বিশ্বাস করব?

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً আয়াত দ্বারা যারা স্বপ্ন যোগে মি'রাজের দলীল দিতে চান, তাদের জবাব পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, এই আয়াত হুদাইবিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিতবহ। যখন রাসূল (সা.) স্বপ্নে দেখলেন, তিনি ও সাহাবায়ে কিরাম মাথা মুন্ডন করে ও চুল খাটো করে মসজিদে প্রবেশ করলেন; কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত হয়ে গেল। মুশরিকরা তাঁদেরকে মক্কার বাইরে আটকিয়ে দিল। এমন সময় কেউ কেউ রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বলেছিলেন মক্কায় নিরাপদে প্রবেশ করবেন। রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, হ্যাঁ, বলেছি, এই বছরের কথাই কি বলেছিলাম? তারা বললেন, না। রাসূল (সা.) বললেন, এভাবেই জিবরীল (আ.) বলেছেন। কোন কোন বর্ণনা মতে এই আয়াত বদরের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হাফিয ইবনে হজর হায়সমী বলেন, একই আয়াত বিভিন্ন কারণে অবতীর্ণ হওয়া নিষেধ করে না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা.) মুশরিকদের কাফেলা মক্কায় এসে পৌছার একটি তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তারা যখন বলেছিল, কাফেলা কখন এসে পৌছাবে? তিনি বললেন, অমুক দিন। যখন নির্ধারিত দিন আসল, কুরাইশরা কাফেলার অপেক্ষা করতে লাগল। দিন পার হয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী হল, তবুও কাফেলা আসল না। রাসূল (সা.) আল্লাহ তায়ালার নিকট দু'আ করলেন। ফলে আল্লাহ কাফেলা আসার পূর্ব পর্যন্ত সূর্যকে আটকে রাখলেন। আল্লামা সবকী বলেন ঃ "আপনার জন্য সূর্য্য অস্ত না গিয়ে আপনার আনুগত্য করেছে। আপনার কথা ঠিক রাখতে গিয়ে ইহা স্থির রয়েছে।"

এমনি ভাবে খন্দকের ঘটনার কোন এক দিন সূর্যকে অস্ত যেতে বাধা দেয়া হয়। তবে অন্য এক হাদীস شغلونا عن الصلوة الوسطى ইহার বিরোধিতা করে। ইমাম হলবী (র.) বলেন, খন্দকের ঘটনা একদিনে শেষ হয়নি বরং কয়েক দিন চলছিল। একদিন সূর্য অস্তমিত হলে তিনি আসরের নামায পড়েন। আরেক দিন সূর্যকে আটকে রাখা হয়, আসরের নামায আদায় করার পর তা অস্ত যায়। দুটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা। ইমাম বগবী (র.) বলেন, সুলাইমান (আ.)-এর জন্য সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

আল্লামা হলবী বলেন, যে কাফেলার উট হারিয়েছিল, আর রাসূল (সা.) উহার সন্ধান

দিয়েছিলেন, তা ঘটেছিল শাম যাওয়ার পথে। আর যে কাফেলার পানি পান করেছিলেন তাদের সাথে দেখা হয়েছিল মক্কা আসার পথে। অন্য এক বর্ণনায় আছে মুশরিকরা মুতইম বিন আদিকে বলল, হে মুতইম, আমাদেরকে প্রশ্ন করতে দাও। বয়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমাদের কাজ নেই। বরং হে মুহাম্মদ (সা.) আমাদের যাত্রাকারী ও ফিরে আসা কাফেলা সম্পর্কে বলুন। আপনার কি তাদের সাথে দেখা হয়েছে? রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন হ্যাঁ, আমি অমুক কাফেলাকে রাওহা নামক স্থানে পেয়েছি। রাওহা হচ্ছে মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান। মদীনা হতে ইহার দূরত্ব দুই রাত্রির পথ। (তারা) তাদের উট হারিয়ে ফেলেছে। আমি তাদের আসবাব পত্রের কাছে গেলাম, তাদের কাউকে পেলাম না। তারা সবাই উটের খোঁজে চলে গেছে। আমি একটি পাত্রে পানি পেলাম। আমি তা থেকে পান করলাম। তোমরা তাদের জিজ্ঞেস করে দেখ। মুশরিকরা বলল, লাত ও উয্যার শপথ, এটি সত্যিই একটি নিদর্শন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা.) বললেন, আমি অমুক জায়গায় অমুক কাফেলার পাশ দিয়ে এসেছি। তাদের একটি উটের দুইটি চিহ্ন রয়েছে, একটি চিহ্ন কালো, অপরটি সাদা।

মোট কথা রাসূল (সা.) তিন স্থানে তিনটি কাফেলা দেখেন, একটি রাওহায়, একটি আবওয়ায় ও অপরটি রাওহাও সানিয়ার মধ্যখানে। যখন তার তিনটি সংবাদ কাফিরগণ সংবাদ সত্য হিসেবে পেল, তখন বলল, ওলীদ সত্যই বলেছে এই লোক যাদুকর। তখনই আল্লাহ তায়ালা وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে رؤيا দ্বারা মি'রাজ বুঝানো হয়েছে এবং চাক্ষুষ দর্শন বুঝানো হয়েছে।

একবার সূর্যকে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল ইউশা'বিন নূন (আ.)-এর জন্য। তিনি মূসা (আ.)-এর অনুসারী ছিলেন। যখন আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-কে ওয়াদা দিলেন পবিত্র ভূমি তথা শামের উত্তরাধিকারী বনী ইসরাঈলকে করবেন। সেখানকার অধিবাসী ছিল তখন আমালিকা সম্প্রদায়। আমালিকাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে ছয় লাখ সৈন্য নিয়ে মূসা (আ.)-বের হলেন। তন্মধ্যে বারো জনকে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠানো হল। আউজ বিন ইনুক নামের এক ব্যক্তি তাদের বারো জনকেই স্বীয় জামার আঁচলে উঠিয়ে তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল। অথচ তার আচল ফলে ভর্তি ছিল। সে সময় সেখানকার ফল সম্পর্কে ইমাম হলবী (র.) বলেন এক গুচ্ছ আঙ্গুর উঠাতে পাঁচ জন লোকের প্রয়োজন হত। একটি ডালিমের কোষ বের করার পর ইহার গর্তে ৪/৫ জন লোক প্রবেশ করতে পারত। বারো জন লোককে নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলল, এরা এসেছে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে। এদেরকে পা দিয়ে পিষে দেই। তার স্ত্রী বলল, এদেরকে ছেড়ে দাও। এরা তাদের কওমের কাছে গিয়ে আমাদের শক্তির কথা বলবে। তারা ফিরে গিয়ে মূসা (আ.)কে ঘটনা বললেন। মূসা (আ.) তাদেরকে কওমের কাছে তা প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। তা না হলে ওরা ভীত হয়ে যুদ্ধ হতে পিছিয়ে যাবে। মূসা (আ.)-এর নিষেধ সত্ত্বেও দু'জন লোক ইউশা বিন নূন ও কালিব বিন ইউকানা বিন সিবতে বিন ইয়ামিন ছাড়া বাকী সকলেই এই ভয়ংকর সংবাদ কওমকে জানিয়ে দিল। ইহা শুনে বনী ইসরাঈলগণ মূসা (আ.)-কে জানিয়ে দিল "আপনি ও আপনার রব, আমরা এখানে বসে থাকব।" অন্য আয়াতে এসেছে।

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۔

অর্থাৎ তাদের আকৃতি বড় হলেও তোমরা ভয় করবে না কারণ আল্লাহ তাঁর ওয়াদা

Scanned with CamScanner

বাস্তবায়ন করবেনই। মূসা (আ.)-এর কথা الاملك للا نفسى واخى আয়াতে اخى অর্থ من واخاه অর্থাৎ যে তাঁর অনুগত হয়েছে। তা হলে এর অর্থ কেবল হারুন (আ.) না হয়ে ঐ দু'জনও হবেন। এর পর মূসা (আ.) বলেন فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাই প্রান্তরে ছেড়ে দিলেন। তারা ৬ ফরসখ স্থানের মধ্যে ঘুরতে থাকল। তারা সারাদিন হাটত, ভোরবেলা আবার যথাস্থানে চলে যেত। আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটত। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করতেন। এ কারণে তাদের খাবার সংগ্রহের ব্যস্ততা ছিল না। কাপড়ের ব্যাপার ছিল তারা যে কাপড় পরিধান করেছিল, তা পুরনো হতনা এবং ছিড়েও যেতনা। এমনকি মানুষ লম্বা হওয়ার সাথে সাথে তার পরনের কাপড়ও লম্বা হয়ে যেত। আর মেঘমালা তাদের মাথার উপর ছায়া দিত। মূসা (আ.) স্বীয় দু'আর জন্য লজ্জা পেলেন।

حياة الحيوان গ্রন্থে আছে বনী ইসরাঈলগণ ৪০ দিন গোবৎস পূজার কারণে চল্লিশ বছর তাদেরকে তীহ প্রান্তরে রাখা হয়। একদিনের পরিবর্তে এক বছর।

মূসা (আ.) ইন্তিকালের সময় বলে গেলেন আমার পর ইউশা নবী হবেন। আর জাব্বারীনদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তিনি আদিষ্ট হবেন। অবশেষে যখন ইউশা (আ.)-এর সময়কাল এল এবং তিনি আমালিকাদের সাথে যুদ্ধ করলেন, তখন এক শুক্রবার আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে বিজয় দান করলেন। বিজয়ের প্রাক্কালে সূর্য ডুবতে শুরু করল। ইউশা (আ.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ সূর্যকে থামিয়ে দিন, আল্লাহ সূর্যকে থামিয়ে দিলেন যতক্ষণ না শহর বিজীত হল। তিনি এই দু'আ এ জন্য করেছিলেন যে, সূর্য অস্ত গেলে শত্রুরা ঘরে চলে যাবে, যেখানে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। ইমাম সবকী এ প্রসঙ্গে কবিতায় বলেন-

وردت عليك الشمس بعد مغيبها + كمانها قد مالیوشع وردت

হে নবী (সা.) আপনার জন্য সূর্যকে অস্ত যাওয়ার পর ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যেমনটি করা হয়েছিল ইউশার জন্য।

ইমাম হলবী লিখেন, ইউসুফ (আ.) ওফাতের সময় ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যেন তাঁকে তাঁর পৈত্রিক কবরস্তানে দাফন করা হয়। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর মিসরবাসী তাঁর লাশ মর্মর পাথরে তৈরী একটি সিন্দুকে ভরে সেই সিন্দুককে একটি লোহার সিন্দুকে ঢুকিয়ে নীল নদের তলদেশে রেখে দেয় যাতে তার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় এবং সমগ্র মিসরবাসী তা থেকে বরকত লাভ করতে পারে। মূসা (আ.) শাম যাওয়ার সময় ইউসুফ (আ.)-এর লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন। মূসা (আ.) অনেক খুজেও লাশের কোন সন্ধান পেলেন না। অবশেষে বনী ইসরাঈলের এক মহিলা এ সম্পর্কে অবগত আছেন বলে জানতে পারলেন। মুসা (আ.)-তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে শাম নিয়ে যাওয়ার শর্তে তা বলে দিতে রাজী হলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার শর্তারোপ করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে মহিলার বয়স তখন ছিল নয় শ' বছর। তিনি শর্তারোপ করলেন যেন তাকে ষোল বয়সের যুবতী করে দেয়া হয় এবং তার জন্য নির্ধারিত আয়ু যেন দ্বিগুণ করা হয়। এই বর্ণনাটি انس الجليل গ্রন্থে রয়েছে। এতে আরো আছে মূসা (আ.) দু'আ করলেন ফলে ঐ মহিলার আয়ু দ্বিগুণ হয়ে গেল। তিনি আঠারো শ' বছর জীবিত ছিলেন। ঐ মহিলা নীল নদে ইউসুফ (আ.)-এর লাশ দেখিয়ে দিলেন। মূসা (আ.) তা সাথে নিয়ে শাম গেলেন।

রাসূল (সা.)-এর জন্য সূর্য অস্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল খয়বর যুদ্ধের সময়। হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.)এর মাথা

মুবারক হযরত আলী (রা.)-এর কোলে ছিল, এমন সময় তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল তাই হযরত আলী (রা.) উঠতে পারেননি। এমতাবস্থায় সূর্য অস্ত গেল। তিনি আসরের নামায পড়েননি। রাসূল (সা.) তাঁর জন্য দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, আলী এ কাজ করেছেন আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্য করে। এ জন্য সূর্যকে আপনি ফিরিয়ে দিন। আসমা (রা.) বলেন, আমি দেখলাম সূর্য অস্ত গিয়ে আবার উদিত হল। আইম্মায়ে হাদীসের মতে এই হাদীসের বিপরীত মত পোষণ ঠিক নয়। কারণ ইহা নবুওয়াতের নিদর্শন। এই হাদীস মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত। انتباع গ্রন্থে উল্লেখ আছে হযরত আসমা (রা.) এই হাদীসখানি পাঁচ রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেন। গ্রন্থকার পাঁচটি সনদেই তা উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনার দ্বারা ইবনে কসীর (র.)-এর সেই উক্তি "এই হাদীস খানা আহলে বয়তের অখ্যাত মহিলা বর্ণনা করেন যার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় নি" তা বাতির হয়ে যায়, কারণ আসমা বিনতে উমাইস অখ্যাত ছিলেন না। ইবনে জওযীর উক্তিরও জবাব হয়ে যায়। انتباع গ্রন্থের ৫ম রেওয়ায়তে আছে, হযরত আলী (রা.) খায়বরের দিন রাসূল (স.) এর সাথে গনীমত বন্টনে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় সূর্য অস্ত গেল। রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন, হে আলী, তুমি কি নামায পড়েছো ? তিনি জবাব দিলেন يارسول الله পড়িনি। এ বর্ণনা অন্যান্য সকল বর্ণনার বিপরীত। হতে পারে এ বর্ণনায় কিছু ইবারত উহ্য রয়েছে। আর তা হবে- তিনি রাসূল (সা.)-এর সাথে গনীমত বন্টনে ব্যস্ত ছিলেন। এরপর রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর কোলে মাথা মুবারক রেখে নিদ্রা গেলেন। তা হলে আর কোন বিরোধ থাকে না।

মহানবী (সা.) সাত আসমান ভ্রমণ করে সেখানকার বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন। তিনি সিদরাতুল মুনতাহার কেন্দ্রে চারটি নহর দেখলেন, দুটি অপ্রকাশ্য। মুকাতিল (র.) বলেন, এগুলো হল সালসাবীল ও কাওসার), আর দুটি প্রকাশ্য, এগুলো হল নীল ও ফোরাত। এ দুটি নহর সেখান হতে যমীনে নেমে এসেছে। আল্লাহ্র বাণী وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنَّاهُ فِى الْاَرْضِ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ আছে-এগুলো হল নীল ও ফোরাত। এগুলো জান্নাতের নীচের দরজা দিয়ে জিবরীল (আ.)-এর ডানার উপর দিয়ে যমীনে নেমে এসেছে। আল্লাহ্ এগুলোকে পাহাড়ের অভ্যন্তরে রেখেছেন। আবার কুরআন ও ঈমান উঠিয়ে নেয়ার সময় এগুলোও উঠিয়ে নিবেন। তিনি বলেন وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُوْنَ। আল্লামা সুহাইলী (র.) বলেন, নীল নদ জান্নাত হতে বের হয়ে এসেছে। যখন এটা তসবীহ পাঠ করে তখন ঘনিষ্ঠ হলে তাতে জান্নাতের পত্র দেখতে পাবে। সম্ভবত: সাইহান ও জাইহান এর দুটি শাখা।

প্রকাশ থাকে যে, কাজী আয়ায (রা.) سبحان 'সাঁতার' থেকে এসেছে এবং جيحان শব্দটি جيح হতে এসেছে যার অর্থ প্রবাহিত করে দেয়া। নেহায়া গ্রন্থকার এর সাথে দ্বিমত করেন। তিনি বলেন উলামায়ে কিরাম একমত যে, جيحون ও سيحون ও سبحان جيحان হতে আসেনি।

রাসুল (সা.) বলেন, এরপর তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় যান, যার পাতাগুলো হাতীর কানের মত, ফলগুলো খুঁটির মত। সেখানে রয়েছে সালসাবীল নামের একটি ঝর্ণা। এরপর আমাকে সপ্তম আকাশের পৃষ্ঠে নিয়ে গেলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে ষষ্ঠ আকাশে নিয়ে গেলেন। যমীন থেকে যা উপরে উঠে তার শেষ সীমা এতটুকু। এখান থেকে তারা সবাই ফিরে আসেন। আবার উপর থেকে যারা আসেন তাদেরও শেষ সীমা হচ্ছে এই স্থান। এখান হতেই তারা ফিরে যান। এখানে পাহারাদার ও অন্যান্য

Scanned with CamScanner

দায়িত্বশীল রয়েছেন। এ জন্য কেউ এ স্থান অতিক্রম করতে পারেন না। এ জন্যই এ স্থানের নাম হয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা। হাফিয ইবনে হজর দুই বর্ণনার মধ্যে সমতা আনেন এই ভাবে যে, এর মূল ষষ্ঠ আসমানে এবং ডালগুলো সপ্তম আসমানে। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক শেখ আইনী (র.)-এর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান হতে বর্ণনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমাকে নিয়ে জিবরীল (আ.) চললেন। অবশেষে সিদরাতুর মুনতাহার নিকট হিজাবে আকবরে পৌঁছলেন। জিবরীল (আ.) বললেন হে মুহাম্মদ (স.) আপনি অগ্রসর হোন। রাসূল (সা.) বলেন, আমি অগ্রসর হলাম। এরপর পৌঁছলাম একটি স্বর্নের পালংকে যার উপর বেহেশতী রেশমের বিছানা রয়েছে। জিবরীল আমাকে পিছন থেকে বললেন। হে মুহাম্মদ (সা.), নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনার প্রশংসা করছেন, আপনি তা শুনন এবং অনুসরণ করুন। তাঁর কথা যেন আপনাকে ভীত না করে। এরপর আমি আল্লাহ্র প্রশংসা শুরু করি। সেখানেই রয়েছে نورمشوی যেখান হতে কলমের লেখার আওয়ায শোনা যায়। এর পর আরশ, রফরফ, দেখান, শোনা ও সম্বোধন। অন্য বর্ণনায় আছে, যখন জিবরীল (আ.) থেমে গেলেন, তখন রাসূল (সা.) বললেন, এমন স্থানে কি কোন বন্ধু অপর বন্ধুকে ছেড়ে যায়? জিবরীল (আ.) বললেন, যদি আমি আর অগ্রসর হই তা হলে জ্বলে যাব। রাসূল (সা.) বলেন, জিবরীল সপ্তম আসমানে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এটি হচ্ছে আমার শেষ সীমা। আমি তা অতিক্রম করব না।" এরপর আমাকে নিয়ে রফরফ চলল।

خصائص صغری গ্রন্থে আছে, মিরাজের ঘটনা, সাত আসমান পরিভ্রমণ ও উর্ধ্বকাশে দুই ধনুকের ব্যবধান পরিমাণ নিকটবর্তী হওয়া ও এমন স্থান সমূহ অতিক্রম করা যা অন্য কোন নবী রাসূল বা ফেরেশ্তা অতিক্রম করেননি সবই রাসূল (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য। উক্ত গ্রন্থে ثم دنافتدلی উভয় فعل এর فاعل রাসূল (সা.) বলা হয়েছে। ইমাম হলবী (র.) হতে দু'টি রিওয়ায়াত রয়েছে। এক বর্ণনায় আছে دنا এর فاعل জিবরীল (আ.) আর تدلی এর فاعل মুহাম্মদ (সা.)। অন্য বর্ণনায় আছে دنا এর فاعل মুহাম্মদ (সা.) আর تدلی এর فاعل হচ্ছে رفرف

হাফিয ইবনে হযর (র.) হতে হাসান সনদে বায়হাকী (র.) হতে বর্ণনা করেন, উভয় فعل এর فاعل আল্লাহতায়ালা। অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত রাসূল (সা.)-এর নিকটবর্তী হলেন। তাঁদের মধ্যখানে দুই ধনুকের সম পরমাণ বা তার চেয়ে কম দূরত্ব থাকল। উল্লেখ্য যে دنا ও تدلی এর অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ হতেই সংঘটিত হয়েছে। এর দ্বারা অবতরণের অর্থ গ্রহণ করা হয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন।

রাসূল (সা.) বলেন, আমার রব আমাকে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমি জবাব দিতে পারিনি। অতঃপর তিনি তাঁর অদৃশ্য হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। আমি তার শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি আমাকে পূর্বাপর সকল জ্ঞান দান করলেন। এর মধ্যে এক প্রকার জ্ঞান যা আমার জন্য গোপন রাখা আবশ্যক। কারণ তা আমি ছাড়া অন্য কেউ বহন করতে সক্ষম নয়। আর এক প্রকার জ্ঞান যা আমার উম্মতের সবার মধ্যে প্রকাশ করে দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি একজন আহবানকারীকে বলতে শুনলাম, আপনি থামুন। আপনার রব সালাত আদায় করছেন। অথচ আমার রবে সালাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। তখন আল্লাহ বললেন, আমি কারো উপর সালাত আদায় করা হতে মুক্ত, তবে আমি কেবল বলি سبحانی سبحانی سبقت رحمتی غضبی

আমার রহমত আমার গযবের উপর অগ্রাধিকার পেয়েছে। হে মুহাম্মদ (স.) আপনি পড়ুন, "তিনি ঐ সত্তা যিনি এবং যার ফেরেশতাগণ তোমাদের উপর সালাত পেশ করছেন। তাতে তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোয় বের করেন। আর তিনি মুমিনদের প্রতি করুণাময়।" সুতরাং আমার সালাত আপনার জন্য এবং আপনার উম্মতের জন্য রহমত। আমি আপনাকে বিশেষ ভাবে হাওযে কাওসার দান করেছি। সকল জান্নাতবাসী এর পানি পান করার মাধ্যমে আপনার মেহমান।

আল্লাহকে দেখার মাসআলা

রাসূল (সা.) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) স্বচক্ষে দেখাকে অস্বীকার করেন। তিনি দলীল পেশ করেন আল্লাহর বাণী لاتدرکه الابصار দ্বারা। কোন কোন মুহদ্দিসীনে কিরাম رأیت ربه لی فی احسن صورة এই হাদীসের সনদ ও মতনকে مضطرب বলে থাকেন। হযরত ইবনে মাসউদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) হযরত আয়িশা (রা.) এর মতের সমর্থক। আবুল আব্বাস ইবনে তইমিয়া-এর পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন "রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন জেনে রাখ তোমাদের কেউ মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্কে দেখবে না। মূসা (আ.) আল্লাহ্র কাছে তাঁকে দেখার প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। (মুসলিম শরীফ)।

এর জবাবে বলা যায়, প্রথমত: ইমাম মুসলিম (র.)-এর বর্ণনায় منکم আছে, منا নেই। সুতরাং রাসূল (সা.) এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নন। ইমাম সা'লবী (র.) লিখেন- বেশীর ভাগ উলামায়ে কিরামের মতে রাসূল (সা.) আল্লাহ্ তায়ালা কে চাক্ষুষ দেখেছেন। হাফিজ দারেমী (র.) বর্ণনা করেন। ইমাম হলবী (র.) এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে বলে বর্ণনা করেন। এতে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবা ও মুহাদ্দিসীন (রা.) এমত পোষণ করে থাকেন। অনেক হাফিজে হাদীসও এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হওয়ার কথা বলে থাকেন। الاصل গ্রন্থকার এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেন-

وراه ومارواه سواه + روية العين يقظة لاالمرلى

"তিনি আল্লাহকে দেখেছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহকে দেখেন নি। তিনি জাগ্রত অবস্থায় চাক্ষুষ দেখেছেন স্বপ্নযোগে নয়।" হযরত আয়শা (রা.)-এর মতের স্বপক্ষে হযরত আবূ যর (রা.)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা.)-এর رأیت نور বলাকে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এ জবাব আয়শা (রা.)-এর মতের সহায়ক নয়, বরং তা দ্বারা আল্লাহ্র দর্শনই সাবিত হয়। কারণ তিনি বলেছেন আমি নূর দেখেছি। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন نورالسموت والارض যেহেতু আল্লাহ্র প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা সম্ভব নয়, এ জন্য তিনি انی رأیت نورا বলেছেন। হযরত আয়শা (রা.)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা.) বলেছিলেন رأیت جبریل এই দুই জবাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত ঃ هل رأیت ربك এ প্রশ্নের জবাবে رأیت جبریل বলার মধ্যে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। তা না হলে তিনি কেবল হ্যাঁ অথবা না বলতেন প্রকৃত এ রহস্য সব মহলে উদ্ঘাটনের নয়

خصائص الصغری গ্রন্থে আছে দুইবার আল্লাহ্কে দর্শনের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-কে বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। হলবী (র.) বলেন, আল্লাহ্র বাণী لَقَدْرَاٰی مِنْ اٰیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসূল (স.) আল্লাহ্র যাতী সুরত মুবারক দেখেছেন। তিনি ছিলেন সে রাজত্বের প্রধান আকর্ষণ। ইবনে দাহিয়া বলেন, রাসূল (সা.) কে ১০০০ বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে ১টি হল আল্লাহকে দেখা ও তাঁর নিকটবর্তী হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে رویة এর পক্ষে সহীহ হাদীস বর্ণিত

Scanned with CamScanner

আছে। সুতরাং এর পক্ষে মত প্রকাশ জরুরী। আর কারো পক্ষে ধারণা ও ইজতেহাদের দ্বারা ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের বিপরীত মত প্রকাশ ঠিক হবে না।

ইমাম নববী (র.) বলেন, বেশীর ভাগ উলামায়ে কিরামের মতে রাসূল (সা.) তাঁর রবকে স্বচক্ষে দেখেছেন। কারণ আল্লাহ্‌র বাণী مَازَاغَ الْبَصَرُ আয়াতে যে بصر শব্দের উল্লেখ আছে তা দ্বারা ক্বলব বুঝানো হয়নি। যেমন আমাদের মত মানুষের জন্য সূর্য দেখা। সূর্যের আলো দেখে সূর্য দেখার দাবী সঠিক হবে এবং শব্দ প্রয়োগ ও সঠিক হবে। যেমন যদি কেউ স্ত্রীকে বলে, "যদি আমি সূর্য দেখি তাহলে তুমি তালাক। এর পর সে দ্বিপ্রহরের সময় সূর্যকে দেখে নিল। তাহলে সে শপথ ভঙ্গ করল কি না? যেহেতু ঐ সময় সূর্য দেখা সম্ভব নয়। ইহাই হল مازاغ البصر এর অর্থ। অথবা কেউ আগুন দেখল, অন্য একজন জিজ্ঞেস করল আগুন কি রূপ? সে জবাব দিল লাল, এরপর যদি বলা হয় আমরা লাল রঙের অনেক বস্তু দেখেছি। তুমি আগুনের প্রকৃত দেহাবয়বের বর্ণনা দাও। এ কথা স্পষ্ট যে, সে তা বর্ণনা করতে পারবে না। তাহলে যদি একটি পরিচিত বস্তুর প্রকৃতি বর্ণনা অসম্ভব হয়ে গেল, তা হলে আল্লাহ্‌র যাতের প্রকৃতি বর্ণনায় مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَغٰى বলা সম্পূর্ণ সঠিক হবে। রাসূল (স.)-এর দেখা আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী স্বচক্ষে হয়েছিল; কিন্তু এর কৈফিয়ত বর্ণনা অসম্ভব। সুবোধ কোন লোকের পক্ষে তা বুঝে নেয়া অসম্ভব নয়। বরং কোন চেতনাশীল লোক কখনো বলতে পারেন না যে, রাসূল (সা.) আল্লাহকে দেখেছেন স্বপ্ন যোগে। রাসূল (সা.) কে মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য আবূ সুফিয়ান রোম সম্রাটের সামনে তা দিয়ে দলীল পেশ করেন। এ ঘটনা থেকে কুরাইশগণ আবূ বকর (রা.)-এর সামনে রাসূল (সা.) কে পাগল প্রমাণ করার চেষ্টা করে শরিকগণ নিজেদের মধ্যে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে। এমনকি কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। (যদি তা স্বপ্ন যোগে হত তাহলে অনুরূপ বিতর্ক হত না।) যদি কুরআনের আয়াত اسرى بعبده এর মধ্যে عبد দ্বারা রূহ অর্থ নিতে হয়, তাহলে অন্য আয়াত وَاَنَّهٗ لَمَّاقَامَ عَبْدُاللّٰهِ তে কেন عبد এর অর্থ রূহ নেয়া হয় না। اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَاصَلّٰى يَدْعُوْهُ এ আয়াতেও عبد এর অর্থ রূহ গ্রহণ করা হয় না কেন? মোট কথা পবিত্র কুরানের কোন আয়াতেই عبد অর্থ কেবল রূহ গ্রহণ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, যদিও নবীগণের স্বপ্ন ওহী, তবুও স্বপ্নে কুরআন নাযিল হওয়া সাবিত নেই। এমনকি ইসলামের কোন বিধান স্বপ্নযোগে ফরয হয়নি, নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ রুকন তো হতেই পারে না। অথচ নামায মিরাজের রাতে ফরয করা হয়। কয়েকখানা আয়াতও এ রাতে অবতীর্ণ হয়। যেমন وَمَامِنَّا اِلَّالَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ (صفت-١٦٤) এ তিন আয়াত এবং وَاسْاَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ اَرْسَلْنَا (زخرف) আয়াত মিরাজের রাতে অবতীর্ণ হয়। আল্লামা ইবনে খলদুন এর মতে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ মিরাজের রাতে অবতীর্ণ হয়।

وَلَاتَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًامَّدْحُوْرًا হতে اٰخَرَ فَتَقْعُدَمَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا (সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ২২ হতে ৩৯ পর্যন্ত আয়াত সমূহ।) এই আয়াত সমূহে আল্লাহ তায়ালা দীনের ই'তিকাদী ও আমলী উভয় প্রকার বিধান অবতীর্ণ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ ও এ দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে। এই ই'তেকাদী বিধান সমূহ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা ৫ ওয়াক্ত নামায মি'রাজের রাতে ফরয করেন। والله اعلم

বিভিন্ন আরব গোত্রের কাছে রাসূল (সা.)-এর দাওয়াত পেশ

তিন বছর পর্যন্ত রাসূল (সা.) গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। এর পরবর্তী দশ বছর পর্যন্ত হজ্জের মাওসুমে সকল গোত্রের কাছে গিয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন। হাজীগণের এক একটি গোত্র মাওফিক ও মানযাল-এ যেতেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ আহলে আরব যখন হজ্জ করতে আসতেন, তখন প্রথমে শাওয়াল মাসে উকাযের বাজারে অবস্থান নিতেন। এরপর বিশ দিন মাজনা বাজারে অবস্থান নিতেন। এরপর হজ্জের পূর্ব পর্যন্ত যুল মাজায নামক বাজারে থাকতেন। এ সময় মহানবী (সা.) এ সমস্ত অবস্থানেও বাজারে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন। তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যের জন্য বলতেন। কুরাইশগণ সেখানে জমায়েত হয়ে তাঁর নিন্দা করে ফিরত। এ কাজে আবূ লাহাবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সে তার সকল কাজ পরিত্যাগ করে মহানবী (সা.)-এর পিছনে লেগে থাকতো। মোট কথা হজ্জের মওসুমে এসব গোত্রের যাদের কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন তাদের মধ্যে ছিল মুদর গোত্রের বনূ আমীর বিন সা'সাহ্, রবীআ গোত্রের বনূ শায়ক ও বনূ হানিফা, কাহতান গোত্রের কান্দাহ এবং কুদ্বাআ গোত্রের মকব প্রমুখ ছিল। তাদের কেউ কেউ সহজ ভাবে জবাব দিয়েছিল। কেউ কেউ তা উপেক্ষা করে তাকে কষ্ট দিয়েছিল। কেউ বলেছিল, আমরা এই শর্তে ঈমান আনব যে, আপনি আমাদেরকে রাজত্ব দান করবেন।

আল্লামা ইবনে কসীর বলেন, রাজত্বের শর্তারোপ করেছিল বনূ আমির গোত্রের এক ব্যক্তি। রাসূল (সা.) বললেন, এটা আল্লাহ্‌র কাজ। আমি কাউকে এমন ওয়াদা দিব না। এসবের মধ্যে বনূ হানিফা অত্যন্ত কঠোর জবাব দিয়েছিল এবং সীমাহীন কঠোরতার সাথে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিল।

আল্লামা কাসতালানী (র.) লিখেন, যখন মহানবী (সা.) হজ্জের মওসুম আউস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে মিলিত হলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কুরআন পড়ে শুনালেন, তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগলেন এমন যেন না হয় যে, ইহুদীরা আমাদের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করে নেবে। মদীনা শরীফে আউস ও খাযরাজ ছাড়া অনেক ইহুদী গোত্রের বাস ছিল। যখন ইহুদীদের সাথে আউস ও খাযরাজ গোত্রের যুদ্ধ লাগত, তখন তারা বলত, অচিরেই আমাদের নবী আসবেন। তার আগমনের সময় হয়ে গেছে। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তোমাদেরকে হত্যা করব। যাই হোক এ সময় খাযরাজ গোত্রের ৬ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূল (সা.) বললেন, "আমি যতক্ষণ আমার রবের বাণী প্রচার করব ততক্ষণ তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), আমাদের মাঝে এখনো حرب এর যুদ্ধ চলছে। এ কারণে আমাদের মধ্যে আহকলহ চলছে। আমাদেরকে এক বছর সময় দিন। যদি আমরা সকলকে একমত করতে পারি এবং আপনার দাওয়াত গ্রহণ করাতে পারি, তা হলে আপনার মত সম্মানিত লোক আমাদের আর কেউ হবে না। খাযরাজ গোত্রের প্রথম ঈমান গ্রহণকারী ছয় জন লোক হলেন ১. আবূ উমামা আসআদ বিন যুবারাহ (রা.) ২. আউফ বিন হারিস বিন রিফাআ বিন আফরা (রা.), ৩. রাফি' বিন মালিক বিন আজলান, (রা.) ৪. কুতবা বিন আমীর বিন হাদীদাহ (রা.) ৫. উকবা বিন আমীর বিন নাবি (রা.) ৬. জাবির বিন আবদুল্লাহ বিন রিয়াব (রা.)। কেউ কেউ জাবির বিন আবদুল্লাহ বিন রিয়াব (রা.)-এর পরিবর্তে উবাদা বিন সামিত (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

Scanned with CamScanner

আল্লামা ইবনে খলদুন লিখেন, ঐ লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা.)-এর খিদমতে আরয করেন, ইহা রাসূলুল্লাহ (সা.), আমাদের এখানে ইহুদীরা আছে। আমাদের সাথে তাদের বেশীর ভাগ সময় বিবাদ লেগে থাকে। আপনি অনুমতি দিলে আমরা তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেব। হতে পারে আল্লাহ আমাদের ও তাদের মাঝে মতৈক্য সৃষ্টি করে দেবেন। তখন আপনার চেয়ে প্রিয় আর কেউ থাকবে না। রাসূল (সা.) তাঁদের জন্য দু'আ করলেন। তাঁরা বিদায় নিয়ে মদীনা ফিরত গেলেন এবং ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে লাগলেন।

যেখানেই বসতেন, ইসলামের আলোচনা করতেন

আস্তে আস্তে এমন হল যে, আনসারদের কোন বৈঠক ও স্থান রাসূল (সা.)-এর আলোচনা থেকে মুক্ত থাকল না। এভাবে দ্বিতীয় বছর এল। সে বছর আনসারদের বার জন লোক মক্কায় আসলেন। তন্মধ্যে পাঁচ জন বিগত বছর এসেছিলেন। নতুন ৭ জন হলেন ১. আউফ বিন হারিসের ভাই মুআজ বিন হারিস, ২. যাকওয়ান বিন আবদে কয়স বিন কালিদা, ৩. কারিদ বিন মাখলাদ বিন যুরাইক ৪. উবাদা বিন সামিত বিন কয়স বিন আসরম বিন ফাহাদ বিন সা'লাবা বিন সারামা বিন আসরাম বিন আমর বিন উবাদা বিন উসাইবা। ৫. আব্বাস বিন উবাদা বিন ফাদলা বিন মালিক বিন আজলান বিন যয়েদ বিন গনম বিন সালিম বিন আউফ বিন আমর বিন আউফ। (এরা ১০ জন ছিলে খাযরাজ গোত্রের)। বাকীরা আউস গোত্রের ৬. আবুল হায়সাম মালিক বিন তাইহান। তিনি বনু আবদুল আশহাল বিন জশেম বিন হারিস বিন খাযরাজ বিন উমর বিন মালিক বিন আউস গোত্রের ছিলেন। ৭. উমাইম বিন সায়িদাহ (রা.), তিনি বনু আমর বিন আউফ বিন মালিক গোত্রের ছিলেন। তাঁরা আকাবার কাছে রাসূল (সা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেন না, চুরি করবেন না, যিনা করবেন না, সন্তান হত্যা করবেন না, কাউকে অপবাদ দেবেন না, মিথ্যা বলবেন না। এই বায়আতকে আকাবার প্রথম বয়াত বলে। ইহা জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে হয়েছিল। যখন তাদের ফিরে আসার সময় হল, তখন রাসূল (সা.) হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ও মাসআব বিন উমাইর (রা.)-কে কিরাত শিখানো ও আহকামে শরীয়ত শিখানোর জন্য তাঁদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা মদীনায় গিয়ে আসআফ বিন যুরারার বাড়ীতে উঠলেন। মুসআব বিন উমাইর (রা.) মদীনার মুসলমানদের ইমামতী করতেন। ইবনে উম্মে মাকতুম তাঁদেরকে কুরআন শিখাতেন। হযরত সা'দ বিন মু'আজ ও আসআদ বিন যুরারাহ পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন। একদিন সা'দ ও উসাইদ বিন হুদাইর আস'আফ বিন যুরারার কাছে এলেন এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে আসআফ বিন যুরারা (রা.)-কে তিরস্কার করলেন। আল্লাহ এমন সময় তাঁদেরকে হিদায়াত দান করলেন, তারা মুসলমান হয়ে গেলেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন বনূ আব্দুল আশহাল গোত্রের নেতা, এ জন্য তাদের ইসলাম গ্রহণের এক দিনের মধ্যে সমস্ত বনূ আবদুল আশহাল ছোট-বড়, নারী পুরুষ নির্বিশেষে মুসলমান হয়ে গেলেন। কিছু দিনের মধ্যে মদীনায় এমন কোন ঘর থাকল না যেখানে কোন না কোন একজন মহিলা বা পুরুষ মুসলমান হননি। বনূ উমাইয়া বিন যয়েদ, হাতমা, ওয়ায়িল ও ওয়াকিফ (আউস গোত্রের উপগোত্র) ইসলাম গ্রহণ না করে তাদের পূর্বাবস্থায় রয়ে গেল। তারা সবাই আবূ কয়েস সাইফী বিন আসলত নামক এক কবির অনুসারী ছিল। এ কারণে ইসলামের আওতায় আসেনি। পরিশেষে গাজওয়ায়ে سـربن এর সময় তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল্লামা কাসতালানী (র.) বলেন, দার কুতনী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা.)-কে চিঠি লিখে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে জুমুআ আদায় করেন। আল্লামা যুরকানী বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত ঃ রাসূল (সা.) হিজরতের পূর্বে জুমআর ইমামতী করেছেন। তঁর জন্য মক্কায় জুমুআ আদায় সম্ভব ছিল না। তিনি তাদের কাছে তা প্রকাশও করেন নি। এ জন্য তিনি মুসআব বিন উমাইর (রা.) কে চিঠি লিখেন। চিঠির ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ তোমাদের স্ত্রী সন্তানদেরকে একত্রিত কর জুমুআ আদায় করে। যখন অর্ধেক দিন অতিবাহিত হবে তখন দু' রাকআত নামায পড়ে আল্লাহর নৈকট্য কামনা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম জুমুআ আদায়কারী। এরপর রাসূল (সা.) মদীনায় আগমন করে প্রকাশ্যে যাওয়াল এর সময় জুমুআ আদায় করেন। এই বর্ণনা এবং পূর্বের বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ আসআদ (রা.)ই সর্বপ্রথম জুমুআ আদায় করেছিলেন, আর মুসআব (রা.) আসআদ (র.)-এর সহযোগিতা নিয়েই জুমুআ আদায় করেছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর বাড়ীতে থাকতেন। আর মুসআব (রা.) তাঁর নির্দেশেই জুমআ আদায় করার কারণে তাঁর প্রতি প্রথম জুমুআ আদায় করার সম্পর্ক করা হয়।

দ্বিতীয় আকাবা

মুসআ'ব বিন উমাইর (রা.) প্রায় এক বছর মদীনায় থাকলেন। এ সময় আনসারদের অনেক গোত্র ইসলামে প্রবিষ্ট হল। হজ্জের সময় মুসআব (রা.) সেখানকার ঈমান গ্রহণকারীদেরকে সাথে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলেন। এই দলে এমন লোক ও ছিলেন যারা তখন ও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। মুসলমানদের সংখ্যা তখনও যারা মুসলমান হননি তাদের চেয়ে কম ছিল। মদীনার মুসলমানগণ মক্কায় পৌছে রাসূল (আ.)-এর সাথে মিলিত হলেন। আইয়ামে তশরীকের ভিতর তাঁদের আকাবায় মিলিত হওয়ার কথা হল। রাসূল (সা.) স্বীয় কওমের অলক্ষ্যে আকাবার কাছে এলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন সরাম। আবূ জাবির ও আরো কিছু লোক ও চলে আসলেন। ঐ লোকেরা সে রাত্রেই তাঁর হাত মুবারকে বায়আত গ্রহণ করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা ওয়াদা করলেন যে, রাসূল (সা.)-কে ইসলামের শত্রুদের হাত হতে এমন ভাবে রক্ষা করবেন যেমন তারা তাদের স্ত্রী সন্তানদেরকে ও তাদের ইযযতকে শত্রুর হাত হতে রক্ষা করেন। তারা বলেন, আপনি আপনার সাহাবীগণকে নিয়ে আমাদের শহরে চলে আসেন। আমরা আপনার ও আপনার প্রিয় লোক ও সাহাবাগণের সাহায্যকারী হব। আপনার বিরোধীদের বিরোধিতা করব। এ বৈঠকে রাসূল (সা.)-এর সাথে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন। যদিও তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তবুও রাসূল (সা.)-এর সঙ্গ দিতেন এবং তাঁকে সাহায্য করতেন, স্নেহের সম্পর্ক রাখতেন। এ বয়াতে সর্বপ্রথম বারা বিন মসরুর অংশ গ্রহণ করেন এর পরে অন্যান্য লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেন। সে রাতে মদীনার ৭২ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। سـراهـب গ্রন্থকারের মতে ৭০ জন। রাসূল (সা.) তাঁদের মধ্যে হতে ১২ জনকে দলপতি নির্বাচন করেন। ৯ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের আর ৩ জন আউস গোত্রের। তিনি এ ১২ জনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদেরকে তোমাদের সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষার যিম্মাদার করে দিলাম। যেভাবে ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীগণ যিম্মাদার ছিলেন। আর আমি তোমাদের সকলের যিম্মাদার।

Scanned with CamScanner

মদীনার নকীব (দলপতি) গণ

আকাবার দ্বিতীয় শপথের সময় রাসূল (সা.) যাদেরকে দলপতি করেছিলেন, তারা হচ্ছেন খাযরাজ গোত্রের ৯ জন ১. আসআদ বিন যুরারাহ (রা.) ২. রাফি'বিন মালিক, (রা.), ৩. উবাদা বিন সামিত (রা.)-এরা প্রথম আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। ৪. সা'দ বিন রবী' বিন আমর বিন আবূ যুহায়ের বিন মালিক বিন ইমরুল কয়স বিন মালিক বিন সা'লাবা বিন কা'ব বিন খাযরাজ (রা.)। আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা বিন ইমরুল কয়স (রা.) ৬. বারা বিন মারুর বিন সখর বিন খানসা বিন সিনান বিন গনম, বিন কা'ব বিন সালমা। ৭. আবূ জাবির আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম ৮. সা'দ বিন উবাদা বিন ওমীম বিন হারিসাও ৯. মুনযির বিন আমর বিন খুনাই বিন নুবান বিন আবদুহ বিন ইয়াযিদ বিন সা'লাবা বিন খাযরাজ বিন সায়দা বিন কা'ব বিন খাযরাজ। আউস গোত্রের ৩ জন ছিলেন। তাঁরা হলেন- ১. উসাইদ বিন হুদাইর বিন সাম্মাক বিন আতীক বিন রাফি'বিন ইমরুল কয়েস বিন যায়দ বিন আব্দুল আশহল। ২. সা'দ বিন খায়সামা বিন হারিস বিন, মালিক বিন আউস ও ৩. রিফায়া বিন মুনযির বিন যায়েদ বিন উমাইয়া বিন যায়দ বিন মালিক বিন আউফ বিন মালিক বিন আউস (রা.)। কোন কোন আহলে ইলম হযরত রিফাআ বিন মুনযির-এর পরিবর্তে আবুল হায়সম বিন তাইহানকে উল্লেখ করে থাকেন। والله اعلم

যখন এ বায়আত গ্রহণ শেষ হল এবং ঐ লোকজন রাসূল (সা.)-এর কাছে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন। এমন সময় কুরাইশরা তা অবগত হল। কেউ তা সত্যায়ন করল, আবার কেউ কেউ তা মিথ্যা মনে করল। সকাল হতেই একদল কুরাইশ আনসারদের শিবিরে আসল এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ ও বায়াত গ্রহণের কারণে কঠোর কথা বলতে লাগল। আনসারগণও উপযুক্ত জবাব দিলেন। কুরাইশরা নিরাশ হয়ে ফিরে আসল এবং মুসলমানদেরকে আরো বেশি নির্যাতন করার শপথ গ্রহণ করল। আবদুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সলুল বলল, পরিতাপের বিষয়-আমাদের কওম এভাবে একমত হতে পারেনি। এর সকল আলাদা হয়ে গেল। কুরাইশদের এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল। তাদের কিছু লোক আনসারদেরকে আটক করার জন্য রওয়ানা দিল, কিন্তু তাদের কাউকে পেল না। অগত্যা হযরত সা'দ বিন উবাদাকে পথ হতে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসল এবং নির্যাতন করতে লাগল। হযরত যুবাইর বিন মুতঈম ও হারিস বিন উমাইয়া তাঁকে নির্যাতন হতে উদ্ধার করেন। তাঁরা দু'জন মদীনায় তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন।

ইমাম হলবী লিখেন, এ ঘটনার সময় রাসূল (সা.) শায়বা বিন সা'লাবার এক দলের সাথে দেখা করেন। তাদের মধ্যে মাফরুক বিন আমর ও হানী ছিলেন। মাফরুক রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করলেন, হে কুরাইশ গোত্রীয়। আপনি কিসের প্রতি আহবান করছেন? জবাবে রাসূল (স.) তিলাওয়াত করলেন-

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۔ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۔ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

আপনি বলে দিন, চল আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাব যা তোমাদের রব তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। তা হল তোমরা তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানকে হত্যা করবে না। আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কোন প্রকার অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না। আল্লাহ্ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন,

তাকে হত্যা কর না, তবে ন্যায় সংগত কারণে। এর দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার। (সূরা আনআম-১৫১)

ইহা শুনে মাফরুক বললেন, এটা কোন যমীনবাসীর কথা নয়, যদি হত তা হলে আমরা তা জানতাম। এরপর বললেন- আপনি আর কিসের দাওয়াত দেন? রাসূল (সা.) তিলাওয়াত করলেন إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ দেন ন্যায় বিচার, ইহসান প্রতিবেশীকে দান করার এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, নিষিদ্ধ কাজ ও অবাধ্যতা হতে। (সূরা নহল-৯০) ইহা শুনে শায়বা বিন সা'লাবা নুমান বিন শরীক অথবা মুসান্না বিন হাদিসা আশশায়বানী-এর সাথে কথা বলছিলেন। রাসূল (সা.) তিলাওয়াত করলেন يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ হে নবী (সা.) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসেবে, সুসংবাদ দানকারী, ভয় প্রদর্শনকারী, আল্লাহ্র নির্দেশে তার প্রতি আহবানকারী এবং আলোকিত প্রদীপ হিসেবে। আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করুন। (আহযাব ঃ ৫৫)

'উসদুল গাবাহ' গ্রন্থে আছে এ আয়াতে প্রভাবিত হয়ে মাফরুক বিন আমর মুসলমান হয়ে গেলেন। আবূ নাঈম মাফরুকের ইসলাম গ্রহণের বিষয় জানা যায়নি বলে মত প্রকাশ করেন।

ইকামতে জুমআ প্রসঙ্গে ইমাম হলবী (র.) বলেন, প্রথম জুমআ হিজরতের পূর্বে হযরত আসআ'দ বিন যুরারার নির্দেশে হযরত মুসআব বিন উমাইর نقيع خضمان নামক স্থানে কায়িম করেন। এ কারণে ইকামতে জুমআর সম্পর্ক দু'জনের প্রতিই সঠিক, خضمان শব্দটি خضمة এর বহুবচন। অর্থ বিচরণকারী প্রাণী যেখান থেকে মুখ দিয়ে খাবার খায়। উক্ত স্থানে বেশী ঘাস থাকার কারণে এ নামে নামকরণ করা হয়। ইহা মদীনার গ্রাম সমূহের একটি গ্রাম। মহানবী (সা.) হিজরতের পূর্বে মুসআব বিন উমাইর (রা.) কে জুমআ কায়িমের নির্দেশ দেন, কারণ আল্লাহ্ তায়ালা সকল আহলে দীন-এর জন্য এক একটি দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লামা হামদানীর سعيات গ্রন্থে আছে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-কে সম্মান প্রদর্শন করেছেন শনিবার দিয়ে, ঈসা (আ.)-কে রবিবার দিয়ে, দাউদ (আ.)কে সোমবার দিয়ে, সুলাইমান (আ.)-কে মঙ্গলবার দিয়ে, ইয়াকুব (আ.)-কে বুধবার দিয়ে, আদম (আ.)-কে বৃহস্পতিবার দিয়ে এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে শুক্রবার দিয়ে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদী ও নাসারাগণ শনিবার ও রবিবারকে নিজ ইচ্ছে অনুযায়ী গ্রহণ করেনি বরং আল্লাহ্র পক্ষ হতে তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ইমাম হামদানী উপরোক্ত গ্রন্থে মঙ্গলবার সম্পর্কে বলেন, এ দিনে ৭ জন নবী-রাসূল ও ঈমানদার লোককে হত্যা করা হয়। (১) হযরত জরজিস (আ.) ২. হযরত যাকারিয়া (আ.) ৩. তাঁর ছেলে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ৪. ফেরাউনের যাদুকরগণ, ৫. ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মাযাহিম। ৬. বনী ইসরাঈলের গাভী ও ৭. আদম (আ.)-এর ছেলে হাবিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত ঃ তিনি রাসূল (সা.)-কে জুমআর দিনের নামকরণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, কারণ ঐ দিন তোমার (আদি) পিতা আদম (আ.) এর মাটি একত্রিত করা হয়।

মদীনায় হিজরত

ঐ বয়াতের পর মদীনার ইসলাম রবির আলো উত্তম রূপে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি দ্বিগুণ হয়ে গেল। এ ঘটনায়

Scanned with CamScanner

মুশরিকদের শত্রুতাও বৃদ্ধি পেল।
এতে মুসলমানদের উপর নির্যাতন বেড়ে গেল। এ সময় প্রথম জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা দূর হবে এবং দীন সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহ্র জন্য হবে।" (আনফাল-৩৯)-এর পর রাসূল (সা.) আল্লাহ্র নির্দেশ সাহাবা-ই-কেরাম (রা.)-কে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। সর্বপ্রথম আবূ সালমা বিন আবদুল আসাদ মক্কা থেকে হিজরত করে কুবায় গিয়ে অবস্থান করেন। এরপর আম্মা বিন রবী'আ (বনূ আদী গোত্রের হলীফ) তার স্ত্রী লায়লা বিনতে আবূ খায়সামা বিন গানিমকে সাথে নিয়ে হিজরত করেন। এরপর সমগ্র বনূ জহশ গোত্র হিজরত করে কুবায় অবস্থান করেন। এরপর উক্কাশা বিন মিহসান এবং বনূ আসাদ গোত্রের একটি দল যার মধ্যে উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জহশ (রা.)ও ছিলেন- হিজরত করেন। তাঁর দু'বোন হামনা ও উম্মে হাবীবা (র.) ও হিজরত করেন।
এরপর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ও আইয়াশ বিন রবীআ (রা.) বিশ জন লোক সহ মদীনায় হিজরত করেন। তাঁরা মদীনার বনূ উমাইয়া বিন যয়েদ গোত্রে গিয়ে অবস্থান করেন। কিন্তু আবূ জেহেল আইয়াশ বিন রবীআকে ধোঁকা দিয়ে ফিরিয়ে আনে এবং দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখে। এরপর যায়েদ, সা'দ, খুনাইস বিন হুযাফা সাহমী (রা.) ও একদল বনূ হাতিম গোত্রের মিত্র হিজরত করে মদীনায় চলে আসলেন। তাঁরা সবাই কুবায় রিফাআ বিন আবদুল মুনযির (আউফ বিন আমর গোত্রের) এর বাড়ীতে অবস্থান করেন। তাঁদের পর তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ও সুহাইব বিন সিনান হিজরত করেন এবং বনূ হারিস বিন খাযরাজ বিন হাবীব বিন আসাফ-এর কাছে অবস্থান করেন। কারো মতে হযরত তালহা আসআদ বিন যুরারার গৃহে অবস্থান করেন। এরপর হযরত হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব ও যায়েদ বিন হারিসা এবং তাঁদের মিত্র আবূ মুরসদ কিনআ'ন বিন হাসান গণবী হিজরত করেন এবং কুবায় বনূ আমর বিন আউফ গোত্রের কলসূম বিনতে হাদাম-এর বাড়ীতে অবস্থান করেন। এরপর বনূ মুত্তালিব বিন আবদে মনাফ এর দাস খাব্বাব বিন আরত (রা.) হিজরত করে কুবায় বনূ সালমানের কাছে, আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এক দল নিয়ে বনূ হারিস বিন খাযরাজের সা'দ বিন রবীর বাড়ীতে, যুবাইর বিন আওয়াম আবূ সায়রা বিন আবূ রুহম বিন আবদুল উযযা মুনযির বিন উতবা বিন আযীহার বাড়ীতে, হযরত মুসআব বিন উমাইর বনূ আব্দুল আশহল গোত্রের সা'দ বিন মুআজ-এর কাছে এবং হুযায়ফা বিন উতবা তাঁর দু দাস সালিম ও উতবা বিন গাযওয়ানসহ বনূ আবদুল আশহল গোত্রের আব্বাদ বিন বিশর-এর কাছে গিয়ে অবস্থান করেন। সালিম আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত ছিলেন না; বরং তাঁকে আউস গোত্রের এক মহিলা আযাদ করে দিয়েছিলেন। আবূ হুযাফা (রা.) সেই মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বনূ নাজজার গোত্রের হাসসান বিন সাবিতের ভাই আউসের বাড়ীতে অবতরণ করেন। মোট কথা, ধীরে ধীরে মক্কা হতে সকল সাহাবা মদীনায় চলে গেলেন। মক্কায় রাসূল (সা.)-এর সাথে আবূ বকর (রা.) ও আলী (রা.) ছাড়া আর কেউ থাকলেন না। তাঁরা দু'জন রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে মককায় রয়ে গেলেন। তা না হলে প্রথমেই তাঁরা মদীনায় হিজরত করতেন। আর মহানবী (সা.) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকলেন।

কুরাইশদের পরামর্শ

যখন মক্কা বাসীরা দেখল সাহাবা-ই কিরাম ধীরে ধীরে সকলেই মদীনায় হিজরত করে গেছেন এবং মদীনাবাসী মুসলমান হয়ে গেছেন, তখন তারা বুঝে নিল যে, মদীনা বাসীদের আহ্বানে রাসূল (সা.) শীঘ্রই চলে যাবেন। তারা তখন কুরাইশদের সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণের জন্য দারুন নদওয়া মানে কুসাই বিন কিলাবের বাড়ীতে একত্রিত হল। কুরাইশদের যে সকল প্রবীণ লোক সেখানে উপস্থিত ছিল তারা হল বনূ উমাইয়া গোত্রের উতবা, শায়রা ও আবূ সুফিয়ান, বনূ নওফল গোত্রের তয়ীমা বিন আদী, জুবাইর বিন মুতইম, হারিস বিন আমির, বনূ আব্দুদ্দার গোত্রের নদ্বর বিন হারিস, বনূ মখযুম গোত্রের আবূ জেহেল, বনূ সুহায়ম গোত্রের নবীয়া মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ ও বনূ জুমহ গোত্রের উমাইয়া বিন খলফ। এমন সময় মোটা কাপড়ের এক চাদর পরিধান করে ইবলিস সেখানে উপস্থিত হল। লোকেরা তাকে বলল তুমি কে? সে বলল, আমি নযদের এক শেখ, আমি তোমাদের বোনের ছেলে। এই বৈঠকে কুরাইশ ছাড়া অন্যান্য গোত্রের লোকও ছিল। কেউ বলল, রাসূল (সা.) কে এই সংকীর্ণ স্থানে বন্দী করে রেখে দাও। কেউ বলল তাকে নির্বাসনও দেবে না বরং প্রতিটি গোত্র হতে এক একজন যুবক নির্বাচন কর, আর সকলে মিলে এক যুগে তাকে হত্যা করে দাও (العياذ بالله) তা হলে বিশেষ কারো উপর হত্যার অপরাধ পড়বে না এবং বনূ আবদে মনাফ সবার সাথে যুদ্ধ ও করতে পারবে না। রক্তপণ দেয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। উপস্থিত সবাই এই মতকে পছন্দ করল এবং রাতেই সে কাজের প্রস্তুতি নিল। রাসূল (সা.)-এর দরজা ও বাড়ী ঘিরে ফেলল। আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দিলেন। রাসূল (সা.) আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা.)-কে স্বীয় বিছানায় শুইয়ে দিলেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহ কাফিরদের চোখে পর্দা ঢেলে দিলেন। রাসূল (সা.) এক মুঠি মাটি নিয়ে সূরা ইয়াসীন শুরু হতে فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে কাফিরদের দিকে তা ছুঁড়ে দিলেন এবং আবূ বকর (রা.)-এর ঘরে তশরীফ আনলেন। বনূ বকর বিন আবদে মনাফ গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন আরীকত দুওয়ালীকে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য পূর্ব হতেই মজুরী দিয়ে ঠিক করা হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল স্বাভাবিক রাস্তা পরিত্যাগ করে অপরিচিত রাস্তা দিয়ে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। আব্দুল্লাহ বিন আরীকত কাফির ছিল এবং আসী বিন ওয়ায়েল-এর মিত্র ছিল। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন-

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ

যখন কাফিররা আপনাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল আপনাকে বন্দী করে রাখতে বা হত্যা করতে অথবা বের করে দিতে। (সূরা আনফাল ঃ ৩০) আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.)-কে হিজরতের অনুমতি দেন নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا
আপনি বলুন- হে আল্লাহ সঠিকভাবে প্রবিষ্ট করুন এবং সঠিক ভাবে বের করুন, আর আমার জন্য একজন বিজয়ী সাহায্যকারী দান করুন। (বনী ইসরাঈল ঃ ৮০)। এই ঘটনা ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন ঃ ইমাম তিরমিযী (র.) স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেন, হাকিম ইহাকে সহীহ বলেছেন।
মহানবী (সা.)-এর হিজরতের মধ্যে কী হিকমত রয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাব হল, আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ছিল যে, রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে সব বস্তু মর্যাদা অর্জন করবে। যদি তিনি সারা জীবন মক্কা শরীফ থাকতেন তা হলে এ ধারণা সৃষ্টি হত যে,

Scanned with CamScanner

তিনি কা'বা শরীফের মাধ্যমে মর্যাদাবান হয়েছেন; অথচ উদ্দেশ্য এর বিপরীত। এ জন্য তাঁকে হিজরত করালেন। কারণ তিনি যখন মদীনায় তশরীফ নিলেন, তখন মদীনা মর্যাদাবান হয়ে গেল। এমনকি এ কথার উপর ইজমা হয়ে গেছে যে, মহানবী (সা.)-এর জিসম মুবারক যে মাটির সাথে লেগে আছে, তা যমীনের মধ্যে সর্বোত্তম, এমনকি কাবা শরীফের চেয়েও মর্যাদাবান। বরং তাজ উদ্দীন সবকী ইবনে উকাইল হাম্বলী হতে বর্ণনা করেন, যমীনের এই অংশ খানা আরশের চেয়েও মর্যাদাবান। ফাকিহানী স্পষ্ট বলেছেন, রওযা শরীফের মর্যাদা আকাশের মর্যাদার চেয়েও বেশী। তকীউদ্দীন সবকী বলেন, রওযা শরীফে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয়, ফেরেশ্‌তা অবতরণ করেন। রাসূল (সা.)-এর জন্য রয়েছে আল্লাহ তায়ালার এমন মুহব্বত যা কোন বিবেক বুঝতে সক্ষম নয়। তা হলে কেন তা অন্যান্য সকল স্থানের চেয়ে মর্যাদাবান হবে না। সাহুদী বলেন এই স্থানে অবতীর্ণ রহমত হতে সমগ্র জাতি অনুগ্রহ অর্জন করে। আর এ অনুগ্রহ সীমাহীন, রাসূল (সা.)-এর মর্যাদার কারণে। সুতরাং এ স্থান তা হচ্ছে কল্যাণের উৎস্থল।

সূর গুহা

মহানবী (সা.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে রাতে একটি গুহায় নিরবে বসে থাকলেন। এ গুহা ছিল মক্কা হতে ৬ মাইল দূরে ইয়ামেনের পথে সূর পর্বতে। পর্বতের চূড়ায় পৌছে অপর দিকে সামান্য নেমে একটু নিম্নভূমি আছে। সে স্থানেই সূর গুহা অবস্থিত। সূর পর্বত কা'বা শরীফের চাদ হতে ১২০০ ফুট উঁচু। এর মুখ এত সংকীর্ণ যে, স্বাস্থ্যবান লোক তো দূরের কথা, হাল্কা পাতলা লোকও ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এর ভিতর পাঁচ ফুট উঁচু লোক সহজেই দাঁড়াতে পারেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) প্রতিদিন গুহায় আসতেন এবং মক্কাবাসীদের পরামর্শ ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত করতেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আযাদ কৃত দাস আমীর বিন ফুহায়রা তাঁর ছাগল নিয়ে আব্দুল্লাহর পিছনে পিছনে যেতেন যাতে তাঁর পদচিহ্ন মুছে যায়। রাতে সেখানেই থাকতেন। যাতে প্রয়োজন অনুসারে তাঁদেরকে দুধ ইত্যাদি দিতে পারেন। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) প্রতিদিন তাঁদের খাবার দিয়ে যেতেন। এত সতর্কতা সত্বেও কুরাইশরা গুহা পর্যন্ত পৌছে গেল। যেহেতু গুহার মুখে মাকড়সা জাল তৈরী করেছিল তাই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে আসল। রাসূল (সা.) ও আবূ বকর (রা.)-এর গ্রেফতারীর বিনিময়ে ১০০ উট পুরস্কার ঘোষণা করা হল। যখন তিন দিন এভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল এবং কুরাইশদের জোরে শোরে অনুসন্ধান কমে আসল, তখন আবদুল্লাহ বিন আরিকত (যাকে পথ দেখানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।) একটি উট নিয়ে উপস্থিত হলেন। এমন সময় হযরত আসমা (রা.) ও নাশতা নিয়ে আসলেন। কিন্তু তিনি রশি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ তাঁর কোমরবন্দ ছিঁড়ে দুই অংশ করে এক অংশ দিয়ে বেঁধে নাশতা লটকিয়ে গুহার ভিতর পৌছিয়ে দিলেন। সে দিন হতেই আসমা (রা.) ذات النطاقين নামে পরিচিত।

مواهب গ্রন্থে আছে, রাসূল (সা.) মক্কা হতে বের হয়ে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে বলেছিলেন, (হে মক্কা), তুমি আমার কাছে আল্লাহর যমীনের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। তুমি আল্লাহর কাছেও সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। যদি তোমার অধিবাসীরা আমাকে বের করে না দিত, তা হলে আমি বের হতাম না। دلائل গ্রন্থে আছে যখন রাসূল (সা.) সূর পর্বতের গুহায় প্রবেশ করলেন তখন আল্লাহ তায়ালা এর মুখে ১টি গাছ অংকুরিত করে দিলেন। এটি 'উম্মে গায়লান' নামে প্রসিদ্ধ। এর পরিচয়ে

লিখেন এর উচ্চতা মানুষের উচ্চতার মত, এর সাদা ফুল রয়েছে। এটা কোমলতায় ও পাতলার দিক থেকে পালকের মত, কারণ তা লাউ গাছের মত। গুহার মধ্যে ইহা কাফিরদের চোখে আড়াল করেছিল।

مسند البزار গ্রন্থে আছে, আল্লাহ তায়ালা মাকড়শাকে নির্দেশ দিলেন। ঐ গুহার উপরে জাল তৈরী কর। আর দু'টি কবুতর পাঠিয়ে দিলেন। এগুলো গুহার মুখে বাসা তৈরী করল। এভাবেই তিনি তাঁদেরকে মুশরিকদের থেকে হিফাযত রাখলেন। বর্তমান হরম শরীফের কবুতরগুলো ঐ দুই কবুতরের বংশধর। এরপর কুরাইশ যুবকরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসল; কিন্তু গুহার মুখে মাকড়সার জাল ও বন্য কবুতরের ডিম দেখে ফেরত চলে গেল। কারণ ততক্ষণে কবুতর সেখানে ডিম দিয়েছিল। কোন কোন বর্ণনা মতে বাচ্চা ও ফুটিয়েছিল। ইমাম যুরকানী বলেন, হয়ত কিছু ডিম হতে বাচ্চা ফুটেছিল আর কিছু ডিম রয়েছিল। শেখ শরফুদ্দীন বুসিরী (র.)-এ প্রসঙ্গে বলেন-

وماحوى الغارى من خيرومن كرم + وكل طرف من الكفارعنه عم
فالصدق فى الغارو والصديق لم يريا + وهم يقولون مابالغار من ادم
ظنو الحمام وظن العنكبوت على + خير البرية لم تنسج ولم تحم

"গুহাকে বেষ্টন করেছিল কল্যাণ ও অনুগ্রহ। এর চার পাশে কাফিরগণও এসেছিল। সত্য নবী ও সিদ্দীক তা দেখেন নি। আর তারা (কাফিররা) বলল গুহায় নেই কোন মানুষ। তারা মনে করল خير البرية (সা.)-এর উপর (গুহার মুখে) কবুতর ও মাকড়শা জাল বুনেনি এবং বাচ্চা দেয়নি।"

হযরত সা'লাবী, ইবনে আতিয়্যা ও অন্যরা হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন তোমাদের ঘর সমূহকে মাকড়সার জাল হতে মুক্ত রাখ, কারণ ইহা দারিদ্র নিয়ে আসে। ইমাম বুখারী (র.) হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, যদি তাদের কেউ পায়ের দিকে তাকাত তা হলে আমাদেরকে দেখে ফেলত।

যখন রাসূল (সা.)-গুহার দিকে হাঁটছিলেন, তখন খালি পায়ে পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে হাঁটছিলেন যাতে পায়ের চিহ্ন দিয়ে কেউ খোঁজ নিতে না পারে। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি রাসূল (সা.)-এর দুই কদমের দিক তাকালাম, দেখলাম তা যখম হয়ে গেছে। আমার ক্রন্দন এসে গেল।

বর্ণিত আছে হযরত আবূ বকর (রা.) প্রথমে গুহায় প্রবেশ করলেন। তিনি তাতে অনেক গর্ত দেখতে পেলেন। গর্ত দেখে তিনি স্বীয় চাদর টুকরো টুকরো করে তা বন্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু একটি গর্ত থাকতে চাদর শেষ হয়ে গেল। তিনি তাঁর পায়ের গোড়ালী দিয়ে তা বন্ধ করে দিলেন, যাতে কোন জন্তু বের হয়ে রাসূল (সা.)-কে কষ্ট দিতে না পারে। ফলে এ গর্ত দিয়ে সাপও বিষাক্ত প্রাণী তাঁকে ছোবল দিতে শুরু করল আর তাঁর অশ্রু ঝরতে লাগল। অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (সা.) গুহায় প্রবেশ করলেন এবং তাঁর মাথা মুবারক আবূ বকর (রা.)-এর কোলে রেখে নিদ্রা গেলেন। আবূ বকর (রা.)-এর পায়ে সাপ দংশন করল; কিন্তু তিনি নড়লেন না। তাঁর অশ্রু রাসূল (সা.)-এর চেহারা মুবারকের উপর পড়ল। রাসূল (সা.) বললেন- আবূ বকর, তোমার কি হয়েছে ? তিনি বললেন, আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবানী হোন, আমাকে সাপ দংশন করেছে। রাসূল (সা.) আহত স্থানে মুখের লালা মুবারক লাগিয়ে দিলেন। সাথে সাথে বেদনা দূর হয়ে গেল। (ইবনে রাযীন)

ইবনে মরদুবিয়া জুনদুব বিন সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেন, যখন আবূ বকর (রা.) গুহা পরিষ্কার করার জন্য তাতে প্রবেশ করলেন, তখন পাথরের আঘাতে তাঁর হাতের একটি আঙুল যখম হয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। তিনি বললেন-

Scanned with CamScanner

هل انت الا اصبع دميت + وفى سبيل الله ما لقيت

"তুমি তো কেবল একটি আঙুল রক্তাক্ত হয়েছ। তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় এখনো মুকাবিলা করনি।" অন্য এক বর্ণনায় আছে-আবূ বকর (রা.) অনুসন্ধানকারীদের উপস্থিতি টের পেয়ে রাসূল (সা.)-এর জীবন নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), যদি আমি মারা যাই তা হলে একা এক লোক মারা যাব। আল্লাহ না করুন, যদি আপনাকে হত্যা করা হয় তা হলে সমগ্র জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এর জবাবে রাসূল (সা.) বলেছিলেন, তুমি চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ্ বলেন-

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْيَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَاتَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

হযরত হাসসান বিন সবিত এ ঘটনার উল্লেখ করেন তাঁর কবিতায় "তিনি ছিলেন দু'জনের একজন যখন পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। শত্রুরা বেষ্টন করেছিল তখন তাঁরা গুহায় ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর ভালবাসা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে যে, সৃষ্টিজগতে এর প্রতিদানের সমান কিছুই হতে পারে না।"

এ আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীর একে অপরের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে। কারণ রিসালতের সূর্যরশ্মি ব্যাপক। এ জন্যই সেই তজল্লীতে আবূ বকর (রা.)-কে শামিল করে আয়াত অবতীর্ণ হয় لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তা করনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

অন্যদিকে হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন-ان ربى معى আমার রব আমার সাথে আছেন। মাকড়শা হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর জাল তৈরী করেছিল যখন তালুত তাকে অনুসন্ধান করেছিল। এরপর তালুত এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করে জিহাদে অংশ নিয়ে শহীদ হন এবং দাউদ (আ.)-এর হাতে রাজত্ব হস্তান্তর হয়। সমস্ত বনী ইসরাঈল তাঁর রাজত্বে একমত হয়। তালুতের রাজত্ব ৪০ বছর এবং দাউদ (আ.)-এর রাজত্ব ৭ বছর ছিল। (ফতহুল বারী)। আবদুল্লাহ বিন উনাইস-এর উপর মাকড়শা জাল তৈরী করেছিল যখন তাকে রাসূল (সা.) খালেদ নবীহ কে হত্যার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাকে উরানায় হত্যা করে এক গর্তে প্রবেশ করেন। এ সময় মাকড়শা গর্তের মুখে জাল বুনেছিল। এ জন্য অনুসন্ধানকারীরা তাঁকে না পেয়ে নিষ্ফল ফিরে গিয়েছিল। এরপর তিনি রাসূল (সা.)-এর খিদমতে গেলেন। রাসূল (সা.) বললেন চেহারা সফল হয়েছে। তিনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনার চেহারা সফল হয়েছে। এবং তাঁর মাথাকে রাসূল (সা.)-এর সামনে রেখে সংবাদ বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা.) তাঁর হাতের লাঠি তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা সহ তুমি বেহেশ্‌তে উপস্থিত হবে। যখন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হল, তিনি এই লাঠিখানা তাঁর কাফনের সাথে দিয়ে দিতে বললেন। তাঁর ওয়ারিসগণ তাই করলেন।

تاريخ ابن عساكر গ্রন্থে আছে, মাকড়শা জাল তৈরী করেছিল হযরত যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবূ তালিবের সতর ঢাকার জন্য। তাঁর হাতে কুফার অনেক লোক বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। বায়আত গ্রহণ করেই তারা বলল আবূ বকর ও উমর হতে আপনি দূরে সরে যান। তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন তারা বলল نرفضك (আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করব) এ থেকেই তারা রাফিযী নামে পরিচিত। অন্য এক দল বললেন যারা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমরা তাদের থেকে আলাদা। এরা 'যায়দিয়া' নামে পরিচিত। তাঁরা তাঁর সাথে বের হয়ে পড়ল এবং হিশাম বিন আব্দুল মালিকে নিযুক্ত ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজের চাচাতো ভাই ইউসুফ বিন আমর সকফীর সাথে যুদ্ধ করল। যুদ্ধে ইউসুফ বিজয়ী হয়ে যায়েদ বিন আলী (র.)-কে হত্যা করল ও শুলে চড়িয়ে দিল। তাঁর চেহারা কিবলা হতে ফিরিয়ে দেয় কিন্তু কাঠের টুকরো সাথে

সাথে ঘুরে কিবলার দিকে হয়ে যায়। এর পর তারা তাঁর শরীরকে জ্বালিয়ে এর ছাই ফুরাত নদীর তীরে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তাঁর হত্যা ও শুলীতে চড়ানো ১২১ হিজরীর সফর মাসে হয়েছিল।

রাসূল (সা.)-তিন দিন আবূ বকর সহ সূর গুহায় থাকলেন। এ মতই সঠিক, হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর বিছানায় রেখে যাওয়ার কারণ হল, তিনি লোকদের আমানত ও রাসূল (সা.)-এর যিম্মাদারী আদায় করে মদীনায় যাবেন। রাসূল (সা.), হযরত আলী (রা.)-এর কাছে কিছু কাপড় পাঠিয়ে বলে দিলেন, এ কাপড় টুকরো করে فواطم এর মধ্যে বণ্টন করে দেবে, যাতে প্রত্যেকে তা দ্বারা একটি উড়না তৈরী করতে পারে। কারণ فواطم দের সিলাহ রেহমীর জিম্মাদারী রাসূল (সা.)-এর উপর ছিল। فواطم দ্বারা উদ্দেশ্য হল। ১. ফাতিমা বিনতে হামযা। ২. ফাতিমা বিনতে উতবা ৩. ফাতিমা উম্মে আলী ও ৪. ফাতিমা বিনতে নবী (সা.)

আল্লামা কাসতালানী লিখেন, রাসূল (সা.) ও হযরত আবূ বকর (রা.) কে এগিয়ে দেওয়ার জন্য আমীর বিন ফুহায়রাও তাঁদের সঙ্গে চললেন। এই হিসেব অনুযায়ী দলের লোক সংখ্যা ছিলেন চার. রাস্তা প্রদর্শনকারী আবদুল্লাহ বিন আরীকত ও সাথে ছিলেন, মোট কথা ঐ চার লোক কাদীদ নামক স্থানে উম্মে মা'বদের কাছে গিয়ে থামলেন। উম্মে মাবদের কাছ থেকে দুধ বা গোশ্‌ত ক্রয় করতে চাইলেন। যখন কিছুই পেলেন না, তখন কম বয়সী ও শীর্ণ একটি চাগল যা দুর্বলতার কারণে মাঠে যেতে পারেনি- দেখতে পেলেন। তিনি উম্মে মা'বাদকে বললেন, তুমি অনুমতি দিলে আমি এই ছাগল হতে দুধ দোহন করব। উম্মে মা'বাদ বললেন, এ ছাগলের দুধ দোহনের বয়স হয়নি। তা ছাড়া এর শরীরে হাড় ও চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। এ থেকে দুধ কিভাবে বের হবে? রাসূল (সা.) বললেন, তুমি অনুমতি দিলে আমি দুধ নেব। তিনি বললেন, হ্যাঁ আপনি তা মনে করলে দোহন করতে পারেন। রাসূল (সা.) ছাগলটি নিয়ে আসতে বললেন। তিনি ছাগলটির স্তনে হাত বুলিয়ে দিলেন। অমনি তা প্রসারিত হয়ে গেল : তিনি একটি পাত্র আনতে বললেন। এরপর তা দোহন করলেন সমস্ত জামাত তৃপ্ত হয়ে তা পান করলেন। এরপর উম্মে মা'বদের ঘরে পাত্র ভর্তি দুধ রেখে তিনি চলে গেলেন। অন্য বর্ণনায় আছে উম্মে মা'বদ বকরী যবেহ করে তাঁদেরকে খাওয়ালেন এবং রাস্তায় খাওয়ার জন্য আরও কিছু দিলেন। একটু পরেই আবূ মা'বদ এসে গেলেন। ঘটনা শুনে তিনি আফসোস করে বললেন। তিনি তো কুরাইশ গোত্রীয় লোক। এ প্রসঙ্গে ইমাম সবকী কবিতায় লিখেন-

مسحت على شاة لدى ام معبد ـ بحهد فالفتها ادر حلوبة

درة الشاه حين مرت عليها + فلهاثروة بيار نساء

আপনি উম্মে মা'বদের কাছে এক ছাগলের উপর হাত বুলালেন, অমনি তা দুগ্ধবতী হয়ে গেল।.....।

আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বের হয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। আমরা জানতে পারলাম না তিনি কোথায় পৌছেছেন। এমন সময় এক জীন এসে অদৃশ্য আওয়ায দিল।

جزى الله رب الناس حير جزائه + رفيقين حلا خيمة ام معبد

هما نزلا بالهدى واهتدت به + قد فازامسى رفيق محمد

"আল্লাহ তায়ালা দুই বন্ধুকে উত্তম প্রতিদান দান করেছেন, তারা দু'জনেই উম্মে মা'বদের তাঁবুতে অবস্থান করছেন। তারা দু'জন হিদায়াত নিয়ে সেখানে অবতরণ করলেন, যে হিদায়াতের দ্বারা উম্মে মা'বদ সৎ পথ প্রাপ্ত হলেন। আর গতকাল মুহাম্মদ (সা.)-এর বন্ধুও সফল হয়েছেন।"

Scanned with CamScanner

অদৃশ্য আওয়ায শুনে হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.)-এর জবাবে এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। এর বাংলা অর্থ নিম্নরূপ-

যে কওমের কাছ থেকে তাদের নবী সরে গেলেন সে কওম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আর যেখানে তিনি চলে যাচ্ছেন তারা পবিত্র হয়েছে। তিনি যে কওমের কাছ থেকে বাহন নিয়ে চলে গেলেন, তাদের বিবেক নিরর্থক হয়ে গেছে। যে কওমের দিকে যাচ্ছেন তাদেরকে সংস্কারক নূর দিয়ে আলোকিত করলেন। তাদের স্রষ্টতার পর আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। আর যারা সত্যের অনুসারী, তাদেরকে সৎপথ দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্ধভাবে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিল যে কওম, তারা কি ঐ লোকদের হিদায়াতের সমান হতে পারে যারা সৎপথ প্রাপ্ত হলেন হিদায়াতকারীর মাধ্যমে। হিদায়াতের বাহন নিয়ে তিনি ইয়াসরিববাসীর কাছে নামলেন, তাই তাদের জন্য সৌভাগ্য অনিবার্য হয়ে গেছে। আমার নৈকট্য এমন সব বিষয় দেখেছে যা তাঁর চারপাশের লোকজন দেখেনি। আর তিনি সকল পরিস্থিতিতেই কুরআন তিলাওয়াত করেন।

তিনি যদি গায়েবের কোন কথা বলেন, তা হলে তা আজ না হয় কাল সত্য হবেই। আবূ বকরের পরিশ্রমের সৌভাগ্যকে তিনি ধন্যবাদ দিয়েছেন, তিনি আল্লাহ্র সৌভাগ্য প্রাপ্ত (নবীর) সঙ্গ দেয়ার কারণে অবশ্যই ভাগ্যবান।

উম্মে মা'বাদ তখনই মুসলমান হয়েছিলেন নাকি পরে মুসলমান হয়েছিলেন তা নিয়ে মত ভিন্নতা রয়েছে। তবে সর্বাবস্থায় তখন থেকেই ইসলামের প্রতি তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল। বায়আত গ্রহণ পরেই হোক না কেন। উম্মে মা'বদ বলেন, যে ছাগলের স্তনে রাসূল (সা.) হাত লাগিয়ে ছিলেন সে ছাগল হযরত উমর (রা.) এর সময়কালে ১৮ বা ১৭ হিজরী অর্থাৎ রামাদার বছর পর্যন্ত জীবিত ছিল। সকাল বিকাল এর দুধ দোহন করে পান করা হত।

দুধ দোহনের এই ঘটনা উল্লেখের পর বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আইনী (র.) রামাদার বছরের উল্লেখ করে বলেন, হযরত কা'ব (রা.) উমর (রা)-কে বললেন, বনী ইসরাঈলের সময়ে অনুরূপ অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। তারা নবীর আসাবাদেরকে নিয়ে পানির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। উমর (রা.) আব্বাস (রা.)-কে দেখিয়ে বললেন তিনি হচ্ছেন রাসূল (সা.)-এর চাচা ও তাঁর ওয়ালিদ সাহেবের ভাই এবং বনু হাশিম গোত্রের সরদার। উমর (রা.) তাঁর কাছে গেলেন এবং মানুষের কষ্টের কথা বললেন। এরপর উমর (রা.) আব্বাস (রা.)-কে নিয়ে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, হে আল্লাহ, আমরা আমাদের নবীর চাচা ও তাঁর আব্বাজানের ভাইকে নিয়ে আপনার দিকে মুখ করছি। অতএব আমাদের প্রতি বৃষ্টি অবতরণ করুন, আমাদেরকে নিরাশ করবেন না। এরপর তিনি আব্বাস (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আবুল ফদ্বল, দাঁড়ান এবং দুআ করুন। তিনি দাঁড়ালেন এবং হামদ ও সানার পর এই বলে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের নিজেদের ব্যাপারেও আমাদের পরিবারের ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণ করুন। হে আল্লাহ্, আমরা সকল ক্ষুধার্তের ফরিয়াদ আপনার কাছে পেশ করছি। হে আল্লাহ আমরা আপনি ছাড়া আর কিছুর আশা করি না। আপনি ছাড়া কারো কাছে দু'আ করছি না। আপনি ছাড়া কারো প্রতি অনুরক্ত নই। লোকেরা তাদের বাড়ীতে পৌছার পূর্বেই বৃষ্টি শুরু হল। তারা পানিতে ভিজে গেলেন এবং যমীন ডুবে গেল। লোকেরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে পেল। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম এটা হচ্ছে আল্লাহ্র দিকে ওসীলা। লোকেরা তাঁর মাধ্যমে বরকত লাভ করতে লাগল এবং সন্তুষ্ট চিত্তে বলতে লাগল, আপনার ওসীলায় হারামাঈনে আমরা পানি পেয়েছি। হযরত আকীল বলেন

بعمه سقى الله البلاد واهلها + عشية يستقى بشبية عمر
توجه بالعباس فى الجدب داعيا + فماحارحتى حادبالديمة المطر

মদীনায় সফর

যাই হোক রাসূল (সা.) একটি উটের উপর সওয়ার হলেন। অপর উটে হযরত আবূ বকর (রা.)। আবূ বকর (রা.)-এর পিছে হযরত আমীর বিন ফুহায়রা সওয়ার হলেন। আরেকটি উটে সওয়ার হলেন আব্দুল্লাহ্ বিন আরীকত। পরিচিত ও বড় রাস্তা পরিত্যাগ করে একটি অপরিচিত রাস্তা দিয়ে যাত্রা করলেন। হযর আবূ বকর (রা.) যাত্রা শুরুর সময় তাঁর সমস্ত সম্পদ (আনুমানিক ৬ হাজার দিরহাম) সাথে নিলেন। প্রথম রাত হতে দ্বিতীয় দিন যুহর পর্যন্ত এক টানা চললেন। এমন সময় সুরাকা বিন মালিক-যে কুরাইশদের কাছে রাসূল (সা.)-কে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার ওয়াদা করেছিল- সে এসে পৌছল। রাসূল (সা.) তার জন্য বদ দু'আ করলেন। সাথে সাথে তার ঘোড়ার চার পা মাটির গভীরে আটকে গেল। সুরাকা অনন্যোপায় হয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে নিরাপত্তার আবেদন করল। তার বারবার আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) তাকে নিরাপত্তা দিলেন। রাসূল (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে আবূ বকর (রা.) ছাড়পত্র লিখে দিলেন। সুরাকা সেখান থেকে চলে আসল এবং যারাই এ পথে যেতে দেখল তাদেরকে ফিরিয়ে দিল। আব্দুল্লাহ বিন আরীকত রাসূল (সা.) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে নিয়ে মক্কার সমতল অংশ হতে বের হয়ে উপত্যকার দিকে রওয়ানা হল। সমতল অঞ্চল দিয়ে আফফান হতে 'আমজ' পর্যন্ত পৌছলেন। এরপর সেখান থেকে নীচু অঞ্চল অতিক্রম করের কাদীদ নামক স্থানে পৌছলেন। এরপর সেখান থেকে 'আরজ' হয়ে মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় প্রবেশ করলেন। এদিকে সুরাকা মক্কায় ফিরে গেল। আবূ জেহেল তার কাছ থেকে সংবাদ শুনে তাকে অত্যন্ত তিরস্কার করল। এর জবাবে সুরাকা নিম্নোক্ত কবিতা পড়ে শুনাল-

اباحكم واللات لو كنت شاهدا + لا مرجوادى اذ تسيخ قوائمه
عجبت ولم تشكك بان محمدا + نبى وبرهان فمن ذايكاتمه
عليك بكف القوم عنه فانى + ارى امره يوما سيبدو معالمه

"হে আবুল হেকাম, লাতের শপথ, যদি তুমি দেখতে যখন আমার ঘোড়ার পাগুলো পুঁতে গিয়েছিল, তখন এটার অবস্থা কি হয়েছিল। আমি অবাক হয়েছি। আর কোন সন্দেহ নেই যে মুহাম্মদ হচ্ছেন নবী ও বুরহান, কে তা অস্বীকার করবে? তোমার উচিত কওমকে তাঁর পেছনে লাগানো হতে বিরত থাকা, কারণ আমি দেখছি তাঁর বিষয় ও কার্যাবলী একদিন প্রসার লাভ করবেই।"

রাসূল (সা.) আবূ বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে গোপনে পথ চলছেন। রাস্তায় এক বকরী রাখাল বালকের কাছে দুধ চাইলেন। সে বলল আমার কাছে এখন এক বছরের কম বয়সী একটি বকরী ছাড়া আর কোন বকরী নেই। রাসূল (সা.) বললেন, ঐ বকরীটি নিয়ে আস। যখন বকরী নিয়ে আসল, তখন তিনি বকরীর স্তনে হাত বুলিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তা দুগ্ধবতী হয়ে গেল। দুধ দোহন করে সবাই তৃপ্তি সহকারে পান করলেন। বালক অবাক হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন।

যখন রাসূল (সা.)-এর আগমনের সংবাদ মদীনায় পৌছল, তখন প্রতিদিন মদীনার মুসলমানগণ সকালে মদীনা হতে বের হয়ে হাররা পর্যন্ত আসতেন, দ্বিপ্রহরে রৌদ্রতাপের সময় আবার ফিরে যেতেন। একদিন তারা অপেক্ষা করে ফিরে যাচ্ছেন, এমন সময় এক ইহুদী তার বালাখানা হতে দেখলেন যে, ঐ দু' মহান ব্যক্তির শুভ্রতা মারীচিকাকে দূর করে দিচ্ছে। তিনি চিৎকার করে বললেন, হে বনূ কবীলা, এই তোমাদের উদ্দীষ্ট ব্যক্তি। সাথে সাথে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বনূ কবীলা অর্থাৎ আউস ও খাযরাজ গোত্র বের

Scanned with CamScanner

হল। রাসূল (সা.) কুবায় বনূ আমার বিন আউফের ওখানে কলসুম বিন হাদমের কাছে অবস্থান নিলেন বুখারী) হযরত আবূ বকর (রা.) লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং রাসূল (সা.) নিশ্চুপ বসে পড়লেন। আনসারদের লোকজন এসে আবূ বকর (রা.)-কে সালাম পেশ করতে লাগল। রাসূল (সা.)-এর উপর রোদ এসে পড়ছিল। আবূ বকর (রা.) স্বীয় চাদর দিয়ে মহানবী (সা.)-এর মাথায় ছায়া দিচ্ছিলেন। তখন লোকেরা তাঁকে চিনতে পারে। রাসূল (সা.) এর উপর রোদ পড়ছিল কারণ ফেরেশ্‌তা ও মেঘের ছায়া তাঁর ইরহাসাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তিনি ১২ ই রবিউল আউয়াল সোমবার কুবায় অতবরণ করেন। তিন দিন পর শুক্রবার সেখান থেকে মদীনা রওয়ানা হন। এ সময়ই মসজিদে কুবার ভিত্তি স্থাপন করেন। সহীহ বর্ণনানুযায়ী কুবার মসজিদ তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য বর্ণনানুযায়ী মসজিদে নববী ও মসজিদে কুবা দু'টি أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى বা তাকওয়ার উপর ভিত্তিকৃত। রাস্তায় বনূ সালাম বিন আওফের অঞ্চলে জুমার সময় হয়ে গেল। রাসূল (সা.) ১০০ জন ভিন্ন বর্ণনা মতে ৪০ জন লোক নিয়ে জুমআ আদায় করেন। স্থানটি তখন ময়দান ছিল। পরে সেখানে একটি ছোট মসজিদ তৈরী করা হয়, যার নাম মসজিদে গুবাইব। সেখান হতে রাসূল (সা.) আবূ বকরের সাথে একই বাহনে রওয়ানা হলেন আবূ বকরকে বললেন আমাকে মানুষ হতে একটু আলাদা রাখ। হযরত আবূ বকর (রা.) বয়সে রাসূল হতে ছোট ছিলেন তবে তাঁর চুল ছিল সাদা আর রাসূল (সা.)-এর চুল মুবারক ছিল কালো। পথে লোকেরা জিজ্ঞেস করত ইনি কে? আবূ বকর জবাব দিতেন هذا الرجل يهديني السبيل অর্থাৎ এই লোক আমাকে পথ দেখান লোকেরা মনে করত তিনি রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। রাসূল (সা.) যখন আনসারদের মহল্লায় প্রবেশ করলেন, তখন প্রত্যেক বাড়ীর লোকই উটের লাগাম ধরে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), আমাদের সব কিছু আপনার জন্য কুরবান। আপনি আমাদের মেহমান হয়ে যান। রাসূল (সা.) বলতেন خلوا سبيلها فانها مأمورة উটের পথ ছেড়ে দাও কেননা তা আদিষ্ট আছে। আল্লামা কাসতালানীর মতে মহানবী (সা.) উটের লাগাম ছেড়ে দিলেন। তখন উটনী ডানে বামে দেখে ইবনে মালিক বিন নাজজারের দরজায় অর্থাৎ বর্তমান মসজিদে নববীর দরজায় বসে পড়ল। ঐ জায়গা তখন সহল ও সুহাইল নামের দুই এতিম ছেলের মালিকানায় ছিল। এ দুই এতিম সা'দ বিন যুরারার কাছে পালিত হতেন। এ স্থানে খেজুর শুকানো হত। এরপর উটনী সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর দরজায় গিয়ে বসে পড়ল এবং বলল "আল্লাহ চাইলে এটাই অবস্থান স্থল।" আবূ আইয়ুব আনসারী রাসূল (সা.)-এর মালপত্র উঠিয়ে ঘরে নিলেন। তিনি বলেন, ঘরে গিয়ে রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, হে আবূ আইয়ূব, তুমি দোতলায় থাকবে আর আমি নিচ তলায় থাকব। যেহেতু আমার সাথে দেখা করতে সব সময় লোক আসবে, তাই তাদের কষ্ট হবে। পরে আবূ আইয়ুব (রা.)-এর পীড়াপীড়িতে রাসূল (সা.) উপরে থাকলেন এবং তিনি নিচে থাকতে লাগলেন। আল্লামা কাসতালানী লিখেন, আবূ আইয়ুব আনসারীর ঘর প্রথম 'তুব্বা' কর্তৃক নির্মিত যিনি ইবনে হাসসান হিময়ারী নামে পরিচিত ছিলেন। যার সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা তুব্বা'কে গালি দিও না কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। (তারবানী)। তাঁর নাম ছিল তাবাব, যখন তুব্বা হিময়ারী মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার পৌছলেন, তখন সেখানে ৪০০ আলিম একত্রিত করে রেখে গেলেন। ইবনে আসাকির تاريخه গ্রন্থে উল্লেখ করেন তুব্বা মক্কা শরীফ এসে কা'বা শরীফে গিলাফ পরিয়ে মদীনায় ফিরে গেলেন। সে সময় তাঁর সাথে ১ লক্ষ ৩০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, তা ছাড়াও ১ লক্ষ ১৩ হাজার পদাতিকসহ তিনি মদীনা শরীফ পৌছেন। সেখানে পৌছে ৪০০ লোক বের করে তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিলেন যে, তারা কখনো মক্কা

শরীফ হতে বের হবেন না।

যখন তাদেরকে মদীনায় অবস্থানের কারণ জিজ্ঞেস করা হল তখন তারা বললেন, বায়তুল্লাহ শরীফ ও মদীনার গৌরব ঐ লোকের জন্য যিনি আগামীতে আসবেন। তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ (সা.)। এটা তাঁর হিজরতের স্থান। তুব্বার ইচ্ছায় আমরা এখানে অবস্থান করে রাসূল (সা.)-এর অপেক্ষা করি। তিনি তাদের জন্য ৪০০ বাড়ী তৈরী করে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের জন্য একজন দাসী আযাদ করে দিয়ে তাদের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। আর তাদেরকে দিয়েছেন প্রচুর সম্পদ। তাদের কাছ থেকে রাসূল (সা.)-এর হিজরত পর্যন্ত সেখানে থাকার ওয়াদা নিয়েছেন। রাসূল (সা.)-এর কাছে একখানা চিঠি লিখে তাদের প্রধান ব্যক্তির কাছে দিয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে তা পৌছানোর নির্দেশ দিয়েছেন। চিঠির ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

تشهدت على احمد انه + رسول من الله باری النسم
فلو مد عمری الی عمره + لکنت وزیراله وابن عم

"আমি আহমদ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলাম যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি পবিত্র আত্মা। যদি আমার জীবন তাঁর জীবন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, তা হলে আমি তাঁর অনুগত হব, আর তিনি আমার চাচাতো ভাই।" চিঠি খানা স্বর্ণ দিয়ে মুড়ে দিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তা সোনার তক্তিতে লেখা ছিল। অসিয়তের মধ্যে উল্লেখ ছিল যে, যদি তোমাদের দেখা না হয়, তা হলে তোমাদের সন্তানদের যার দেখা হবে তাকে আমার চিঠিখানা পৌছিয়ে দিতে বলবে।

ইমাম হলবী লিখেন, তিনি উলামা হুকামাদের জন্য যে ঘর তৈরী করেছিলেন তা ছাড়া অন্য একটি ঘর রাসূল (সা.)-এর জন্য তৈরী করে চিঠির আমানতদার প্রধান আলিমকে সে ঘরে অবস্থান করতে দিয়েছিলেন। তাঁরই পর পুরুষ হচ্ছেন হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.)। সেই হিসেবে রাসূল (সা.) সেই ঘরেই নেমেছিলেন যে ঘর তাঁর জন্য তৈরী করা হয়েছিল। যেহেতু তুব্বা' দক্ষ উলামাদের কাছ থেকে জেনেছিলেন যে, রাসূল (সা.) এ স্থানে অবতরণ করবেন, এ জন্য তিনি এ স্থানে ঘর তৈরী করে চিঠির ধারক আবূ আইয়ুব (রা.)-এর দাদাকে এখানে অবস্থান করতে দিয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে, আখেরী যামানার নবী হিজরত করে মদীনার এই স্থানেই অবতরণ করবেন, এখানেই থামবেন। এসব উলামার বংশধরই হচ্ছেন মদীনার আনসারগণ। অন্য এক বর্ণনায় আছে এরাই হলেন আউস ও খাযরাজ। দুই বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য নেই। এ চিঠি যখন হাতে নিয়ে আবূ লায়লা দরবারে রিসালতে পৌছলেন, তাঁকে দেখেই রাসূল (সা.) বললেন, তুমি আবূ লায়লা, তোমার কাছে প্রথম তুব্বা'র চিঠি আছে। অথচ আবু লায়লার সাথে রাসূল (সা.)-এর কোন পরিচয় ছিল না। এ কারণে আবূ লায়লা চিন্তিত হয়ে বললেন আপনি যাদুকর নন তো? কারণ আবু লায়লা তাঁকে যাদুকর মনে করেছিলেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, আমি মুহাম্মদ (সা.)। আমার চিঠি খানা দাও, যখন তিনি তা পাঠ করলেন তখন তিন বার বললেন مرحبا بالاخ الصالح

ইমাম হলবী চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন, "অতঃপর হে মুহাম্মদ (সা.)। আমি আপনার প্রতিও আপনার রবের প্রতি ঈমান আনলাম। আমি ঈমান আনলাম সৃষ্টিজগতের রবের প্রতি। ইসলামী শরীয়তের যা কিছু আপনার রবের পক্ষ হতে এসেছে তার প্রতিও ঈমান আনলাম। আমি এটা বললাম এ জন্য যে, যদি আমি আপনাকে পাই তা হলে তো ভাল কথা, আর যদি না পাই তা হলে কিয়ামতের দিন আপনি আমার জন্য সুপারিশ করবেন। আমাকে ভুলে যাবেন না। আমি পূর্ববর্তীদের অন্তর্ভুক্ত। আপনার আগমনের পূর্বেই এবং আল্লাহ্ আপনাকে প্রেরণ করার পূর্বেই আমি আপনার কাছে

Scanned with CamScanner

বয়াত গ্রহণ করলাম আমি আপনার ও ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের উপর রয়েছি। এরপর চিঠিখানা বন্ধ করে পড়লেন-

لله الامرمن قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

উল্লেখ্য কুরআন শরীফের উক্ত আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পূর্বেই তিনি তা তিলাওয়াত করে গিয়েছিলেন। এরপর চিঠির ঠিকানা লিখেন এভাবে- হিময়ারের প্রথম তুব্বা-এর পক্ষ হতে শেষ নবী ও রাসূল, রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি। যার হাতে এ চিঠিখানা পৌছবে, তা আল্লাহ্‌র আমানত স্বরূপ তাঁর পরবর্তী জনের কাছে পৌছাবে।

ইবনে ইসহাক كتاب المبدأ وقصص الانبياء عليهم الاسلام গ্রন্থে বলেন, তাঁর নাম ছিল তুব্বা' বিন হাসসান আল হিময়ারী। তিনি হচ্ছেন প্রথম তুব্বা', যিনি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম সমগ্র অঞ্চলের রাজত্ব করেছিলেন। সে তুববা' ও রাসূল (সা.)-এর জন্মের মধ্যখানে এক হাজার বছরের মত সময় অতিবাহিত হয়েছিল।

মদীনায় নিরাপদে মহানবী (সা.) পৌছায় মদীনাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, যেদিন রাসূল (সা.) মদীনায় প্রবেশ করলেন সেদিন তারা মদীনার প্রতিটি বস্তুকে সজ্জিত করেছিল। পর্দার অন্তরালের মহিলাগণও বাড়ীর চাদে উঠে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল এই বলে-

طلع البدر علينا + من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا + مادعالله داع
ايها المبعوث فينا + جئت بالامر المطاع

আমাদের কাছে পূর্ণিমার চন্দ্রের উদয় হয়েছেন সানিয়াতুল বেদা' হতে। সুতরাং আমাদের জন্য শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক।

আমাদের কাছে প্রেরিত হে সত্ত্বা, আপনি এমন এক বিষয় নিয়ে এসেছেন যা অনুসরণের যোগ্য।

এ ঘটনা ইমাম বায়হাকী (র.) দালাইল গ্রন্থে, আবূ বকর আল মুকরবী স্বীয় গ্রন্থে, তবরী (র.) الرياض গ্রন্থে এবং হালওয়ানী বুখরী ও মুসলিম-এর সনদে বর্ণনা করেন।

ثنية الواع বলতে মদীনা বাসীরা ঐ স্থানকে বুঝায়, হাজীগণ ও যোদ্ধাগণ কার্য সম্পাদন করে যেখানে গিয়ে অবস্থান করেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ

হিজরতের পর মহানবী (সা.) যেখানেই নামাযের সময় হত, নামায পড়ে নিতেন। এরপর যখন মসজিদ তৈরী করতে চাইলেন, তখন বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী আছে, সে স্থানের মালিক ছিলেন সহল ও সুহাইল নামের দুইজন ইয়াতিম যারা হযরত মুআয বিন আফরা (রা.)-এর আত্মীয় ছিলেন। স্থানটি তখন আবাদ ছিল না। সেখানে খেজুরের কয়েকটি গাছ ও মুশরিকদের কবর ছিল। আর তা ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। যমীনের মালিক স্থানটি রাসূল (সা.)কে দান করতে চাইলেন, কিন্তু রাসূল (সা.) তা গ্রহণ না করে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সম্পদ হতে ১০ দিনার দিয়ে তা ক্রয় করেন। জমি ক্রয়ে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। তবে আবূ বকর (রা.)-এর ক্রয় কৃত জমিতে মসজিদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অন্যান্য ক্রয়কারীর ক্রয়কৃত জায়গায় মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। এর পর রাসূল (সা.) মুশরিকদের কবর, খেজুরের গাছ ও পরিত্যক্ত বাড়ীর সরঞ্জাম পরিস্কার করার নির্দেশ দেন এবং নিজে মসজিদ তৈরীর কাজে লেগে গেলেন। আনসার ও মুহাজিরগণ তাঁর সাথে কাজে শরীক হলেন। মসজিদের দেয়াল পাথরের টুকরো ও পলাস্তরা দিয়ে তৈরী করা হল আর ছাদ তৈরী করা হল খেজুরের ডাল ও পাতা দিয়ে। খুঁটি দেয়া হল খুরমা

গাছ দিয়ে। মসজিদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১০০ গজ বা তার কিছু কম ছিল। মসজিদের কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে। তিনটি দরজা ছিল। একটি পিছন দিকে, একটি বারে রহমত ও অপরটি বাবে জিব্রীল যা বাবে আলে উসমান নামে প্রশিদ্ধ। কিবলা পরিবর্তনের পর পিছনের দরজা বন্ধ করে সেখানে মিহরাব তৈরী করা হয়। মসজিদের ভিত্তি ছিল ৩ ফুট উঁচু। মসজিদের পাশের অংশ ও মেঝে কাঁচা ইট দিয়ে তৈরী করেন। হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-এর জন্য একটি ঘর তৈরী করে উহার দরজা মসজিদের দিকে দিলেন। তার পাশের ঘর ছিল সাওয়াদা বিনতে যামআ (রা.)-এর জন্য। এর পাশে আরেকটি ঘর তৈরী করে আলে-উসমানকে থাকতে দিলেন। এরপর মহানবী (সা.) আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) এর ঘর ছেড়ে দিয়ে ঐ ঘরে থাকতে লাগলেন।

রাসূল (সা.)-এর আযাদকৃত দাস হযরত যয়েদ বিন হারেসা ও আবূ রাফে (রা.)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন হযরত ফাতিমা (রা.) উম্মে কুলসুম (রা.) ও সাওদা বিনতে যামআ (রা.)-কে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য। তাঁদের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকর (রা.) তাঁর পরিবার পরিজনদেরকে নিয়ে মদীনায় আসলেন। মসজিদে নববীর পাশে একটি ছায়াদার স্থান ছিল যেখানে দরিদ্র-মিছকীনগণ আশ্রয় নিতেন। ঐ স্থানের নাম ছিল সুফফা, সেখানে অবস্থানকারীদেরকে বলা হত 'আসহাবে সুফফা'। রাসূল (সা.) রাতে লোকজনকে ডেকে তাঁদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতেন আর তাদের এক দলের সাথে তিনি রাতের খাবার খেতেন।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি আসহাবে সুফফার ৭০ জন লোককে দেখেছি। তাঁদের কারো চাদর ছিল না। হয়ত একটি লুঙ্গি বা একটি জামা ছিল। এগুলো কাঁধের সাথে বাধা থাকত। তন্মধ্যে কোনটি অর্ধেক সাক পর্যন্ত পৌছত আবার কারো ইযার ঘন্টা পর্যন্ত পৌছত। তারা হাত দিয়ে এগুলো জমা করে রাখতেন সতর খুলে যাওয়ার আশংকায়।

ফতহুল বারী গ্রন্থে আছে, রাসূল (সা.) একটি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে জুমআর খুতবা দিতেন। ইহা মসজিদে খাড়া করে রাখা ছিল। রাসূল (সা.) বলেন- এর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো যখন আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ল, তখন মিম্বর তৈরি করা হল। মিম্বর তৈরী করেছিলেন ফাকীহা আনসারীর দাস মায়মুন। এরপর রাসূল (সা.) ইহুদীদের সাথে সন্ধি করলেন। একটি সন্ধিপত্র লিখে দিলেন যাতে আনসার মুহাজির ও ইহুদীদের দাবী দাওয়ার শর্তাবলী লিখিত ছিল। এ সনদ পত্রের বিষয় তারীখে ইবনে খলদুনে নিম্নরূপ লিখিত আছে-

بسم الله الرحمن الرحيم এ সনদপত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ হতে মুমীন, কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুসলমানগণ, তঁদের অনুসারীগণ, তাদের সাথে যারা মিলিত হবেন তারা, তাদের পক্ষ হয়ে যারা জিহাদ করবেন তাদের মধ্যে কার্যকরী। নিশ্চয় অন্যান্য সকল মানুষকে বাদ দিয়ে তারা একটি জাতি। মুহাজিরে কুরাইশগণকে তাঁদের কল্যাণকর অবস্থার সাথে তুলনা করা হবে। তাঁরা ইহসান স্বরূপ স্বীয় দলের পক্ষ হতে ফিদইয়া আদায় করবেন। আর বিচার কার্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুমিনরাই করবেন। বনু আউফকে তাদের কল্যাণকর অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হবে। জাহেলিয়াতের যুগের রক্ত পণ তাদের মধ্যে বহাল থাকবে। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হতে ফিদ্‌ইয়া আদায় করবেন। ন্যায় বিচার ও ইনসাফের দায়িত্ব ভার মুসলমানদের হাতেই থাকবে। ন্যায় বিচার মুসলমানগণই করবেন। বনু হারিসকে তাদের পূর্বাবস্থায় ছেড়ে হবে। তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের রক্তপণ বহাল থাকবে। তাদের গোত্র নিজ নিজ দলের ফিদাইয়া আদায় করবে। আর ন্যায় বিচার মুমিনদের হাতে থাকবে। বনু জশমকে নিজ নিজ অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হবে। জাহেলিয়াতের যুগের রক্ত পণ তাদের মধ্যে বহাল

Scanned with CamScanner

থাকবে। ঐ গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হতে ফিদাইয়া আদায় করবেন। বনু নাজ্জারকে তাদের পূর্বাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে। জাহেলিয়াতের যুগের রক্তপণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হতে ফিদইয়া আদায় করবেন। আর ইনসাফ মুমিনদের হাতেই থাকবে। বনু আমর বিন আউফকে তাদের পূর্বাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে। জাহেলিয়া যুগের রক্তপণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হতে ফিদইয়া আদায় করবেন। আর ইনসাফ মুমিনদের হাতেই থাকবে। বনু আমর বিন আউফকে তাদের পূর্বাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে। জাহেলিয়া যুগের প্রচলিত রক্তপণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হতে ফিদাইয়া আদায় করবে। ন্যায় বিচারের ভার মুমীনদের উপরই থাকবে। বনু আউসকে তাদের পূর্বাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে। জাহেলিয়া যুগের রক্তপণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হতে ফিদইয়া আদায় করবে, আর ইনসাফ মুমিনদের হাতেই থাকবে। তারা জাহেলী যুগে যে সকল ফিদইয়া ও দিয়ত আদায় করত মুমিনগণ তা আদায়ে সামান্যতম অংশও ছাড় দেবেন না।

নিশ্চয়ই মুমিনও মুত্তাকীদেরকে ধর্মদ্রোহীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে অথবা যে মুমিনের উপর অবিচার করে, শত্রুতা পোষণ করে বা মুমিনদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের উপর মুমিনদের অগ্রাধিকার থাকবে। এবং তারা মুমিনদের রাজত্ব ও ক্ষমতার অধীন থাকবে। কোন কাফিরের কিসাস স্বরূপ কোন মুমিন অন্য মুমিনকে হত্যা করতে পারবে না। আর কোন মুমিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র জিম্মাদারী সবার উপর রয়েছে। যালিমদের মুকাবেলায় তিনি দুর্বলকে মুক্ত করবেন। এক মুমিন অন্য মুমিনের বন্ধু। অন্যান্য লোকদের ব্যাপারে অনুরূপ নয়। যে সকল ইহুদী আমাদের অনুসরণ করবে তাদেরকে সাহায্য করা হবে। তাদেরকে সতর্কও করা হবে, তবে তাদের উপর যুলম করা হবে না। তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করা যাবে না। যদিও মুসলমানরা কাউকে মুক্তি দিতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের ক্ষেত্রে কোন মুসলমান অন্য মুসলমান ছাড়া কারো অনুগত হতে পারবে না। তবে ন্যায় সংগত ও সমতার ক্ষেত্রে তা পারবে। নিশ্চয় যে সকল লোক আমাদের সাথে জিহাদ করছেন, তাঁরা সকলেই একে অপরের স্থলাভিষিক্ত। এক মুসলমান অপর মুসলমানকে অবশ্যই সাহায্য করবে, কারণ মুমিনের রক্ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় পতিত হয়। মুমীন, ও মুত্তাকীগণ উত্তম ও দৃঢ় হেদায়াতের উপর রয়েছেন। কোন মুশরিক কোন কুরাইশের সম্পদ ও প্রাণের জিম্মাদারী নিতে পারবে না। কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করা যাবে না। যে কোন মুসলমানকে কোন কারণ ছাড়াই হত্যা করল, তার কাছ থেকে ফিদাইয়া গ্রহণ করা হবে। তবে নিহতের ওলী যদি সন্তুষ্ট হয়ে যান, (তাহলে ফিদইয়া গ্রহণ করা হবে না।) সকল মুসলমান একটি মাত্র জাতি। তাদের জন্য আবশ্যক ঐ সন্ধি পত্র মেনে চলা। যে এই সন্ধিপত্র স্বীকার করে নিল, আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান আনল, তার জন্য জায়িয নয় কোন বিদআতী লোককে সাহায্য করে। যে অনুরূপ লোককে সাহায্য করল, নিঃসন্দেহে এর উপর আল্লাহ্‌র লা'নত ও কিয়ামতের দিন তার উপর থাকবে আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ। তার কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। যখনই তোমরা কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করবে, তখনই বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হাতে ছেড়ে দিবে। ইহুদীরা যতক্ষণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তখন তাদের সাথে ব্যয় করে। বনু আউফ গোত্রের ইহুদীগণ একটি জাতি। তাদের জন্য রয়েছে তাদের ধর্ম আর মুসলমানের জন্য রয়েছে তাদের ধর্ম। মুসলমানগণ ইহুদীদের সম্পদ ও প্রাণের হিফাজত করবে, তবে যদি কেউ অবিচার করে অথবা পাপ করে, তাহলে তার নিরাপত্তা

দেয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রেও কেবল তাকে ও তার পরিবারকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। বনু আউফের অধিকার যেভাবে বিবেচনা করা হবে বনু নাজজার-এরও অনুরূপ অধিকার রক্ষা করা হবে। বনু হারিস-এর অধিকার রয়েছে বনু আউফ-এর অধিকারের ন্যায়। বনু সায়িদাও অধিকার ভোগ করবেন বনু আউফ এর মত। বনু জশম-এর অধিকার রয়েছে বনু আউফ-এর মত। আউস গোত্রের ইহুদীরা আউফ গোত্রের ইহুদীদের ন্যায় অধিকার ভোগ করবে। সা'লাবা গোত্রের ইহুদীরা আউফ গোত্রের ইহুদীদের ন্যায় অধিকার পাবে, তবে কেউ অন্যায় কলে অথবা ভুল করলে তার প্রায়শ্চিত্ব কেবল সে অথবা তাঁর পরিবারই করবে। 'জাফনা' গোত্র সা'লাবা গোত্রের এক উপগোত্র, তাদের সাথে সা'লাবা গোত্রের মত আচরণ করা হবে। 'শাতানা' গোত্রের অধিকার আছে আউফ গোত্রের অধিকারের ন্যায়। জেনে রাখ পূণ্য হচ্ছে পাপের বিপরীত। সা'লাবা গোত্রের মাওয়ালীগণ সা'লাবা গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। ইহুদীদের সমগোত্রীয়গণ ইহুদীদের ন্যায় অধিকার প্রাপ্ত হবেন। কাউকে এখান থেকে বের করে দেয়া যাবে না মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুমতি ছাড়া। যে কাউকে আকস্মাৎ হত্যা করল সে যেন তার নিজেকে এবং তার পরিবারের লোকজনকে হত্যা করল। তবে যে অন্যায় করল তার বিষয় ভিন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা এর প্রত্যক্ষদর্শী। ইহুদীদের উপর তাদের জীবন যাত্রার দায়িত্ব রয়েছে এবং মুসলমানদের উপরও নিজেদের জীবন যাত্রার দায়িত্ব রয়েছে। তবে এই চুক্তিতে আবদ্ধ কারো সাথে তৃতীয় কোন পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হলে দুই পক্ষই তাদেরকে প্রতিরোধ করবে। এতে রয়েছে সকলের জন্য উপদেশ। আর নিশ্চয় পূণ্যের কাজ পাপাচারের বিপরীত। কোন পক্ষই অপর পক্ষের সাথে চুক্তির বিপরীত কাজ করতে পারবে না। মযলুমকে সকলেই সাহায্য করবেন। মুসলমান গণ যতক্ষণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকবেন ইহুদীরা তাঁদেরকে সহায়তা দিবে। মদীনার মূল ভূখন্ডে চুক্তিবদ্ধ কোন গোত্র প্রবেশ করতে পারবে না। মদীনা শরীফের হুরমত নষ্ট করা যাবে না। যদি সন্ধির কোন শর্ত কোন পক্ষের কাছে ফসাদের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে এর সমাধানের ভার আল্লাহ্ ও রাসূলের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। এই সন্ধি পত্রে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর স্বাক্ষী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা। কোন অবস্থায়ই কুরাইশদেরকে অথবা যারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করে তাদেরকে সাহায্য করা যাবে না। ইয়াসরিবের উপর কেউ হামলা করলে সকলের পারস্পরিক সাহায্যে তা প্রতিহত করা হবে। যদি মুমিনদেরকে কারো মধ্যে মিমাংসা করে দেয়ার জন্য ডাকা হয়, তাহলে তারা যেন এর মিমাংসা করে দেয়। ঠিক অনুরূপ কোন ইহুদীকে মিমাংসার জন্য ডাকা হলে তারা মিমাংসা করে দিতে পারবেন তবে যারা ধর্মের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত তাদেরকে ইহুদীরা বারণ করতে পারবে না। প্রত্যেক মানুষের জন্য তার প্রাপ্য অংশ রয়েছে। আউস গোত্রের ইহুদী ও তাদের মাওয়ালীদের জন্য অনুরূপ অংশ রয়েছে, যা রয়েছে এই চুক্তি পত্রের সকল পক্ষের জন্য। আল্লাহ তায়ালা এ সন্ধিপত্রের স্বাক্ষী ও দলীল। কোন অত্যাচারী ও পাপিষ্ট এ সন্ধিপত্রে উল্লেখিত অধিকার ভোগ করতে পারবে না। যে মদীনা হতে অন্যত্র যেতে চায়, সে নিরাপদে যেতে পারবে। যে এখানে থাকতে চায় সে এখানেই নিরাপদ থাকবে, তবে যে অন্যায় করেছে এবং ভুল করেছে তার বেলায় এটা কার্যকরী নয়। যে কল্যাণ কাজ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার সাহায্যকারী। আর মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল।

আসআ'দ বিন যুরারাহ ছিলেন বনু নাজজারের দল নেতা। এ সন্ধির সময় তার মৃত্যু হয়। বনু নাজজারের লোকেরা রাসূল (সা.)-এর কাছে আসল তাদের নতুন দলনেতা নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য। রাসূল (সা.) তাদের জন্য নতুন কোন দলনেতা নির্ধারণ না করে বললেন انا نقيبكم "আমি তোমাদের দলনেতা।" বনু নাজজার-এর লোকেরা এ

Scanned with CamScanner

নিয়ে গর্ব করতেন।
আব্দুল্লাহ বিন আরিকত যিনি রাসূল (সা.) ও আবূ বকর (রা.)-এর সাথে তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য গিয়েছিলেন, তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং তাঁদের দুই জনের নিরাপদে মদীনায় পৌছার সংবাদ প্রদান করেন।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভাতৃত্ব বন্ধন

এই ঘটনার পর রাসূল (সা.) ইলহামের মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভাতৃত্ব বন্ধন তৈরী করে দিলেন। যেমন হযরত জাফর বিন আবূ তালিবের সাথে হযরত মুআজ বিন জবল (রা.)-এর ভাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে হযরত খারিজা বিন যয়েদ, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সাথে হযরত সা'দ বিন মুআ'জ (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর সাথে হযরত সা'দ বিদ রবী', হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা.)-এর সাথে হযরত সালামা বিন ওকশ (রা.), হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.)-এর হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.), হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর সাথে হযরত আউস বিন সাবিত (রা.), হযরত সাঈদ বিন যয়েদ (রা.) এর সাথে উবাই বিন কা'ব (রা.) হযরত মুসআ বিন উমাইর (রা.)-এর সাথে আবূ আইয়ুব (রা.), আবূ হুযাইফা বিন উত্বা (রা.)-এর সাথে আব্বাদ বিন বিশ্‌র বিন ওকশ (রা.), আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর সাথে হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান আনাসী (রা.), তিনি বনু আব্দুল আশহল এর বন্ধু ছিলেন। (কেউ বলেন তাঁর সাথে সাবিত বিন কয়স বিন শাম্মামের ভাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন।) হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-এর সাথে হযরত মুনযির বিন আমর সা'দী (রা.), হাতিব বিন আবূ বালতা'আ (রা.)-এর সাথে হযরত উয়াইম বিন সা'দাহ (রা.), (বনু আমর বিন আউফ গোত্রের।) হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর সাথে বনু হারিস বিন খাযরাজ গোত্রের আবূদ্দারদা (রা.) উমাইর বিন বালতা'আ (রা.) এবং বেলাল বিন রাবাহ (রা.)-এর সাথে হযরত আবূ রুআইহা খাসআ'মী (রা.)-এর ভাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। উপরোল্লিখিতভাবে এক সাহাবীকে আরেক সাহাবীর ভাই বানিয়েছেন।

যাকাত

যখন রাসূল (সা.) স্বস্থিতে মদীনায় বসবাস শুরু করলেন তখন রাসূল (সা.)-এর কাছে মুহাজির ও আনসারদের লোকজন জমায়েত হলেন। ইসলামের অগ্রগতি সাধিত হল। এমন সময় যাকাত ফরয হল। এ সময় মুকীম এর নামায দু'রাকাত বাড়িয়ে দেয়া হয়, যাতে চার রাকাত পূর্ণ হয়। এর পূর্বে মুসাফির ও মুকীম সকলের জন্য দু'রাকাত নামায ফরয ছিল।

নামায

নামায মক্কায় ফরয হয়েছিল, তবে মাগরিব ছাড়া অন্যান্য সকল নামায দু'রাকআত করে পড়তে হত। মদীনায় হিযরতের ১ মাস পর যোহর ও আসরের নামাযে দু'রাকআত করে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।

আযান

যখন নামাযের সময় নির্ধারণ হয়ে গেল, তখন মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছে হল যে, এমন কোন চিহ্ন নির্ধারণ করা প্রয়োজন যার দ্বারা মুসলমানদেরকে সরাসরি না ডেকেও নামাযের সময় মসজিদে আনা যায়। প্রথমে মনে হল ইহুদীদের মত শিঙ্গা রাখা হবে এনং নামাযের সময় তা বাজানো হবে। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর কাছে তা গ্রহণ যোগ্য হল না। ঐ রাতেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন যয়েদ বিন সা'লাবা বিন আব্দুল্লাহ স্বপ্নে

দেখলেন সবুজ পোশাক পরিহিত এক লোক হাতে এক শিঙ্গা নিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ বিন যয়েদ তার কাছে শিঙ্গাটি বিক্রি করার জন্য বললেন। ঐ লোক বললেন, তুমি তা ক্রয় করে কি করবে? আব্দুল্লাহ বিন যয়েদ বললেন, আমি এটাকে মসজিদে রেখে দেব। নামাযের সময় মানুষকে আহবান করার জন্য তা বাজাব? তিনি বলেন নামাযের জন্য আহবান করতে তোমাকে এর চেয়ে ভাল পথ বলে দিব। এই বলে সবুজ পোশাক পরিহিত লোকটি তাঁকে আযানের কথাগুলো বলে দিলেন। সকাল হতেই আব্দুল্লাহ বিন যয়েদ (রা.) রাসূল (স:)-এর খিদমতে আসলেন এবং স্বপ্নের কথা বললেন। রাসূল (সা.) খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন, তোমার স্বপ্ন সঠিক। এই বলে হযরত বিলাল (রা.)-কে আযানের জন্য নির্বাচন করে নিলেন, যেহেতু তাঁর আওয়াজ ছিল উঁচু।
যখন হযরত বিলাল (রা.) আযান দিলেন, হযরত উমর (রা.) তা শুনে রাসূল (সা.)-এর খিদমতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.), আল্লাহর কসম, আমি অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। রাসূল (স.) জবাবে বললেন, الله الحمد على ذالك
ইবনে ইসহাক বলেন, এ হাদীস মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বিন হারিস মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন যয়েদ বিন সা'লাবা বিন আবদে রাব্বিহী হতে বর্ণনা করেন।
ইমাম নববী বলেন, আযান আল্লাহর নির্দেশে বা ইজতেহাদে রাসূল (স.) এর মাধ্যমে শরীয়ত সম্মত হয়। কেবল হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ (রা.)-এর স্বপ্নের মাধ্যমে হয়নি। এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কোন মতবিরোধও নেই। والله اعلم
এ ঘটনার পর ইহুদীদের প্রখ্যাত আলিম ও নেতা আব্দুল্লাহ বিন সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে খলদুন লিখেন, ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ বিন সালাম ইহুদীদের অনেক বড় আলিম ছিলেন। তিনি নিজে বর্ণনা করেন, "যখন আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আলোচনা শুনলাম এবং তাঁর গুনাবলী, নাম ও আগমনের সময় সম্পর্কে অবগত হলাম, তখন হতেই তাঁর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছে হল। অতঃপর তিনি মদীনায় তশরীফ আনলেন এবং কুফায় বনু আমর বিন আউফের পল্লীতে অবস্থান করলেন। একদিন আমি বাগানের খেজুর গাছে আরোহণ করেছিলাম। আমার ফুফু খালিদা বিনতে হারস নিচে বসা ছিলেন। এমন সময় এক লোক আসলেন এবং তাকে রাসূল (সা.)-এর আগমনের সংবাদ দিলেন। আমি তা শুনেই তকবীর পাঠ করলাম। আমার ফুফু তা শুনে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। কসম খোদার, যদি আমি মূসা বিন ইমরানের আগমনের সংবাদ শুনতাম তবুও নতুন কোন কথা বলতাম না। আমি জবাব দিলাম, হে আমার ফুফু, আল্লাহর কসম, তিনি মূসা বিন ইমরানের ভাই, তাঁরই ধর্মের উপর প্রেরিত হয়েছেন। আমার ফুফু বললেন হে আমার ভাইয়ের ছেলে। তিনি কি সেই নবী, যার আগমনের অপেক্ষায় আমরা আছি। আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। এরপর আমি রাসূল (স.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং মুসলমান হলাম। এরপর সেখান থেকে ফিরে বাড়ীতে আসলাম। আমার সাথে সম্পর্কিত সকলেই আমার কথায় মুসলমান হয়ে গেলেন। আমি সমীচীন মনে করে আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আমার সম্প্রদায়ের লোকের কাছে গোপন রাখলাম। আমি রাসূল (স.) কে বললাম, ইহুদীরা খুবই হিংসুক। আমি চাচ্ছি যে, আপনি আমাকে একটি অদৃশ্য স্থানে গোপন রাখবেন। আর ইহুদীদেরকে একত্রিত করে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। এটা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তারা জেনে নেয়ার পূর্বে হবে। কারণ মুসলমান হওয়ার পর তারা আমার উপর অপবাদ আরোপ করতে লেগে যাবে। আমার দোষ ত্রুটি বর্ণনা করবে। রাসূল (সা.) অনুরূপই করলেন। তিনি ইহুদীদেরকে একত্রিত করে বললেন, তোমাদের মধ্যে হুসাইন (আব্দুল্লাহ) বিন সালাম কেমন মানুষ। ইহুদীরা বলল, তিনি আমাদের নেতার ছেলে নেতা। আমাদের সম্প্রদায়ের অনেক বড় আলিম। আব্দুল্লাহ বিন সালাম তা শুনেই আড়াল হতে বেরিয়ে আসলেন এবং ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে বললেন। হে

Scanned with CamScanner

ইহুদী জাতি, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তিনি যা তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, তা গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা জানবে যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তোমরা তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে তাতে তাঁর নামও গুনাবলী লিখিত পেয়েছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি তাঁর প্রতি ঈমান রাখি, তাকে সত্যায়ন করছি এবং আমি তাঁকে চিনি। ইহা শুনে ইহুদিরা একবাক্যে চিৎকার করে বলে উঠল তুমি মিথ্যা বলছ, এরপর তারা আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) কে গালিগালাজ করে চলে গেল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বললাম, আমি কি আপনাকে ঐ দলটির বিশ্বাস ঘাতকতা, অবাধ্যতা ও মিথ্যাবাদীতার কথা বলব? এরপর তিনি নিজে ও নিজের পরিবারের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন, আমার পরিবারের সাথে আমার ফুফু খালিদা বিনতে হারিস ও ইসলাম গ্রহণ করেন। (সীরতে ইবনে হিশাম)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে ইহুদীদের বিরোধীতার আগুন বেড়ে গেল। তারা মুসলমানদের সাথে সর্বপ্রকার চলাফেরা ও লেনদেন বন্ধ করে দিল। সব সময় নোংরা কাজে উঠে পড়ে থাকত। আউস ও খাযরাজের কিছু লোককে উস্কানী দিয়ে মুনাফিক করে দিল, যাদের কাজ ছিল মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা, অপর দিকে কুফরী দৃঢ় ছিল। মুনাফিকদের নেতা ছিল বনু খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল ও জদ্দ বিন কয়েস। আউস গোত্রের নেতা ছিল হারিস বিন সুহাইল বিন সামিত, আব্বাদ বিন হুনাইফ, মুরাব্বা বিন কুনযী ও তার ভাই আউস। ইহুদীদের মধ্যে যারা প্রকাশ্যে ইসলামের দাবীদার ছিল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে কুফরীতে নিমজ্জিত ছিল তারা হল সাদ বিন খুনাইস, যয়েদ বিন লসীত, রাফে' বিন খুযায়মা, রেফা'আ বিন যয়েদ বিন তাবূত এবং কেননা বিন খায়ূরা প্রমুখ।

রাসূল (সা.)-এর নির্ধারিত মুয়াযযিন হযরত বিলাল (রা.)-এর অবস্থা

যখন মহানবী (সা.) ইন্তিকাল করলেন, তখন বিলাল (রা.) আযান ছেড়ে দিলেন এবং শাম চলে গেলেন। সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করলেন। এরপর স্বপ্নে দেখলেন রাসূল (সা.) তাঁকে বলছেন, হে বিলাল! তুমি আমার কাছ থেকে বেরিয়ে দূরে চলে গেছ। তুমি আমার সাথে দেখা কর। ইহা দেখে হযরত বিলাল (রা.) জাগ্রত হলেন এবং মদীনা শরীফ যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করলেন। যখন তিনি মদীনায় পৌছলেন, তখন লোকদের সাথে তাঁর দেখা হল। তিনি রাসূল (সা.) এর কবর শরীফের কাছে গিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। এরপর হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর কাছে গেলেন, তাঁদের কে চুমো খেলেন ও জড়িয়ে ধরলেন। তাঁরা তাকে আযান দিতে জোর দিলেন। যখন তিনি আযান দিতে মিনারে চড়লেন মদীনার পুরুষ মহিলা সকলে একত্রিত হয়ে গেল। কুমারীগণ তাবু থেকে বের হয়ে আসল তাঁর আযান শুনার জন্য। যখন তিনি বললেন الله اكبر তখন সমগ্র মদীনায় তা তরঙ্গায়িত হল, সকলেই চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। যখন বললেন اشهدان لااله الاالله তখন সকলেই চিৎকার দিতে শুরু করলেন। যখন বললেন اشهدان محمدارسول الله তখন প্রাণ আছে এমন সকলেই কাঁদতে লাগল। সেদিন ছিল রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের দিনের মত। এরপর হযরত বিলাল (রা.) আবার শাম ফিরে গেলেন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বছরে একবার মদীনায় আসতেন এবং আযান দিতেন। বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের দিন হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশে একবার সেখানে আযান দিয়েছিলেন। রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি আর কখনো মদীনার বাইরে আযান দেননি। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত বিলাল (রা.)-এর আযান দেয়ার যে সকল বর্ণনা রয়েছে, সবগুলোর মর্মকথা হল এটিই।

[প্রথম খন্ড সমাপ্ত]

Scanned with CamScanner

পুস্তক পাবলিকেশন্স

Scanned with CamScanner